সেবকের নিবেদন

অর্থাৎ

শ্রীমদাচার্য্য কেশব চন্দ্র সেনের

উপদেশ।

চতুর্থ খণ্ড।

চতুর্থ সংস্করণ।

সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত।

কলিকাতা।

ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী।

৭৮নং অপার সারকিউলার রোড।

১৮৩৬ শক, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ।

 [মূল্য ৸৹ আনা।

কলিকাতা।

৭৮নং অপার সারকিউলার রোড।

বিধান প্রেস।

আর্, এস্, ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচী পত্র।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।

সেবকের নিবেদন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

মহাজন মানবজাতির প্রতিনিধি।

রবিবার, ১৭ই শ্রাবণ, ১৮০৩ শক ; ৩১শে জুলাই ১৮৮১।

লোকবিশেষে বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ হয় এবং ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান হয়। যাহা সাধারণ মনুষ্যমণ্ডলীসম্পর্কে ভবিষ্যৎ, প্রেরিত প্রত্যাদিষ্ট দ্বিজাত্মাদিগের নিকটে তাহা বর্ত্তমান। তোমরা বারম্বার শুনিয়াছ, ভবিষ্যদ্বংশ প্রেরিতদিগের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। যাঁহারা ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রেরিত মহাপুরুষ নাম লইয়া আসেন, তাঁহারা ভবিষ্যতের লোক অর্থাৎ তাঁহারা উন্নত ভবিষ্যদ্বংশের প্রতিনিধি। বহু শতাব্দী পরে যে সকল আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা, বিধাতার নিগূঢ় নিয়মানুসারে মহাপুরুষেরা অকালে সে সকল ঘটনা সংঘটন করেন।

রজনীতে সূর্য্যোদয় একটী অসম্ভব এবং অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার; কিন্তু মহাপুরুষের অভ্যুদয়ে বাস্তবিক পৃথিবীর ঘোর অজ্ঞান এবং অধর্ম্মের অন্ধকার রজনীর মধ্যে জ্ঞান ও ধর্ম্মসূর্য্যের

উদয় হয়। যখন সমস্ত পৃথিবী ভয়ানক সংসারাসক্তিরূপ শীতে জীর্ণ, শীর্ণ, সেই সময় যদি স্বর্গ হইতে কোন বৈরাগী মহাপুরুষ পৃথিবীতে পদার্পণ করেন, পৃথিবী তখনই পুণ্যের তেজ এবং বৈরাগ্যের উত্তাপ অনুভব করে। প্রেরিত মহাপুরুষের অভ্যুদয়ে পৃথিবী স্বর্গ এবং মনুষ্য দেবতা হয়। মহাপুরুষেরা পৃথিবীর রথকে শীঘ্র শীঘ্র স্বর্গের দিকে টানিয়া লইয়া যান। শত শত বৎসর পরে, সহস্র সহস্র বৎসর পরে পৃথিবী কিরূপ হইবে মহাপুরুষেরা তাহার পূর্ব্বাভাস দেখাইয়া যান।

দুই সহস্র বৎসর পরে পৃথিবী কিরূপ হইবে মহর্ষি ঈশা তাহার জীবনে তাহার পূর্ব্বাভাস দেখাইয়া গিয়াছিলেন। চারি শত বৎসর পরে ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ বঙ্গদেশ কিরূপ হইবে, নবদ্বীপে মহাত্মা শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার পূর্ব্বাভাস প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এই উনবিংশ শতাব্দীতে বহু ইংরাজী বিদ্যা অধ্যয়ন এবং ইউরোপীয় সভ্যতা দ্বারা যে সকল সুফল ঘটিতেছে, চারি শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার পূর্ব্বসূচনা করিয়া গিয়াছেন। যে দেশে জাতিভেদের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব ছিল, সেখানে উক্ত মহাত্মা তাঁহার প্রগল্‌ভা ভক্তি এবং উদার প্রেম বলে জাতিভেদ উঠাইয়া দিলেন।

বাস্তবিক সাধু মহাজনের জীবনে ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান হইয়া যায়। সহস্র সহস্র বৎসর পরে পৃথিবী কিরূপ পবিত্র ও উন্নত হইবে, সাধু মহাজনেরা তাহার আদর্শ দেখাইয়া দেন।

ভবিষ্যৎ কালে পৃথিবী নিশ্চয়ই স্বর্গ হইবে, ইহা কেবল তাঁহারাই দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত প্রচার করেন। তাঁহারাই কেবল স্বর্গীয় উৎসাহের সহিত আশাপূর্ণ হৃদয়ে বিশ্বাসবিহীন নিরাশ পৃথিবীকে বলেন, "সম্মুখে স্বর্গরাজ্য, পশ্চাতে চেও না ফিরে।" তাঁহারা নির্জ্জীব অলস পৃথিবীকে দ্রুতবেগে স্বর্গের দিকে টানিয়া লইয়া যান। এই কিছুকাল পূর্ব্বে পৃথিবী ব্যাল্যাবস্থায় ছিল; কিন্তু যখনই পৃথিবীতে একজন মহাপুরুষ অভ্যুদিত হইলেন, দেখিতে দেখিতে পৃথিবী যৌবনাবস্থা লাভ করিল। পৃথিবীর রথ কিরূপে এত দূর দৌড়িয়া আসিল? ঘড়ীর কাঁটা এত শীঘ্র কিরূপে স্থানান্তরিত হইল?

বাস্তবিক ঈশ্বরপ্রেরিত প্রত্যাদিষ্ট মহাজন বিদ্যুৎ অপেক্ষাও দ্রুতবেগে মানব-হৃদয়কে আন্দোলিত ও সঞ্চালিত করেন। মহাজনদিগের সতেজ আত্মা নির্জ্জীবকে নব-জীবন দান করে, নিরুৎসাহকে অগ্নিময় উৎসাহে পূর্ণ করে। যখন একজন প্রেরিত মহাজন পৃথিবীর বক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া দুর্জ্জয় তেজ এবং অটল বিশ্বাসের সহিত ঈশ্বরের সত্য প্রচার এবং ঈশ্বরের বাক্য উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করেন, তখন সহস্র সহস্র লোক সে সকল কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে এবং দ্রুতবেগে স্বর্গের দিকে ধাবিত হয়। শত শত লোক আসিয়া সেই মহাজন-মুখ-বিনির্গত সেই সকল অমৃতময় এবং অভ্রান্ত কথা পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া দেশ

দেশান্তরে প্রেরণ করে। তাঁহার প্রচারিত নিগঢ় স্বর্গীয় তত্ত্বকথা প্রচার করিবার জন্য চারিদিকে দত সকল প্রেরিত হয়। দতদিগের মুখে এবং পুস্তকাদি পাঠে ঐ সকল আশু পরিত্রাণপ্রদ সংবাদ লাভ করিয়া কোটি কোটি নর নারী অতি সহজে এবং স্বভাবতঃ ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট হয়।

সহস্র সহস্র বৎসরেও যাহা হইবার সম্ভাবনা ছিল না, মহাপুরুষের শিক্ষা ও যত্নে তিন বৎসরের মধ্যে সে সকল অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। মহাজন দেশ কাল অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ দেশাচার এবং সময়ের স্রোতের বিরুদ্ধে মহাতেজের সহিত ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করেন। দরস্থ ভবিষ্যৎ মহাজনের জীবনে বর্ত্তমান হয়। মহাজনের আগমনে পৃথিবীর উন্নতির রথ ভয়ানক নক্ষত্রবেগে ছুটিতে থাকে। দুই তিন বৎসরের মধ্যে দুই তিন সহস্র বৎসরের কার্য্য সমাধা হইয়া যায়। মহাপুরুষের তেজ দেখিয়া ভবিষ্যৎ বলে “আমি বর্ত্তমান হইলাম।” দুই সহস্র বৎসর পরে পৃথিবী যাহা বলিবে, একজন মহাজন দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর প্রতিনিধি হইয়া তাহা বলেন।

মহাজনের ভবিষ্যদ্বাণী অভ্রান্ত। ঈশ্বর স্বয়ং মহাজনের হৃদয়কে হস্তগত করিয়া জগতের নিকট তাঁহার ভবিষ্যৎ স্বর্গরাজ্যের শোভা প্রকাশিত করেন। মহাজন আপনার চরিত্রে এবং আপনার জীবনে প্রচুর পরিমাণে স্বর্গের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত করেন। মহাজনের আত্মার স্বর্গীয় লাবণ্য দেখিয়া

দূতগণ দেশ দেশান্তরে গমন করিয়া বলে, "হে ভাই ভগিনী-গণ, আমরা অমুক নগরে এক আশ্চর্য্য মানুষ দেখিয়া আসিলাম, যেমন তাঁহার চরিত্রের উৎকর্ষ, তেমনই তাঁহার আশ্চর্য্য উপদেশ দান করিবার ক্ষমতা, তাঁহার স্বর্গীয় জীবন দেখিয়া সহস্র সহস্র লোক দ্রুতবেগে স্বর্গের দিকে ধাবিত হইতেছে।" বাস্তবিক প্রত্যেক মহাজন স্বর্গের পূর্ব্বাভাস প্রকাশ করেন। পৃথিবী যে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই স্বর্গ হইবে, মহাজন আপনার জীবন দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করেন।

একজন মহাপুরুষ যদি বলেন "এই আমার বৈরাগ্য ও সংসারত্যাগে পৃথিবীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল" বাস্তবিক তাহাই হইল। মহাপুরুষের সে উক্তি মিথ্যা হইতে পারে না। অন্ধ অল্পবিশ্বাসী পৃথিবী হয় তো মহাপুরুষের উক্তি অবিশ্বাসপূর্ব্বক উপহাস করিয়া তাঁহাকে বলে, "হে সাধু-সজ্জন, তুমি বল তোমার বৈরাগ্যে তোমারই পাপের প্রায়-শ্চিত্ত হইল। তোমার প্রায়শ্চিত্তে কিরূপে সমুদয় পৃথিবীর প্রায়শ্চিত্ত হইবে?" কিন্তু বিশ্বাসী ভবিষ্যদ্বংশ একদিন মহাপুরুষের সেই উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবে। বস্তুতঃ প্রত্যাদিষ্ট হইয়া একজন মহাপুরুষ যে ক্রিয়া সম্পাদন করেন, সমস্ত পৃথিবী তাহার ফলভোগী হয়।

একজন মহাপুরুষ বলিলেন "পৃথিবী তৃষিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, স্বর্গরাজ্য কবে আসিবে?" সাধু মুখে এই কথা শুনিয়া অল্পবিশ্বাসীরা বলিল, "হে সাধু, পৃথিবীতে স্বর্গ-

রাজ্য কবে আসিবে, এ কথা কেবলই তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, পৃথিবীর দুর্গতি দেখিয়া তোমারই মনে খেদ হই-তেছে; পৃথিবী বাস্তবিক দুঃখিত হইয়া এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে না।" অল্পবিশ্বাসীরা মহাজনের মহাবাক্য সকলের গূঢ় অর্থ বুঝিতে পারে না; কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসীরা জানেন মহাজনই পৃথিবী, কেন না তিনি উন্নত মানবমণ্ডলীর প্রতিনিধি।

মহাজন ভবিষ্যতের সন্তান। তিনি আজ যাহা বলিলেন, পৃথিবী চারি সহস্র, আট সহস্র কিম্বা ততোধিক সময় পরে তাহাই বলিবে। মহাজনের পরিণামদর্শী দিব্যচক্ষের নিকটে ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, সুতরাং তিনি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন তাহা পৃথিবীর প্রশ্ন বলিয়া তিনি প্রকাশ করিতে পারেন, যদি একজন মহাপুরুষ বলেন, পৃথিবীর পাপ দুঃখের জ্বলন্ত অনল নির্ব্বাণ হইল, বিশ্বাস করিতে হইবে যে বাস্তবিক পৃথিবীর জ্বলন্ত অনল নির্ব্বাণ হইবার সূত্রপাত হইল।

যখন ধর্ম্মবীর শাক্যসিংহ প্রতিভা লাভ করিয়া দুর্জ্জয় সাহসের সহিত বলিলেন "আজ পৃথিবীর ত্রিতাপ নির্ব্বাণ হইল, আজ পৃথিবীর দুঃখাগ্নিতে শান্তিবারি বর্ষিত হইল;" তখন তিনি বাস্তবিক সমস্ত পৃথিবীর প্রতিনিধি হইয়া ঐ কথা বলিয়াছিলেন। সেইরূপ যখন মহর্ষি ঈশা জর্দ্দান নদীর জলে অবগাহন করিয়া বলিলেন "আজ পৃথিবী স্বর্গের পুণ্যজলে অভিষিক্ত হইয়া নির্ম্মল এবং শীতল হইল,

পৃথিবীর সন্তপ্ত প্রাণ জুড়াইল," তখন তিনি সমস্ত মানব-মণ্ডলীর প্রতিনিধি হইয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। আবার যখন শ্রীগৌরাঙ্গ ভয়ানক দস্যুতুল্য জগাই মাধাইকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া বলিলেন, "গঙ্গাজলে স্নান করাইয়া তোদের গলায় হরিনামের মালা দিব" তখন তিনি যে কেবল দুইজন পাপীকে আলিঙ্গন করিলেন তাহা নহে; কিন্তু তিনি সমস্ত পাপীমণ্ডলীর উপর তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ের প্রেমবারি বর্ষণ করিলেন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন, "আমি জগাই মাধাইকে আলিঙ্গন করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিলাম।" ক্ষীণবিশ্বাসী স্বার্থপর লোকেরা বলিল, "পৃথিবী বল কেন? দুইজন বল।"

বাস্তবিক অপ্রেমিকেরা জানে না যে একদিন জগাই মাধাইয়ের ন্যায় সমস্ত অবিশ্বাসী পাপীমণ্ডলী স্বর্গীয় উদার প্রেমবলে পরাস্ত হইবে এবং পুণ্যজলে স্নান করিয়া কণ্ঠে হরিনামের মালা পরিবে। বস্তুতঃ প্রত্যেক সাধু মহাজন বিস্তীর্ণ নরমণ্ডলীর প্রতিনিধি। যিনি যে মণ্ডলীর প্রতিনিধি, তাঁহার কথা সেই মণ্ডলীর কথা। তোমরা যদি দলবদ্ধ হইয়া রাজসভাতে তোমাদিগের কোন প্রতিনিধিকে প্রেরণ কর, সেই প্রতিনিধি তোমাদিগের কথা ভিন্ন আপনার কোন কথা বলিতে অধিকারী নহে। প্রতিনিধির নিজের স্বতন্ত্র কথা নাই। এই প্রতিনিধি নিয়োগের রাজ্যতন্ত্র ধর্ম্মরাজ্যে প্রয়োগ কর।

স্বর্গের প্রতিনিধি, সমস্ত মানবমণ্ডলীর প্রতিনিধি যখন বলিলেন, "এই যে আমি স্নান করিলাম ইহাতে পৃথিবীর স্নান হইল, এই যে আমার প্রাণ শীতল হইল, ইহাতে পৃথিবীর প্রাণ জুড়াইল," তখন তিনি ভবিষ্যৎ পৃথিবী সম্পর্কে এই কথা বলিলেন। ভবিষ্যৎ পৃথিবী তাহার প্রতিনিধির মুখে এই কথা বলিল। আরও বলি যখন কোন মহাপুরুষ বলেন, 'আমি আমার স্বর্গস্থ পিতার কাছে প্রকৃত পুত্রত্বের পরিচয় দিয়াছি এবং পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছি এবং আমার সঙ্গে সমস্ত মানবমণ্ডলী ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছে," তখন তিনি পৃথিবীর প্রতিনিধি হইয়া এই সত্য প্রচার করেন। ইহা আইনের কথা।

ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির গৃহে যত দিন সন্তান জন্মে নাই, তত দিন কেহই তাঁহার ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হয় নাই, তত দিন গৃহের সকলেরই মনে বিশেষতঃ স্বামী স্ত্রীর মনে এই খেদ হয়, "আহা! কে আমাদিগের এই বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবে?" কিন্তু যখনই সেই বাড়ীতে একটী সন্তান জন্মে, তৎক্ষণাৎ সকলের মন আনন্দে পুলকিত হয়, চারিদিকে আনন্দের রোল উঠিতে থাকে এবং আত্মীয় বন্ধুরা শঙ্খধ্বনি প্রভৃতি বিবিধ মঙ্গলাচরণ দ্বারা সকলের নিকট পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তনয়ের জন্ম বিজ্ঞাপন করে। তখন ভয় ভাবনা দুঃখ সন্তাপ তিরোহিত হয়। এত দুঃখ পরিশ্রমে অর্জ্জিত ধন সম্পত্তি ভোগ করিবার লোক

আসিল, এই মনে করিয়া সকলের মনে উল্লাস এবং পিতা মাতার মনে আনন্দের উচ্ছ্বাস হইতে থাকে।

পৃথিবীতে মনুষ্যসন্তান তাহার পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী; স্বর্গেও ঈশ্বরের সন্তান তাঁহার ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী। আবার পৃথিবীতে যেমন কুসন্তান পিতার সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়, ধর্ম্মসম্বন্ধেও সেইরূপ। যত দিন মনুষ্য নাস্তিক ও ঈশ্বরের অবাধ্য থাকে, তত দিন সে স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হইতে পারে না। ইহা সত্য বটে যে, ঈশ্বরের অনেক কুসন্তান আছে, কিন্তু তাঁহার একটীও ত্যক্ত সন্তান নাই, তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মনুষ্য যত দিন কুসন্তান থাকে, যদিও তাহাকে ঈশ্বর পরিত্যাগ করেন না, কিন্তু সে ঈশ্বরকে ভোগ করিতে পারে না।

কুসন্তানকে আপনার সন্তান বলিয়া স্বীকার করিতে প্রায় সকলেরই লজ্জা ও অপমান বোধ হয়। পৃথিবীর কোন সাধুর কুসন্তানকে যদি তাঁহার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে আমাদের লজ্জা বোধ হয়, তবে ঈশ্বরের কুসন্তানকে কিরূপে ব্রহ্মপুত্র বলা যাইতে পারে? যিনি পিতার অনুগত, তাঁহাকেই যথার্থ সন্তান বলা যাইতে পারে। সাধুর সন্তান যদি স্বেচ্ছাচারী ও অবাধ্য হয়, তাহাকে সেই সাধুর সন্তান বলিতে মনে নানা প্রকার সঙ্কোচ, ভয় এবং কষ্ট হয়, এবং অনেক ইতস্ততঃ করিয়া বলিতে হয়। সাধুর সন্তান অসাধু, ইহা সহজে অক্ষুব্ধ হৃদয়ে বলা যায় না।

সাধু পিতা এবং অসাধু সন্তান এই দুইয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ, যেমন স্বর্গ ও নরক, আলোক এবং অন্ধকার। নরককে কিরূপে স্বর্গের সন্তান বলা যাইতে পারে? স্বর্গের সন্তান নরক, ইহা বলিতে উদ্যত হইলেই যেন বাক্যরোধ হয়। পিতা জ্যোতির্ম্ময়, সন্তান অন্ধকার, ইহা কিরূপে সম্ভব? পুত্রের মধ্যে যদি পিতার কোন লক্ষণ না থাকে, তাহাকে কিরূপে পুত্র বলা যাইতে পারে? সেইরূপ যিনি ঈশ্বরের অনুরূপ, ঈশ্বরের ন্যায়, ঈশ্বরের মত, তাঁহাকেই ঈশ্বর সন্তান বলা যাইতে পারে। যাঁহার মধ্যে জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা এবং শান্তি প্রভৃতি ঈশ্বরের স্বরূপ ও লক্ষণগুলি আছে, তাঁহাকেই ঈশ্বরসন্তান বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। যাহার মধ্যে যত পরিমাণে ঈশ্বরের এই স্বভাব, লক্ষণগুলি আছে তিনি তত পরিমাণে ঈশ্বরের সন্তান অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যের অধিকারী।

স্বর্গস্থ পিতার যত টাকা কড়ি অথবা ধন ঐশ্বর্য্য আছে এমন আর কাহারও নাই। ঈশ্বরের সঙ্গে পৃথিবীর সর্ব্ব-প্রধান ধনাঢ্য কিম্বা অতুল ঐশ্বর্য্যশালী সম্রাটেরও তুলনা হয় না। এমন ঈশ্বরকে যিনি পিতা বলিয়া ডাকিতে পারেন তাঁহার কত সৌভাগ্য! "মরি কি সুখের সম্বন্ধ, যিনি মহান অনন্ত দেখেন পুত্র ভাবে, মলিন মানবে, ভাবিলে হৃদয় হয় পুলকিত। অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হয়ে, ক্ষুদ্র কীট মানবে দেখেন চাহিয়ে, মরি কি আশ্চর্য্য ভাই রে।" যে বাটীতে

এমন ঈশ্বরের পুত্র জন্মে সেই বাটীর কত সৌভাগ্য। স্বর্গ রাজ্যের অধিকারী একটী ব্রহ্মসন্তান জন্মিল ইহাতে সাধুদিগের মনে মহানন্দ।

প্রকৃত ব্রহ্মসন্তান কি? অনন্ত জ্ঞানের এক বিন্দু জ্ঞান, অনন্ত প্রেমের এক বিন্দু প্রেম, অনন্ত পুণ্যের এক বিন্দু পুণ্য, অনন্ত সুখের এক বিন্দু সুখ। যদি ধরাতলে স্বর্গস্থ ব্রহ্মখণ্ড দেখিতে চাও, তবে ব্রহ্মপুত্রকে দর্শন কর। এত বড় ঈশ্বর যাহার পিতা, ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী যাহার মা, তাহার আবার ভয় ভাবনা কি? কে বলিতে পারেন, "পবন, আমার কুমার কুমারীকে বাতাস কর? চন্দ্র, সূর্য্য, আমার কুমার কুমারীকে আলোক দাও? নদ, নদী, সমুদ্র, তোমরা আমার কুমার কুমারীর পদ ধৌত কর?" যিনি এমন করুণার সাগর ও প্রতাপান্বিত রাজা, যাঁহার রাজ্যের সীমা নাই, কে না তাঁহার সুসন্তান হইতে ইচ্ছা করিবে?

কে ইচ্ছাপূর্ব্বক এত বড় রাজ্যাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে? ঈশ্বরের সুসন্তানই তাঁহার রাজ্যের অধিকারী। ইউরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি ভূখণ্ড এবং সমস্ত পৃথিবীর কে অধিকারী হইবে? কেহ কেহ বলে জোর যার মুলুক তার। রুসিয়া যদি সর্ব্বাপেক্ষা বলবান হয়, রুসিয়া সমস্ত পৃথিবীর অধিকারী হইবে। কিন্তু ইহা নিতান্ত অসার কথা। কেন না প্রকৃত ব্রহ্মপুত্র ভিন্ন অন্য কেহই ব্রহ্মরাজ্যের অধিকারী হইতে পারে না। যে দিন

প্রকৃত ব্রহ্মতনয়ের জন্ম হইল, সে দিন পৃথিবীর আহ্লাদ হইল, কেন না পৃথিবীর যথার্থ স্বামী এবং অধিকারী জন্ম-গ্রহণ করিল।

ঈশ্বরের সাধু পুত্র তাঁহার সমস্ত রাজ্যের অধিকারী, এবং যিনি সমস্ত পৃথিবীর অধিকারী তিনিই আবার পৃথিবীর প্রতিনিধি। ঈশ্বর তাঁহার সাধুপুত্র, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পৃথিবীর অধিকার দিলেন। ঈশ্বর তাঁহার বড় পুত্রের মস্তকে হস্ত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার সমস্ত রাজ্য গ্রহণ কর। তুমি তোমার কনিষ্ঠদিগকে ইহার অধি-কারী করিও।" যখন আমাদিগের প্রতিনিধি একজন সাধু-পুত্র পিতার স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হইলেন, তাঁহার সঙ্গে আমরাও স্বর্গের অধিকারী হইলাম।

স্বর্গে আমাদিগের অধিকার জন্মিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও আমাদের স্বর্গভোগ হয় নাই, ভবিষ্যতে হইবে। এখনও আমরা বালক। যখন বালকত্ব যাইবে, তখন আমরা ভোগা-ধিকারী হইব। কিন্তু পৃথিবীতে স্বর্গ আসিয়াছে। আমা-দিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা স্বর্গ হস্তগত করিয়া ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগকে খুব আশা দিতেছেন। যখন একজন ভাই যথার্থ পুত্রত্বের পরিচয় দিয়া পিতার সম্পত্তির অধি-কারী হইয়াছেন, তখন আমরা সকলেই সেই সম্পত্তির অধিকারী হইব। ঈশা, শ্রীগৌরাঙ্গ, শুকদেব নারদ, শাক্য, মুসা প্রভৃতি আমাদিগের জন্য বহু পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহারা স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে পিতার ধন আনিয়া সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, আমরা যথা কালে সেই ধনের ভোগাধিকারী হইব। সাধুদিগের নিকটে ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, এই জন্য তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন, "ধন্য পৃথিবী, কেন না পৃথিবী স্বর্গের ধন সম্পত্তির অধিকারী হইল!" আমরা জন্মে ঈশ্বর-সন্তান, কিন্তু এখনও স্বভাবে ঈশ্বরসন্তান হই নাই, যখন স্বভাব চরিত্রে তাঁহার উপযুক্ত সুসন্তান হইব, যখন দ্বিজ হইব, তখন মঙ্গলময়ী আনন্দময়ী মাকে ভালবাসিয়া তাঁহার স্বর্গরাজ্যের ভোগাধিকার লাভ করিব।

স্বর্গীয় উদ্বাহ।

রবিবার ৩১শে শ্রাবণ, ১৮০৩ শক; ১৪ই আগষ্ট ১৮৮১।

আমাদিগের নিকৃষ্ট নীচ জীবনে যাহা কিছু হয় তাহার উপমা, তাহার উচ্চতম আদর্শ, আমরা আমাদিগের আধ্যাত্মিক জীবনে দেখিতে পাই। শরীর এবং আত্মা অথবা পশু এবং দেবতার মধ্যে সাদৃশ্য আছে, ইহা হয় তো অনেকেই বিশ্বাস করিবেন না; কিন্তু গভীর ভাবে আলোচনা করিলেই সকলেই ইহা সত্য বলিয়া মানিবেন। চক্ষু দেখে কেন? ভবিষ্যতে আত্মা দেখিবে এই জন্য। শরীরের চক্ষু সৃষ্টির সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমোহিত হয়; আত্মার উজ্জ্বল বিশ্বাসচক্ষু স্রষ্টার অরূপ রূপ দেখিয়া বিমুগ্ধ হয়। কর্ণ

শুনে কেন? ভবিষ্যতে আত্মার বিবেক কর্ণ ঈশ্বরের আদেশ শুনিবে এই জন্য। হস্ত ধরে কেন? ইহার গূঢ় অর্থ এই যে যখন বাহিরে দুটী হাত অবসন্ন হইয়া পড়িবে, তখন আত্মার ভিতর হইতে ভক্তিহস্ত বাহির হইয়া ব্রহ্মচন্দ্র ধারণ করিবে। পা চলে কেন? পশুও চলে। মনুষ্যের শরীরে দুটী চরণ সংলগ্ন হইল কেন? অবশ্যই ইহার কোন গূঢ়-তর অর্থ আছে। শরীরে যেমন গতিশক্তি দিয়াছেন, বিধাতা আত্মার মধ্যেও গতিশক্তি নিহিত রাখিয়াছেন, সেই গতি-শক্তি দ্বারা আত্মা সতেজে "থাক্‌ব না আর এ পাপ রাজ্যে ব্রহ্মলোকে যাব চলে" এই কথা বলিতে বলিতে দুর্দ্দশা ও অন্ধকারের রাজ্য ছাড়িয়া দিব্যধামে চলিয়া যাইবে।

পশুও আহার পান করে, আমরাও আহার পান করি; কিন্তু পশু ও আমাদিগের মধ্যে কি কোন প্রভেদ নাই? ঈশ্বরের এই গূঢ় অভিপ্রায় যে, আহার পান দ্বারা যেমন শরীরকে সবল পুষ্ট ও কান্তিযুক্ত করি, তেমনি আমরা পুণ্যান্ন ভোজন এবং হরিনামরস আস্বাদন করিয়া আত্মাকে সতেজ হৃষ্টপুষ্ট ও সুন্দর করিয়া তুলিব। ভবিষ্যতে আত্মার মধ্যে যে সকল ইন্দ্রিয় প্রকাশিত হইয়া কার্য্য করিবে, এখন শরীরের মধ্যে তাহারই অনুরূপ ইন্দ্রিয় সকল সংযোজিত হইয়াছে। উচ্চতর নিরাকার রাজ্যের দিকে লইয়া যাইবার জন্য অথবা মনুষ্যকে পরলোকের নিমিত্ত প্রস্তুত করিবার জন্য, তাহার শরীরের মধ্যে বিবিধ ইন্দ্রিয় সকল সংলগ্ন করা

হইয়াছে। এ সকল শারীরিক ইন্দ্রিয় দ্বারা যেমন সৃষ্ট জগতের নানা প্রকার গুণ গ্রহণ করা যায়, আত্মার ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা তেমনই স্রষ্টার গূঢ়তম তত্ত্ব সকল আবিষ্কৃত হয়। যেমন আত্মার মধ্যে শারীরিক দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ প্রভৃতি ক্রিয়ার সাদৃশ্য আছে, তেমনি মনুষ্যের বাহ্যিক উদ্বাহ ক্রিয়ার সঙ্গে তাহার আন্তরিক উদ্বাহেরও মিলন আছে।

প্রকৃত উদ্বাহের অভিপ্রায়, ভাব, কর্ত্তব্য, ব্রত সমুদয় পৃথিবীতে পরিসমাপ্ত হয় না। পৃথিবীর উদ্বাহ একটী সোপান মাত্র। এই সোপান অবলম্বন করিয়া অসংখ্য নরনারী অনন্ত রাজ্যের সঙ্গে যোগ সংস্থাপন করে। যাহারা শরীরকে বিবাহ করে, তাহারা বিবাহের গূঢ়তর তত্ত্ব জানে না। যাহারা কেবল শারীরিক অথবা সংসারিক সুখভোগের জন্য উদ্বাহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়, তাহারা বিবাহের যথার্থ সুখ অনুভব করিতে পারে না। যে সকল নরনারী বিবাহযোগে মিলিত হইয়া অতি নীচ ভাবে জীবনক্ষেত্রে বিচরণ করে, তাহারা বিবাহের স্বর্গীয় আদর্শ এবং আমোদ জানে না।

প্রকৃত বিবাহ আত্মায় আত্মায় যোগ। বিবাহের অর্থ পূরণ। পূর্ব্বে যাহা অৰ্দ্ধ অৰ্দ্ধ ছিল, বিবাহ দ্বারা সেই দুই অৰ্দ্ধ একত্র হইয়া পূর্ণ হয়। দুই কখন এক হয় না। যাহা অৰ্দ্ধ ছিল তাহা অপরার্দ্ধের সঙ্গে একত্র হইলে এক হয়। দাম্পত্যপ্রণয়ে যে স্বামী স্ত্রীর বন্ধন হয় তাহা দুই জনের ঐক্য নহে। দুই জনের ঐক্যকে পৃথিবীতে বন্ধুতা বলে।

পিতা পুত্রের ঐক্য, দুই সহোদরের ঐক্য, কিম্বা দুই বন্ধুর ঐক্য, ইহার সঙ্গে স্বামী স্ত্রীর ঐক্যের অনেক প্রভেদ। উদ্বাহবন্ধন সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন; উদ্বাহবন্ধনে স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের মিলন এত গূঢ় ও গাঢ় হয় যে আর কোথাও তাহার তুলনা নাই। অন্যান্য সকল মিলন অপেক্ষা উদ্বাহের মিলন উৎকৃষ্টতর। যথার্থ উদ্বাহের মিলন উৎকৃষ্টতম।

যেখানে স্বার্থত্যাগ করিয়া দুইজন পরস্পরকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করে, সেখানে আমরা স্বর্গের শোভা দর্শন করি ইহা সত্য। যেখানে স্নেহময়ী জননী আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়া নানা প্রকার দুঃখ যন্ত্রণা বহন করিয়া সন্তান পালন করেন, সেখানেও আমরা স্বর্গের সৌন্দর্য্য দর্শন করি। যে কোন স্থানে আমরা নিঃস্বার্থ বন্ধুতা অথবা নিষ্কাম স্নেহ দেখিতে পাই, সেখানে আমরা স্বর্গের পূর্ব্বাভাস দেখিয়া পুলকিত হই, কিন্তু বন্ধুতা ও অপত্যস্নেহ অপেক্ষাও উদ্বাহ-জনিত বিশুদ্ধ দাম্পত্যপ্রেম গাঢ়তর। বন্ধুতা অথবা অপত্য-স্নেহে দুই জনের ঐক্য হয়; কিন্তু বিবাহে অর্দ্ধ অর্দ্ধ মিলিত হইয়া এক হয়। এই অর্দ্ধে অর্দ্ধে মিলন নিগূঢ় রহস্য।

নরপ্রকৃতি অর্দ্ধ, নারীপ্রকৃতি অর্দ্ধ, এই দুই অর্দ্ধ একত্র হইলে এক হয়। যতক্ষণ এই দুই অর্দ্ধ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে, ততক্ষণ প্রত্যেক অর্দ্ধ অপূর্ণ থাকে। যখন এই দুই একত্র হইয়া এক হয়, তখন তাহারা পূর্ণ হয়। যখনই ঈশ্বর অর্দ্ধ সৃজন করিলেন, তখন সেই অর্দ্ধের মধ্যে

ঈশ্বর এরূপ প্রকৃতি দিলেন যে, সেই অৰ্দ্ধ তাহার অপরার্দ্ধকে খুঁজিয়া বাহির করিবেই করিবে। যেমন পৃথিবী আপন স্বভাববশতঃ সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিবেই ঘুরিবে, তেমনি স্বধর্ম্মগুণে অৰ্দ্ধ নরপ্রকৃতি আপনার অপরার্দ্ধ নারীপ্রকৃতিকে খুঁজিয়া বাহির করিবেই করিবে। যতক্ষণ অৰ্দ্ধ অৰ্দ্ধ থাকে, ততক্ষণ সেই অৰ্দ্ধ সৰ্ব্বদা জিজ্ঞাসা করে, "আমার অপরার্দ্ধ কৈ ?"

স্ত্রী ভাবে, আমার স্বামী কে ? পুরুষ ভাবে আমার স্ত্রী কে ? পুরুষ বলে আমি কাহাকে স্ত্রী বলিব ? স্ত্রী বলে আমি কাহাকে স্বামী বলিব ? পুরুষপ্রকৃতি ঈশ্বরকে অন্বেষণ করে। এক অৰ্দ্ধ যতক্ষণ না তাহার অপরার্দ্ধকে পায়, ততক্ষণ সে এইরূপ চিন্তায় নিযুক্ত থাকে। তোমরা মনে কর নর নারীর উদ্বাহের জন্য অনেক ঘটকের প্রয়োজন, কিন্তু গভীর ভাবে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিবে নর নারীর আপন আপন অন্তরস্থ স্বভাবই তাহাদিগের বিবাহের প্রধান ঘটক।

কোন্ দেশের লোককে কোন প্রকৃতির পুরুষকে স্বামী বলিয়া বরণ করিবে; কোন্ দেশের নারীকে, কি প্রকৃতির নারীকে পত্নী বলিয়া বরণ করিবে, ইহা কাহাকেও শিক্ষা দিতে হয় না। নর নারী আপন আপন স্বভাবানুসারে পরস্পরকে বরণ করে, সময়ের পূর্ণতা হইলেই এক অৰ্দ্ধ অপরার্দ্ধকে খুঁজিয়া লয়। মনের প্রস্ফুটিত অবস্থায় আত্মা আপনার স্বামী কি আপনার স্ত্রীকে চিনিয়া লয়। এক অৰ্দ্ধ

যখন প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া আমোদ প্রমোদ করে তখন সে বলে আমার এই আমোদ প্রমোদের একজন অংশী চাই। সে তাহার হৃদয়ের বাগানবাড়ী সাজাইয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকে, কখন অপরার্দ্ধ আসিয়া তাহার বাড়ী অধিকার করিবে এবং তাহার আমোদপ্রমোদের ভাগী হইবে।

পুরুষ সহধর্ম্মিণী এবং স্ত্রী ধর্ম্মপতি অন্বেষণ করে। প্রত্যেকেই বলে, "আমি ধর্ম্মসাধনের একজন সহায় চাই। যোগাসনে বসিয়া যখন আমি পরমেশ্বরকে দীনবন্ধু বলিয়া ডাকিব, তখন আমার সেই অপরার্দ্ধ আমার সঙ্গে মিলিয়া তাঁহাকে দীনবন্ধু বলিয়া ডাকিবে।" কেহ কেহ বলে বিবাহ বিধাতার নির্ব্বন্ধ। কাহার সঙ্গে কাহার বিবাহ হইবে ইহা বিধাতা পূর্ব্বেই তাহাদিগের কপালে লিখিয়া রাখেন। যাহা ভবিতব্য, তাহা ঘটিবেই ঘটিবে। বাস্তবিক এ বিধান এক ভাবে কপালে লেখা আছে, আর এক ভাবে কপালে লেখা নাই; অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বজ্ঞ বিধাতা কাহার সঙ্গে কাহার বিবাহ সঙ্গত তাহা পূর্ব্বেই তাহাদের প্রবৃত্তিতে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু তিনি কাহারও কপালে সংস্কৃত, গ্রীক্, লাটিন অথবা অন্য কোন ভাষায় পাত্র পাত্রীর নাম লিখিয়া দেন নাই। তাঁহারই ইঙ্গিতে, তাঁহারই নিয়মে, এক অর্দ্ধ অপরার্দ্ধকে খুঁজিয়া লয়।

যখন এক অর্দ্ধ অপরার্দ্ধের সঙ্গে মিলিত হইয়া এক মন, এক আত্মা এবং এক প্রাণ হয়, তখন স্বর্গে শঙ্খধ্বনি হয় এবং

প্রেমভেরী বাজে। উদ্বাহবন্ধনে এইরূপে দুই অর্দ্ধ একাত্মা হওয়াই প্রকৃত বিবাহ। এই বিবাহে যাহা পূর্ব্বে বিধাতার লেখা ছিল তাহা পূর্ণ হয়, বিধাতার অভিপ্রায় সম্পন্ন হয়। যাহারা বিবাহকে সামান্য সাংসারিক অথবা শারীরিক ব্যাপার মনে করে, তাহারা প্রকৃত বিবাহতত্ত্ব জানে না। শরীরের চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি যেমন আত্মার ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্ম-বাণী শ্রবণ, ব্রহ্মস্পর্শ এবং আত্মার গতিশক্তি প্রভৃতির অনুরূপ, সেইরূপ বিবাহ অথবা নর নারীর মিলন জীবাত্মা এবং পরমাত্মার যোগের অনুরূপ। পৃথিবীতে যেমন নর নারীর বিবাহ হইতেছে, স্বর্গে সেইরূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ হইতেছে। একদিন ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী যোগেশ্বরের সঙ্গে প্রত্যেক আত্মার বিবাহ হইবে বলিয়া পৃথিবীতে কোটি কোটি বিবাহ হইতেছে।

সামান্য পশু যেমন আর একটী পশুর সঙ্গে থাকে, নর নারী বিবাহ সেরূপ নহে। নিকৃষ্ট জীব এবং পশুদিগের মধ্যে প্রণয় আছে তাহা কে অস্বীকার করিবে? পাখীর প্রতি পাখীর প্রণয় আছে, জন্তুর প্রতি জন্তুর প্রণয় আছে; কিন্তু সেই প্রণয়ের সহিত দাম্পত্যপ্রেমের তুলনা হইতে পারে না। স্বামী স্ত্রীর বিশুদ্ধ প্রণয় চিরস্থায়ী, এবং যোগী ও যোগে-শ্বরের প্রেমের অনুরূপ। বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রণয় স্বর্গের পূর্ব্বাভাস প্রদর্শন করে। শত সহস্র বৎসর পরে ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার যে সম্বন্ধ হইবে, স্বামী স্ত্রীর পবিত্র প্রণয়

সেই সম্বন্ধের পরিচয় দেয়। পৃথিবীতে পুরুষ যেমন "আমার স্ত্রী কৈ?" স্ত্রী যেমন "আমার স্বামী কৈ?" এই বলিয়া ব্যাকুল হয়, সেইরূপ জীবাত্মাও একদিন পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া পাগলের ন্যায় বলিবে, "আমার প্রাণপতি কৈ? আমার প্রাণেশ্বর কৈ? আমার প্রাণকান্ত হৃদয়রঞ্জন কৈ?" বাস্তবিক উন্নত পরিপক্ক অবস্থায় বিবাহের জন্য আত্মা পাগল হয়।

পরমাত্মার জন্য ব্যাকুলিত আত্মা উন্মাদের ন্যায় বলে, "অবিবাহিত অবস্থায় কিরূপে জীবন ধারণ করিব? আমার একতারা, ধর্ম্মগ্রন্থ, গৈরিক বসন প্রভৃতি সকলই আমার নিকটে আছে; কিন্তু আমার প্রাণেশ কৈ? কবে তাঁহার সঙ্গে বিরলে বসিয়া যোগানন্দরস পান করিব? কবে তিনি আমি একাসনে বসিয়া প্রেমালাপ করিব? কবে মিশে নদী জলধিতে হবে একাকার?" বাস্তবিক স্বর্গপতি, সর্ব্বপতি, বিশ্বপতি, প্রাণপতি ঈশ্বরের সঙ্গে গাঢ় প্রাণগত যোগ স্থাপিত না হইলে জীবাত্মা কিছুতেই প্রকৃত সুখ শান্তি লাভ করিতে পারে না। জীবাত্মা তাঁহাকেই বিবাহ করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, সেই পরম সুন্দর প্রেমময় হরি প্রত্যেক জীবাত্মার বর। তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলেই জীবের সুখ। তাঁহার মত প্রাণের সুহৃৎ ও সর্ব্বসুখদাতা আর কেহ নাই, তিনিই পূর্ণ সুখ। অতএব সকলে সেই সত্য শিব সুন্দর, সেই শ্রেষ্ঠতম বর, সেই ভুবনমোহন পরম সুন্দর হরিকে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হও।

সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষ স্ত্রীজাতি এবং পুরুষজাতি উভয়ের পতি এবং উভয় জাতির পূজনীয় ও সেবনীয় দেবতা। তাঁহার সঙ্গে বিবাহরূপ গূঢ় প্রেমযোগ না হইলে কেহই নিত্য সুখের অধিকারী হইতে পারে না। হে জীব, নিকৃষ্ট শরীরের বিবাহকে স্বর্গীয় বিবাহে পরিণত কর। উৎকৃষ্টতম বিবাহের পথ, শ্রেষ্ঠতম যোগের পথ অবলম্বন কর। নীচ ঐহিক সুখলালসা নির্ব্বাণ করিয়া সেই পূর্ণানন্দ নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সঙ্গে মহাযোগ নিত্যযোগ সাধন কর। এমন সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরমসুন্দর মৃত্যুঞ্জয় বর বর্ত্তমান থাকিতে কেন নিকৃষ্ট মরণশীল পাত্রে অনুরক্ত হইবে? স্বামী স্ত্রীকে বলুন, "হে ধর্ম্মপত্নি, আমার হৃদয় তোমার হউক।" স্ত্রী স্বামীকে বলুন "হে ধর্ম্মপতি, আমার হৃদয় তোমার হউক।" আবার স্বামী স্ত্রী উভয়ে সম্মিলিত হইয়া বলুন, "আমাদের উভয়ের হৃদয় ঈশ্বরের হউক।" এইরূপে নর নারী উভয়ে ব্রহ্মবরকে পতিত্বে বরণ করিয়া নিত্য সুখ ভোগ করুন।

মহাজনের অলৌকিক নির্ভর।

রবিবার, ২০শে ভাদ্র, ১৮০৩ শক; ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৮৮১।

যাহা লৌকিক তাহা লৌকিক এবং যাহা অলৌকিক তাহাও লৌকিক। যাহা সাধারণরূপে চলিতেছে তাহাও নিয়মে হয়, যাহা সময়ে সময়ে অসাধারণরূপে ঘটিতেছে

তাহাও ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত নিয়মাধীন। পৃথিবীর যে সকল ব্যাপার অলৌকিক বলিয়া পরিগণিত, তৎসমুদয়ও লৌকিক নিয়ম দ্বারা নিষ্পন্ন করা যায়। বাস্তবিক নিয়মের অতীত কোন ঘটনা হয় না, হইতে পারে না; অথচ লৌকিক অলৌকিক দুইই স্বীকার করিতে হইবে। মহাজনদিগের পক্ষে অলৌকিক ব্যাপার আবশ্যক। অলৌকিক ব্যাপার ভিন্ন সামান্য লক্ষণে মহাজনের সত্য প্রতিপন্ন করা যায় না।

পৃথিবী মহাজনের জীবনে অলৌকিক তেজ ও ক্ষমতা দেখিতে চায়। সামান্য সাক্ষ্যদানে মহাজন পৃথিবীর নিকট গৃহীত হন না। পৃথিবী বলে, যদি তুমি মহাজন বলিয়া পরিচিত হইতে চাও, তবে এক খণ্ড রুটি লইয়া শতাধিক লোককে খাওয়াইতে হইবে, এবং এক বিন্দু জলে সহস্রাধিক লোকের তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হইবে। এ সকল কিম্বা এ প্রকার কোন অলৌকিক ক্রিয়া করিতে না পারিলে লোকে তোমাকে মহাজন বলিয়া গ্রহণ করিবে না। মহাজন অথবা অসাধারণ লোক হইলেই সাধারণ লোকের অতীত অলৌকিক কোন ক্ষমতা দেখাইতে হইবে।

হে প্রেরিত মহাজন, তুমি সামান্য ক্রিয়া দেখাইয়া নিশ্চিন্ত হইও না। অসামান্য লক্ষণ ভিন্ন কেহই পৃথিবীতে অসাধারণ লোক কিম্বা মহাজন বলিয়া গৃহীত হন নাই। যদি সাধারণ লোকের দুষ্প্রাপ্য শ্রদ্ধা ও সম্মান চাও, তবে অসাধারণ বিশ্বাস, নির্ভর ও তেজ দেখাইতে হইবে। যদি

আপনাকে ঈশ্বরের বিশেষ চিহ্নিত লোক বলিয়া পরিচয় দিতে চাও, তবে আপনার জীবনে অলৌকিক বল অর্থাৎ লোকাতীত দৈববলের চিহ্ন দেখাইতে হইবে। বাস্তবিক আমাদিগের জীবনে যদি স্পষ্টরূপে ঈশ্বরের শক্তি না দেখিতে পাই, তবে আমরা যে অপর সাধারণ লোক অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থায় অবস্থিত, তাহা কিরূপে বিশ্বাস করিব ?

পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক মহাজনসম্পর্কে এই একটী অলৌকিক ক্রিয়া লেখা আছে যে, যেখানে আকাশ, শূন্য, কিছুই নাই, সেখানে তিনি তাঁহার এবং তাঁহার বন্ধুদিগের খাদ্য পাইয়াছিলেন। মহাজনেরা মুক্তকণ্ঠে পৃথিবীকে এই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, "কেহ কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না।" "সর্ব্বাগ্রে তোমরা স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, পরে তোমাদিগের যাহা যাহা প্রয়োজনীয় সে সমস্ত তোমাদিগকে দেওয়া হইবে।" "তোমরা কেবল ধর্ম্মচিন্তা করিবে অর্থাৎ কিরূপে তোমাদের স্বর্গস্থ প্রভুর ইচ্ছা পালন করিবে কেবল সেই বিষয়ে মনোযোগী হইবে, তোমাদিগের প্রভু স্বয়ং তোমাদিগের সকল অভাব মোচন করিবেন।"

মহাজনেরা যদি আপনাদিগের জীবনের শক্ত ভূমির উপরে পরীক্ষা দ্বারা এই সত্য অনুভব না করিতেন, তাঁহারা যদি আপনারা প্রভুর কর্ম্মক্ষেত্রে কার্য্য করিয়াও ক্ষুধা তৃষ্ণায় কষ্ট পাইতেন, তাহা হইলে কখন তাঁহারা পৃথিবীকে এই উপদেশ দিতেন না। মহাজনেরা আপন আপন জীবনে এবং

শিষ্য প্রশিষ্যদিগের জীবনে এই সত্যের এত প্রমাণ পাইয়াছিলেন যে, তাহাতে তাঁহারা দুর্জ্জয় বিশ্বাসের সহিত জগৎকে বলিয়া গিয়াছেন যে, "যে কেহ ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে, এবং সর্ব্বাগ্রে স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ করে, ঈশ্বর স্বয়ং তাহার ধন ধান্য হন।"

মহাজনদিগের এই কথা তাঁহাদিগের অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিতেছে। মহাজনেরা যদি অটল বিশ্বাসের সহিত এই কথা বলিতে না পারিতেন, তাহা হইলে জগতে আজ ঈশা মুসা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি মহাজনদিগের এত কীর্ত্তি থাকিত না। পৃথিবী কেন মহাজনদিগকে ঈশ্বরপ্রেরিত বলিবে? এবম্প্রকার উচ্চ বিশেষণ তাঁহাদিগকে কেন দিবে? তাঁহারা দেখাইয়াছিলেন তাঁহারা আকাশ ও বায়ুকে অন্ন করিতে পারেন। বিপদ্ভঞ্জন ভগবান মহাজনদিগকে বলেন, "যেখানে দেখিবে কিছুই খাদ্য সামগ্রী নাই, সেখানে তোমরা সহস্র সহস্র লোকের আহার যোগাইতে পারিবে, তোমাদিগকে এই অলৌকিক শক্তি দেওয়া হইল।"

এই অলৌকিক বল একজন মহাপুরুষের মধ্যে বদ্ধ নহে, দেখিতে পাওয়া যায় পৃথিবীর প্রায় সকল মহাপুরুষেরাই এই অলৌকিকবলসম্পন্ন হন। মহাজনদিগের এই বল-প্রভাবে সমূহ বিপদের ভিতরে পড়িয়াও তাঁহাদিগের শিষ্য প্রশিষ্যেরা রক্ষা পাইয়াছেন। বাস্তবিক ঈশ্বর যাঁহাদিগের সহায়, তাঁহাদিগের কিছুতেই ভয় নাই। তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে

অকিঞ্চন ও নিঃসম্বল হইয়াও পরমধনে ধনী। ঈশ্বরের জন্য যাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেন, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে সকল প্রকার আপদ বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য যাঁহাদিগের টাকা ছিল, তাঁহারা টাকা ফেলিয়া দিলেন, আয়ের যত প্রকার উপায় ছিল সমুদয় পরিত্যাগ করিলেন, আর যাঁহাদের টাকা ছিল না তাঁহারা বলিলেন, "আমাদের সখা চড়াই পক্ষীকে আমাদিগের দয়াময় স্রষ্টা খাইতে দেন, আমরা তাঁহার ভক্তদাস আমাদিগকে কি তিনি পরিত্যাগ করিবেন?" বাস্তবিক যাঁহারা ঈশ্বরের জন্য সর্ব্ব-ত্যাগী হন, সমস্ত পৃথিবী তাঁহাদিগের উত্তরাধিকার হয়, তাহাদিগের কোন অভাব থাকে না।

কথিত আছে, পূর্ব্বতন যোগী ঋষি এবং সন্ন্যাসী তপস্বীগণ পর্ব্বতশিখরে অথবা গভীর অরণ্য মধ্যে বসিয়া যোগ তপস্যা করিতেন, আকাশ হইতে তাঁহাদিগের জন্য খাদ্য বর্ষণ হইত। ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে তোমাদিগকে সে সকল অযথার্থ অলৌকিক ক্রিয়া বিশ্বাস করিতে বলা হইতেছে না। প্রকৃত মহাজনেরা সে সকল বাহ্যিক অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া আপনাদিগের অলৌকিকতা প্রমাণ করেন না। পাঁচখানি রুটি দিয়া পাঁচ হাজার লোককে খাওয়াইয়া কিম্বা জলের উপর দিয়া চলিয়া গিয়া সামান্য লোক সকলকে চমকিত করিয়া তাহাদিগের শ্রদ্ধা উদ্দীপন করা মহাজনদিগের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু তাঁহারা অন্ন চিন্তা না করিয়াও অন্ন লাভ করেন,

ইহাই তাঁহাদিগের অলৌকিক ক্ষমতা। তাঁহারা কৃষিকর্ম্ম করেন না, অথবা অর্থোপার্জ্জনের জন্য অন্য কোন ব্যবসায় অবলম্বন করেন না; অথচ তাঁহাদিগের জীবন রক্ষার জন্য ধন ধান্য আসে কিরূপে? তাঁহারা লোকের কাছে গিয়া ভিক্ষা করেন না, অথচ তাঁহাদিগের জন্য অন্ন বস্ত্র আসে কিরূপে?

এই নিগূঢ় তত্ত্ব যদি তুমি বুঝিতে, কিম্বা যদি আমি বুঝিতাম, তাহা হইলে আমরা মহাজনদিগকে এত আদর করিতাম না। আমরা যেমন বিষয় কর্ম্ম করিয়া দশ পাঁচ টাকা অর্জ্জন করিয়া আনি, ঈশা মুসা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি মহাজনেরা যদি সেরূপ করিতেন, তাঁহাদিগকে আমরা মহাজন বলিতাম না। যদি তাঁহারা সাধারণ লোকদিগের ন্যায় অর্থোপার্জ্জন করিতেন, তাহা হইলে আমরা বলিতাম "ঈশা মুসার ধর্ম্মভাব আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল সত্য বটে, কিন্তু তাঁহারাও সাধারণ লোকাদগের ন্যায় সামান্য সামান্য উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন।" কিন্তু বাস্তবিক মহাজনগণ সাধারণ লোকদিগের শ্রেণীর বহির্ভূত। সাধারণ লোকেরা বলে, আমরা এইরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিব, মহাজনেরা বলেন এ সকল অবিশ্বাস ও নাস্তিকতার ব্যবহার। সাধারণ লোকেরা বলে, আমরা যদি চাকরী করিয়া টাকা না আনি, তবে আমাদিগের স্ত্রী পুত্রাদির অন্ন বস্ত্র কোথা হইতে আসিবে? এ সকল কথা শুনিয়া মহাজনেরা তাহা-দিগকে কলঙ্কিত নাস্তিক মনে করেন।

সাধারণ লোকদিগের পক্ষে ঈশ্বরাবমাননা যেমন পাপ, মহাজনদিগের পক্ষে কল্যকার জন্য চিন্তা করা তেমনই অধর্ম্ম। তাঁহারা কল্যকার জন্য ভাবিতেন না, এই জন্য তাঁহারা সর্ব্বদা পাখীর ন্যায় প্রফুল্ল থাকিতেন। ঈশ্বরের অঙ্গীকার ও দয়ার উপরে কদাচ তাঁহাদিগের সন্দেহ হইত না। যাহারা ঈশ্বরের প্রেমে অবিশ্বাস করে, তাহারা নাস্তিক শ্রেণীভুক্ত। ভক্ত মহাজনদিগের হস্তে ঈশ্বর তাঁহার সমস্ত ভাণ্ডারের চাবি দান করেন। তাঁহাদিগের আর ভয় ভাবনা থাকিবে কেন? পাহাড়ের উপরে যোগী বসিয়া যোগ ধ্যান করিতেছেন, লোকালয় হইতে বহু দূরে গঙ্গাতীরে বসিয়া ভক্ত ভক্তিসাধন করিতেছেন, কে তাঁহাদিগকে অন্ন দেয়? পাখীদিগকে জিজ্ঞাসা কর। যিনি আকাশের পক্ষী সকলকে আহার দেন, যিনি জলের মৎস্য সকলের প্রাণরক্ষা করেন, যিনি অরণ্যের পশুসকলকে তাহাদিগের উপযুক্ত খাদ্য দেন, তিনিই তাঁহার সর্ব্বত্যাগী যোগী সন্ন্যাসীদিগকে আহার দান করেন।

ঈশ্বর তাঁহার প্রেরিত মহাজনদিগকে বলেন, "তোমরা যদি সামান্য বিষয়ী ও কৃষকদিগের মত ধন ধান্য অর্জ্জন কর, তাহা হইলে আমার নাম ডুবিবে। তোমরা অসাধারণ প্রণালীতে তোমাদিগের অন্ন ও অপরাপর প্রয়োজনীয় বস্তু সকল লাভ করিবে, তোমরা প্রস্তরে আঘাত করিবে, আর প্রস্তরের ভিতর হইতে জল বাহির হইবে, তোমরা আকাশের

পানে তাকাইবে, আর আকাশ হইতে তোমাদিগের জন্য খাদ্য আসিবে; তোমরা কেবল আমার দিকে তাকাইয়া থাকিবে এবং আমার ইচ্ছা পালন করিবে, তাহা হইলে তোমরা দেখিতে পাইবে, আমি স্বয়ং তোমাদিগের সকল অভাব মোচন করিতেছি। তোমরা যদি তোমাদিগের আত্মীয় বন্ধু কি খাইবে, এই ভাবনায় ভীত হও, তাহা হইলে পলকের মধ্যে পৃথিবী ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইবে, বিশ্বাস নির্ভর চলিয়া যাইবে এবং সত্যসূর্য্য অস্তমিত হইবে। তোমরা পৃথিবীকে অলৌকিক বিশ্বাস ও নির্ভরের দৃষ্টান্ত দেখাইবে।”

যাঁহারা ঈশ্বরের দাস, যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করেন, তাঁহারা আপনাদিগের অন্ন বস্ত্রের জন্য চিন্তিত হইবেন না। ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহাদিগের জীবিকার ভার গ্রহণ করেন। ঈশ্বর নিজে পৃথিবীর মনে তাঁহার সাধু ভক্তদিগের সেবা করিবার জন্য ইচ্ছা ও ভাব উত্তেজিত করেন। সাধুর নামে সকলের শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এই যে আমরা এই দুষ্ট পৃথিবীর মধ্যেও ভক্তের প্রতি এত আদর দেখিতে পাই, ইহা কেবল সাক্ষাৎ ঈশ্বরের লীলা। সাধুর অন্নসংস্থান নাই, সাধুর গাত্রে বস্ত্র নাই, ইহা দেখিলে পৃথিবীর মনে কষ্ট হয়। পৃথিবীর বড় বড় ধনী রাজারা পর্য্যন্ত মান অপমান চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরপ্রেরিত ব্রহ্মচারীদিগের সেবায় নিযুক্ত হন। পরমহংসের সেবায় নিযুক্ত হইলে পৃথিবী আপনাকে পবিত্র মনে করে।

এক দিকে যেমন ভগবান ভক্তদিগকে কেবল তাঁহার পূজা ও দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছেন, অন্য দিকে আবার পৃথিবীতে তাঁহাদিগের সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এক দিকে ঈশ্বর ভক্তদিগকে বলিলেন, "সাবধান, তোমরা কল্যকার জন্য ভাবিও না। তোমরা কি খাইবে, কি পরিবে, এই চিন্তা করিও না। তোমরা কেবল কিরূপে পৃথিবীতে আমার স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিবে এই চিন্তা কর।" অন্য দিকে তিনি পৃথিবীকে এই বলিয়া দিলেন, "হে পৃথিবীর লোকসকল, তোমরা আমার ভক্তদিগের সেবা কর, তাঁহাদিগের জীবন রক্ষার উপায় সকল সর্ব্বদা ভাব।" এইরূপে ঈশ্বরের ব্যবস্থাতে এক দিকের অভাব আর এক দিকের ভাব দ্বারা সামঞ্জস্য হয়। সাধু ভক্তগণ আপনাদিগের জন্য চিন্তা না করিয়া উচ্চতম বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন, অন্য দিকে পৃথিবী তাঁহাদিগের জন্য চিন্তা করিয়া সাধুসেবার পবিত্র দৃষ্টান্ত দেখায়।

ধন্য ঈশ্বর, যিনি দেশে দেশে যুগে যুগে এ সকল অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন! যে ভগবানের শরণ লয়, তার কি দুঃখ হয়। ভগবান বলিতেছেন, "ভক্ত আমার বন্ধু, ভক্তকে দেখিলে আমার আনন্দ হয়, আমার ভক্ত অন্নাভাবে মরিবে, ইহা কি আমার সহ্য হয়। আমি আমার ভক্তের জীবিকার উপায় করিয়া দিবই দিব। যে আমার হাতে ভার দেয়, আমি তাহাকে রক্ষা করিবই করিব।"

বাস্তবিক করুণাময়ী ভক্তবৎসলা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী মা তাঁহার শরণাগত ভক্তকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। তিনি কত দূর দূরান্তর দেশীয় লোকের মনে ভক্তের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা উদ্দীপন করিয়া দিতেছেন।

ধর্ম্মরাজ্যের সীমানির্ণয়।

রবিবার ২৭শে ভাদ্র, ১৮০৩ শক ; ১১ই সেপ্টেম্বর ১৮৮১।

ঈশ্বর যাহাদিগকে সত্যান্বেষণের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাদিগের নিকট আমার আজ একটী প্রস্তাব আছে। সত্য এবং অসত্যের মধ্যে একটী সীমা আছে ; সেই সীমা লইয়া চিরদিন বিবাদ হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। সত্যরাজ্যের যথার্থ সীমা নির্ণয় করিয়া বিবাদের মূলোৎপাটন করা আবশ্যক। ধর্ম্মরাজ্যের বিস্তার কত দূর, রাজ্যবাসী অনেকের তাহা জানা নাই। ধর্ম্মরাজ্যে আছি, ইহা অনেকেই জানেন ; কিন্তু পূর্ব্ব পশ্চিমে উত্তর দক্ষিণে সীমা কত দূর তাহা অল্প লোকেই অবধারণ করিয়া থাকেন। সীমা জানা অত্যন্ত আবশ্যক। কে না নিজের বাটীর সীমা জানে ? কোন্ প্রজা না ভূমির সীমা ঠিক করিয়া রাখে ? রাজা জমীদার প্রভৃতি সকলেই জমীর সীমা চিহ্নিত করিয়া রাখেন। এ সম্বন্ধে বিবাদ অনিষ্টের কারণ। এই সীমা লইয়া প্রতিবেশীগণের সহিত বিবাদ হইতে পারে।

ধর্ম্মরাজ্যের সীমার শেষ যেখানে, সেইখানে অসত্য ও অধর্ম্ম। সীমার এক চুল বাহির হইলে অসত্যের ভিতর, পাপ হ্রদের ভিতর পতিত হইতে হয়। এক চুল ধর্ম্মরাজ্যের সীমা অতিক্রম করিলেই যেখানে জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িক প্রভেদ, পাপের অত্যাচার, সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইতে হয়। ষড়রিপু সেখানে ছয় রাজা হইয়া প্রজাদিগকে অনবরত অতিশয় কষ্ট দিতেছে। আমাদের এক অঙ্গুলি ভূমি তাহাদের হস্তগত হইলে যে কত কষ্ট হইবে, তাহা বলা যায় না। পাছে অসত্য, অন্ধকার ও ভ্রমের হস্তে পড়িতে হয়, পাছে বিদেশে পাঁচ জন দানব আমাদিগকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করে, এই ভয়ে আমাদিগের হৃৎকম্প হয়। আমাদিগকে সতত সাবধান থাকিতে হইবে।

আমাদিগের ভূমির এক খণ্ডও অপরকে দিব না। আমাদিগের রাজার আদেশ আছে, এক খণ্ড ভূমিও পরাধিকারে যাইতে দিবে না। রাজ্যের কুশলভঙ্গ যাহাতে না হয়, সে জন্য দুরন্ত প্ররোচনাকারীদিগকে দূরে রাখিতে হইবে। যাহারা সত্যের শত্রু, তাহারা বলে বা কৌশলে আমাদিগের ভূমি হস্তগত করিবার চেষ্টা করে। বল প্রকাশ করিয়া যখন কৃতার্থ না হয়, তখন কৌশল প্রকাশ করিয়া থাকে। এ প্রদেশের জমীর মূল্য ইহার লক্ষ ভাগের এক ভাগের তুল্যও নহে, এখানকার ভূমি সাত রাজার ধন। ইহা হস্তগত করিবার মানসে কেহ কেহ তোমাদিগকে ফাঁকি দিবার

জন্য কয়েকটী মত প্রকাশ করিবে। সেই সকল মত শুনিতে মিষ্ট, সরল ও মনোহর। সেই প্রকার মত প্রকাশ করিয়া তোমাদিগের মন হরণ ও সম্পত্তি হরণ করিবার চেষ্টা করিবে।

তোমাদিগকে সাবধান করিবার জন্য এক্ষণে তোমাদিগের নিকট এই প্রস্তাব, সীমা অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইবার জন্য কয়েকটী লোককে চিহ্নিত কর। তাঁহারা যোগের সীমা নির্দ্ধারণ করিবেন, ভক্তির সীমা নির্দ্ধারণ করিবেন, অসাম্প্রদায়িক প্রেমের সীমা নির্দ্ধারণ করিবেন। তাঁহারা দেখিবেন, কোন কোন পথে কত দূর পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। এই সকল বহুমূল্য তত্ত্বভূমির চারি সীমা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এজন্য লোক মনোনীত করিয়া তাঁহাদিগের উপর বিশেষ বিশেষ ভার দিয়া চারিদিকে ত্বরায় প্রেরণ করিতে হইবে।

কোন দিকে কত ভূমি আছে, কোন সাগরে কত দ্বীপ আছে, ভূগোল শাস্ত্রে এ সকল লেখা আছে। জল স্থলের পরিমাণ যত দূর অনুসন্ধান দ্বারা ঠিক করা হইয়াছে, তাহা ভূগোলে জানা যায়। আবার কোন ভূমিতে কিরূপ জীব জন্তু ও উদ্ভিদ জন্মে ও কোন্ দেশের লোক কিরূপ, তাহাদিগের আচার ব্যবহারই বা কিরূপ, সকলই তাহাতে অবগত হওয়া যায়। তথাপি দেখ জ্ঞানীদিগের কৌতূহল তৃপ্ত হইল না। সাগর মহাসাগরে যাত্রা করিয়া ভূখণ্ড সকল আবিষ্কার করিবার জন্য কত জাহাজ প্রেরিত হইতেছে। ভূমি আবিষ্কার জন্য কত উপযুক্ত লোকদিগকে পাঠান হইতেছে। উত্তর মহা-

সাগরের অজ্ঞাত প্রদেশে এমন কোন ভূমি আছে কি না দেখিয়া আইস, যেখানকার কথা ভূগোলে লিখিত হয় নাই, সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয় নাই। যাও, যথোপযুক্ত লোক জন সঙ্গে লইয়া যাও; ছয় মাস বা এক বৎসরের উপযোগী খাদ্য সামগ্রী লইয়া যাও। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগকে সঙ্গে লও; প্রয়োজনীয় যন্ত্র সকল সঙ্গে লও। এই প্রকার অনুজ্ঞা বাহির হইল।

ভূগোলের উন্নতির জন্য যে সকল সভা ভার গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা এই প্রকারে দলে দলে লোক প্রেরণ করিতেছে। খুলিল জাহাজ; সকলে কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে জাহাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। কি সংবাদ আনিবে কেহই তাহা জানে না। হয় তো সাগরের মধ্যে লোকগুলি মরিবে। তথাপি তাহারা চলিল, মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিবার জন্যই হয় তো চলিল। অজ্ঞানান্ধকার ভেদ করিয়া বিজ্ঞানের রাজ্য আবিষ্কার করিবার জন্য চলিল। পৃথিবীর ভূমি যে কত দূর বিস্তীর্ণ, তাহা এখনও বুঝিতে পারা যায় নাই। এমন অনেক স্থলে আছে, যাহার সহিত কোন যোগ-সাধনে এখনও আমরা সক্ষম হই নাই; এজন্য আবিষ্কারের বার বার চেষ্টা হইতেছে। মধ্য আফ্রিকার উষ্ণ প্রদেশে কত লোক প্রেরিত হয়। আফ্রিকার মধ্যস্থল কি চিরকালই অন্ধকারে আবৃত থাকিবে? পর্ব্বতের উচ্চ শিখর সকলও আবিষ্কৃত হইতেছে।

ধর্ম্মরাজ্যে এইরূপ হওয়া আবশ্যক। জ্ঞানের উষ্ণ প্রদেশে, ভক্তির শীতল রাজ্যে, যোগগিরির উচ্চতম স্থানে কত দূর সাধকেরা গমন করিতে পারেন এবং কোন সীমা অতিক্রম করিলে আর বাসযোগ্য ভূমি পাওয়া যায় না, তন্নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। গ্রীনলণ্ডের উত্তরে ভয়ানক শীতের মধ্যে আরও দেশ আছে কি না, তাহাও নির্দ্ধারণের জন্য কত চেষ্টা হইতেছে। উহা দ্বীপ কি উপদ্বীপ আমাদিগের জানা উচিত। মনুষ্য আবাসের উত্তর সীমা আমাদিগের জানা উচিত, কোথাও অত্যন্ত অসহ্য শীত, লোক নাই, লোক থাকিতে পারে না, জীব জন্তু একটীও দেখা যায় না।

যোগে যদি আত্মা নিস্পন্দ হয়, তবে যে কত দূর পর্য্যন্ত গেলে সহিবে না তাহা ঠিক করিয়া জানিতে হইবে। যোগে কি আত্মা অবসন্ন হইয়া যায়? নিঃশ্বাস কি আবদ্ধ হয়? যোগের দ্বারা শরীরের কি কিছু অনিষ্ট হয়? কত দূর পর্য্যন্ত যোগের রাজ্যে যাওয়া যায়? যাও যোগের উচ্চতর শিখরে যাও। কত দূরের পর আর যোগ নাই, আর যোগ হইতে পারে না, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখ। কেহ বলে, এই গিরি পর্য্যন্ত যোগ হইতে পারে, আর নয়। ইহার উপর কোন ঋষি কখন গমন করেন নাই। ইহার উপর উঠিলেই উচ্চ আকাশে নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া মানুষ মরিয়া যায়। নববিধানসঙ্গত যোগবলে কত দূর ঊর্দ্ধে যাওয়া যায়, বিধানবাদীর যোগসাধনের সীমা কত দূর পর্য্যন্ত?

ভক্তিসাধনের সীমাও ঠিক করিয়া রাখিতে হইবে। এতটা প্রেমে কাঁদিলে বাঁচিব, ইহার অধিক হইলেই মরিব। দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত নৃত্য করিলে ঠিক। তিন ঘণ্টা নৃত্য করিলে যে হইবে না ইহা কে বলিল? ভক্তির উত্তর সাগরে কত দূর সাধকেরা যাইতে পারেন এবং উহার শেষ সীমা কোথায় তাহা নির্দ্ধারণ কর। অর্দ্ধ ঘণ্টা ধ্যান করিলে সভ্যতা বলিবে "যথেষ্ট, আর অধিক হইলে সভ্যতার সহিত বিরোধ হইবে। প্রাচীন কালের মূর্খেরা পাঁচ সাত ঘণ্টা ধ্যান করিত। এখনকার সময়ে তাহা আর উচিত বলিয়া বোধ হয় না।" বাস্তবিক কি পাঁচ সাত ঘণ্টা ধ্যান করিলে ভ্রম ও অন্ধকারে পড়িতে হয়?

সত্যরাজ্যের সীমা অতিক্রম করিলেই মিথ্যা রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়, অন্ধকারের মধ্যে পড়িতে হয়, মিথ্যা-বাদীদিগের সঙ্গে গণ্য হইতে হয়। পাঁচ সাত ঘণ্টা ধ্যান করিয়া দেখ সত্যের সীমা আরও বিস্তৃত কি না। কোন খানে কল্পনা কোন্ খানে ধ্যানের আরম্ভ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখ। ধ্যান ও ব্রহ্মদর্শন এক দিকে, অনুমান ও ছায়াদর্শন অপর দিকে, ইহার মধ্যে যে রেখা আছে তাহা ঠিক কর। সদাচার ও সদনুষ্ঠানের সীমা কত দূর, জ্ঞানের সীমা কত দূর, তাহা ভাল করিয়া জান। আমরা বলি ঈশ্বরকে জানা যায়, একজন বলিবে জানা যায় না; আর একজন বলিবে কতক জানা যায়, কতক জানা যায় না। যত দূর জানা যায় তাহা কি জানা হইয়াছে?

একজন বলিল, সত্যসূর্য্যের কাছে গেলে মরিবে। কত কাছে যাওয়া যায়, তাহা দেখা আবশ্যক। শীত দেশে উচ্চ পাহাড়ে আরোহণ নিষিদ্ধ। তবে কি পাহাড়ের কাছে আর যাইব না? তবে কি শীত দেশে একেবারে যাওয়া হইবে না? এত ভয়? এত ভয় ভাল নহে। এখনও কত শিখিতে হইবে! বিধানের শ্রীমদ্ভাগবতের কি শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পড়া হইয়াছে? চারি বেদ কি সম্পূর্ণ হইয়াছে? যোগপর্ব্বতের উচ্চতম স্থানে কি গিয়াছিলে? যত দূর যাইবার তত দূর কি গিয়াছিলে? নিশ্চিন্ত রহিয়াছ কেন? ব্রাহ্মদিগের এখন নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, আরও কত ধর্ম্মলাভ করিবার অবশিষ্ট আছে? আরও কত ঘণ্টা নিমীলিতনয়নে ধ্যান করিতে পার, তোমরা জান না। আগে পাঁচ মিনিট ধ্যানই যথেষ্ট বোধ করিতে; অর্দ্ধ ঘণ্টা হইল, এক ঘণ্টাও হইল, সমস্ত দিন উৎসব হইল। এখন বলি, আরও, আরও যোগের উচ্চ শিখরে অধিরোহণ করা যায়।

ধর্ম্মরাজ্যে আরও শত শত দেশ আছে, যাহার নাম গন্ধও আমাদের নিকট আসে নাই। উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থান আছে; প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর স্থান আছে, গভীর হইতে গভীরতর স্থান আছে। তোমাদের মধ্যে সুদক্ষ সুনিপুণ যাঁহারা তাঁহারা সত্য লাভ করিবার জন্য সাধন আরম্ভ করুন; অল্পবিশ্বাসী ও ভীরুদিগের বিশ্বাসোৎপাদন করুন। চারিদিকে দেখিয়া আসিয়া সংবাদ দিন, নববিধানবাদী আত্মরক্ষা

করিয়া কত ঘণ্টা ও কিরূপে ব্রহ্মযোগসাধনে অতিবাহিত করিতে পারেন। কত ঘণ্টা সাধন করিলে কোন বিশৃঙ্খলা হয় না, শরীর ঠিক থাকে, মন ঠিক থাকে, হৃদয় ঠিক থাকে, আত্মা ঠিক থাকে।

যখনই দেখিবে ঠিক নাই, তখনই বুঝিতে হইবে, সীমার ওদিকে গিয়াছ। অমনি ফিরিবে, বলিবে সীমার বাহিরে যাইব না। যদি দেখ, নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া গেল, শরীরে রোগ সঞ্চার হইল, স্বাস্থ্য নষ্ট হইল, মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা হইতে লাগিল, বুঝিবে শত্রুরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছ। অমনি ধর্ম্মরাজ্যে ফিরিবে। এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা ধ্যান করিয়া একেবারে ঠিক সীমা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিবে। ঠিক করিয়া ফেলিবে যে, যথার্থ ব্রহ্মবাদী এত সময় যোগাসনে বসিয়া উৎকৃষ্টরূপে ব্রহ্মযোগ সাধন করিতে পারেন। নির্ণয় করিবে, কি ভাবে চলিলে জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা ও আত্মার সমস্ত সদ্ভাব রক্ষা পায়।

পাঠসম্বন্ধেও নিরূপণ করিবে, ব্রহ্মরাজ্যে কত দূর পাঠাভ্যাস করা যায়। যে জ্ঞানে বিশ্বাস নষ্ট হয়, সে জ্ঞান জ্ঞান নহে, সে জ্ঞান আমাদের নয়। বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করিব, অথচ দেখিব প্রেম মরিল না। যদি দেখি পড়িতে পড়িতে প্রেম চলিয়া গেল, পুস্তকের কীট হইয়া পড়িলাম, বুঝিতে হইবে, শত্রুরাজ্যে পড়িয়াছি। তেমনি আমরা কর্ম্মসম্বন্ধেও সীমা নির্ণয় করিব। কত কর্ম্ম করিতে পার? শুনিয়াছি, কার্য্যা-

লয়ে পাঁচ ঘণ্টা, সাত ঘণ্টা লোকে পরিশ্রম করে। ব্রহ্ম-বিশ্বাসী কি আরও পারেন? পার যদি দেখাও। প্রাতঃকাল হইতে পরিশ্রম কর, মধ্যাহ্নে পরিশ্রম কর, রাত্রি পর্য্যন্ত পরিশ্রম কর। সারা দিন খাটিয়া কার্য্যালয় হইতে আসিয়া মৃদঙ্গ বাজাও, ভক্তির সহিত কীর্ত্তন কর। তোমরা হয় তো বলিবে শরীর এখন ভক্তিভার বহন করিতে পারে না। কি? ভক্তি ভার? নিশ্চয় তবে তোমরা ধর্ম্মের রাজ্য অতিক্রম করিয়াছ। মৃদঙ্গে কি ভার আছে? ভক্তিকে তুমি ভার বল? তুমি তবে ব্রহ্মরাজ্যে পরিশ্রম কর নাই। সংসারের চরণে তুমি আত্মসমর্পণ করিয়াছ। ঈশ্বরচরণে তুমি তো আত্মসমর্পণ কর নাই।

ব্রহ্মরাজ্যে যদি পরিশ্রম করিতে, হরিনাম করিতে, ভার বোধ হইত না; হাসিতে হাসিতে হরিনাম করিতে। কর্ম্ম করিলে কি মন নিরানন্দ হয়? না আরও আনন্দ হয়, শরীর আরও সতেজ হয়। পরিশ্রম কি জন্য? শরীর মনের বল ও তেজ রক্ষার জন্য। এই কথা শুনিয়া আবার অনেকে বলিতে পারেন, তবে আর দুই ঘণ্টার অধিক পরিশ্রম করিব না। নববিধানে জানিয়াছি, অধিক পরিশ্রম করিয়া উপাসনার ভাব, ভক্তির ভাব হারাইলে বড় অন্যায় হয়। এই বলিয়া যে, কেহ ধর্ম্মের ভূমি সঙ্কীর্ণ করিতে যাইবেন, তাহা হইবে না। যেখানে দশ সহস্র লোকের স্থান আছে সে স্থানকে তুমি দুই শত লোকের উপযুক্ত মনে করিবে?

তুমি ব্রহ্মরাজ্যকে সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিবে? বল, আরও পরিশ্রম করা যায়।

কিয়ংকাল সাধকেরা একবার দেখিয়া আসুন, পরে বলুন, ব্রাহ্ম হইয়া এত পরিশ্রম করা যায় কি না? বলুন, এত অধিক যোগ ভক্তি সাধন করা যায়, এত শারীরিক পরিশ্রম করা যাইতে পারে। কত অধিক যোগসাধনে ও শারীরিক পরিশ্রমে মনুষ্যহৃদয় নির্ম্মল ও আনন্দিত রাখা যায় তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখ। এক এক দল, এক এক প্রদেশে বাহির হইয়া চলিয়া যাউন। আমাদের সকলের শুভাশীর্ব্বাদ ও শুভকামনা লইয়া উৎসাহের সহিত পূর্ব্ব পশ্চিমে, উত্তর দক্ষিণে চলিয়া যাউন। ফিরিয়া আসিয়া প্রেম, ভক্তি, যোগ প্রভৃতির তত্ত্ব সকল বলিবেন। আমরা তাহা শুনিয়া আমাদের সাধনের পরিমাণ বাড়াইব।

যদি জানিতে পারি, যোগপাহাড়ের অমুক স্থান, ভক্তি-নদীর অমুক অংশ আমাদের অবিদিত রহিয়াছে, সংবাদ দিলেই আমরা কৌতুহলপরায়ণ হইয়া দৌড়িব। সকলে সেই সকল স্থান দেখিবার জন্য একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিব। পাঁচ ক্রোশ দূরে যোগের পাহাড় রহিয়াছে, বড় বড় ভক্তির উদ্যান রহিয়াছে, আমরা কিছুই দেখি নাই। অতি উৎকৃষ্ট স্থান, আমরা তাহার নিকটে গিয়া হয় তো ফিরিয়া আসিয়াছি, এমন সকল স্থান আমরা দেখিতে পাইব। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা অগ্রে দেখিয়া আসিবেন। নানা স্থান হইতে নানা

জাতীয় পুষ্প আনয়ন করিবেন। সাগর মহাসাগর প্রভৃতি হইতে নানাবিধ রত্ন, বহুমূল্য রত্ন আনিয়া দেখাইবেন। ভক্তিকানন হইতে, প্রমোদ উদ্যান হইতে, মধু আনিবেন। আমরাও পরে কৌতুহলপূর্ণ হৃদয়ে সেই দিকে গমন করিব।

কি আশ্চর্য্য! কি দুঃখের বিষয়! সীমা জানি না বলিয়া সঙ্কীর্ণ স্থানে বদ্ধ হইয়া থাকি। একটী মৃদঙ্গ আমি যথেষ্ট মনে করি, পাঁচ জনে পাঁচটী কেন বাজাইলাম না? পাঁচ ঘণ্টা অনবরত ধ্যান করা যায়, আমি কেন করিলাম না? রে নির্ব্বোধ মন, সীমা জান না বলিয়া দক্ষিণে এক হস্ত, বামে এক হস্ত স্থান লইয়াই বুঝি সাধন করিয়া সময়াতিপাত করিতেছ? পাঁচ মিনিট ধ্যান হইলেই খুব হইল, মনে করিতেছ? ঐ একটু স্থানেই কি চিরদিন বদ্ধ থাকিবে? সঙ্কীর্ণ ভূমির মধ্যেই বিচরণ করিবে? এত বড় ব্রহ্মরাজ্য! তুমি ইহাকে ছোট মনে কর? এবার মোহশৃঙ্খল ছিন্ন হইয়া যাউক। অজ্ঞান অন্ধকার তিরোহিত হইয়া যাউক। স্বাধীন হইয়া যোগ পাহাড়ের উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে আরোহণ করিতে হইবে। কত দূর যোগে উন্নত হওয়া যায়, কত দূর ভক্তিতে মগ্ন হওয়া যায়, কত অধিক পরিশ্রম করা যাইতে পারে, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে।

ধর্ম্মরাজ্যের সীমা নির্ণয় করিবার জন্য এক দল লোক বাহির হইয়া পড়। সত্য ও অসত্যের মধ্যে যেখানে রেখা

আছে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের মধ্যে যেখানে প্রভেদ চিহ্ন আছে, তাহা আবিষ্কার করিবার জন্য প্রবৃত্ত হও। সীমার বাহিরে গেলে মহাবিপদ। অতএব ব্রহ্মদেশ কত দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাহা অবধারণ করিয়া সাধারণকে জানাইতে হইবে। যাঁহারা জানাইবেন ও যাঁহারা জানিবেন, তাঁহারা সকলেই ধন্য হইবেন। এই ক্ষেত্রে যাঁহারা ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়া গমন করিবেন, তাঁহারা গম্ভীর সাধনে প্রবৃত্ত হউন এবং ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে ও আমাদের শুভ কামনায় চারিদিকের নূতন নূতন রাজ্য আবিষ্কার করিয়া আনন্দ সমাচার বিস্তার করুন।

যিনি ব্রহ্ম তিনি হরি।

রবিবার, ৩রা আশ্বিন, ১৮০৩ শক ; ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৮৮১।

বেদ এবং পুরাণে এত প্রভেদ যে মনে হয়, বেদের ঈশ্বর ভিন্ন এবং পুরাণের ঈশ্বর ভিন্ন। বেদের মধ্যে অবতার নাই, রাম নাই, কৃষ্ণ নাই। পুরাণ কেবল অবতারদিগের লীলা লইয়াই ব্যস্ত। যখন বেদের মধ্যে প্রবেশ করি, তখন আধুনিক পৌরাণিক ধর্ম্মের কিছুমাত্র পূর্ব্বাভাস তাহাতে দেখিতে পাই না। যখন পুরাণের মধ্যে প্রবিষ্ট হই, তখন ঋষিদিগের আরাধিত পরাৎপর পরব্রহ্মকে পাওয়া যায় না; ব্রহ্ম পদার্থকে দেখা যায় না। প্রাচীন কালের আর্য্যধর্ম্ম ব্রহ্মকে লইয়া বসিয়া রহিলেন, অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম।

আধুনিক ধর্ম্ম বিষ্ণুর বিবিধ অবতারের লীলা মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

প্রাচীন ব্রহ্ম ও আধুনিক হরি, ভারতকে যেন দুই পথ দেখাইয়া দিলেন। একজন বনের দিকে, পর্ব্বতের দিকে, নির্জ্জন নদীতটে, বিজন গহনে, গিরিগহ্বরে। আর একজন তীর্থস্থানে, ভক্তমণ্ডলীতে, শ্রীবৃন্দাবনে, জগন্নাথক্ষেত্রে, সাধু ভক্ত পরিবার মধ্যে। ব্রহ্মকে লইয়া কেহ কেহ নির্জ্জনতা আশ্রয় করিলেন; বিরলে তাঁহার সাধন ভজন করিয়া যোগীর পদ প্রাপ্ত হইলেন। কেহ কেহ হরিলীলা শ্রবণ করিয়া ও শ্রবণ করাইয়া প্রেম ভক্তির সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত হইলেন। এই দুই পথ আপাততঃ পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু আমরা ব্রহ্ম ও হরি উভয়েরই পক্ষপাতী।

ব্রহ্মধন আমাদিগের ধন; হরিধনও আমাদিগের ধন। ব্রহ্মকে আমরা মিষ্ট বলি, ব্রহ্মের ন্যায় মিষ্ট আর কিছুই নাই। হরি অপেক্ষাও কিছুই মিষ্টতর নাই। ব্রহ্মের ন্যায় ঈশ্বর পাওয়া যায় না; হরির ন্যায় দেবতা কেহ কখন কল্পনা করিতে পারে না। ব্রহ্ম অপেক্ষা বড় কেহই নহে; হরি অপেক্ষা সকলেই ছোট। ব্রহ্মনাম শুনিলে যোগীর আত্মা উড়িতে যায়, হরিনাম শুনিলে ভক্তের হৃদয় নাচে। ব্রহ্ম বড় না হরি বড়? কেহ কেহ ব্রহ্মকে বড় বলিলেন; কেহ কেহ হরিকে বড় বলিলেন। নববিধান বলেন, হরি যিনি ব্রহ্মও তিনি।

বেদের ঈশ্বর আর পুরাণের ঈশ্বর ভিন্ন নয়। বৈদিক যোগীরা যাঁহাকে আকাশে মহাকাশে স্থির ভাবে বিরাজিত দর্শন করিলেন, পৌরাণিক ভক্তেরা তাঁহাকেই সংসারের নিম্ন ভূমিতে অবলোকন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। ঋষিরা যাঁহাকে নিমীলিত নয়নে যোগধ্যানে অনুভব করিলেন, ভক্তেরা মৃদঙ্গ করতালি বাজাইয়া, নৃত্য করিয়া আনন্দে আনন্দিত হইয়া হরিপদারবিন্দ পূজা করিলেন; তাঁহার পদ-তলে পড়িয়া সুখী হইলেন। ঋষির ব্রহ্ম ও ভক্তের হরি, দুয়ের মধ্যে কাহাকে বড় করিব? বড় করিব কি! দুইই সমান। যদি নববিধানে প্রাণের কাঁটা স্থির হইয়া থাকে, তবে ব্রহ্ম ও হরির সন্ধিস্থল আমরা পাইয়াছি। ব্রহ্ম এবং হরিকে আমরা এক করিয়াছি। আমরা এক করিয়াছি কেন বলিলাম? একই ছিল। দৃষ্টিভেদে ও সাধনভেদে বেদ এবং পুরাণের ভেদ হইয়াছিল। সাধন যখন অভেদ হইল, জ্ঞান যখন অভেদ হইল, বুদ্ধি যখন অভেদ হইল, তখন আর বেদ পুরাণে প্রভেদ রহিল না।

ব্রহ্মের ভিতর আমাদের হরি, হরির ভিতর আমাদের প্রাণের সহিত ব্রহ্ম। আমরা যে বলি, "হরিঃ ওঁ"। ওঁকারের সহিত আমাদের "হরি" সংযুক্ত। মনোমোহন হরিকে "হরি ওঁ" বলিয়া আমরা পুলকসাগরে মগ্ন হই। আমরা বলি যেই হরি সেই ব্রহ্ম, যেই ব্রহ্ম সেই হরি। ব্রহ্মের ভিতর হরিদর্শন। এ কথা কি মিথ্যা? মিথ্যা হইলে পবিত্র-

বেদী হইতে কি এ কথা বলিতাম? যখন ঈশ্বর উদ্ধার করেন, তখন তিনি হরি; যখন বিবিধ ভাবের মধ্যে খেলা করেন তখন হরি। আবার সেই হরি দেবদেব মহাদেব, চিরমৌনী, বাক্যবিহীন, কর্ম্মবিহীন, আকাশস্থিত, অচল, অটল, অনাদি, অনন্ত ব্রহ্ম। যদি কবি হইতাম, তবে কল্পনা সহকারে ভাল করিয়া বর্ণনা করিতাম; যদি চিত্রকর হইতাম, তবে ইহা চিত্র করিতাম। কিরূপে? এক দিকে নিস্তব্ধ মহান আকাশের দেবতা বর্ত্তমান, আর এক দিকে লীলাকর্ত্তা দয়াময় করুণাময়, সুরসে রসিক হইয়া, জগতের পাবন হইয়া, পাপী উদ্ধার করিতেছেন। আমরা তো অবতার হরিকে মানি না। দেহধারী, রূপধারী, চঞ্চলস্বভাব, মানবচরিত্র বিশিষ্ট হরিকে আমরা তো মানি না, পূজা করি না। কিন্তু যথার্থ হরিকে মানি; যিনি "হরিঃ ওঁ" তাঁহাকে মানি।

যখন সপ্তস্বর মিলাইয়া "হরিঃ ওঁ" বলি, তখন যে হরিকে বর্ত্তমান দেখি তিনি ব্রহ্ম, তিনি সর্ব্বদেবময়, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতে, তিনি বেদান্তে। যিনি ঋষির ভ্রূর মধ্যে তিনিই ভক্তের বক্ষের ভিতর। যিনি যোগীর নিমীলিত নয়নে, তিনিই ভক্তের উন্মুক্ত চক্ষে। যাঁহাকে যোগী নয়ন বন্ধ করিয়া দর্শন করেন, ভক্ত তাঁহাকে উন্মীলিত নয়নে দেখিয়া নৃত্য করেন। তবে যদি বল, হরি এদেশে সাকাররূপে ভগবদ্ভক্তদিগের দ্বারা অর্চ্চিত ও আরাধিত হইয়াছেন, তবে শ্রবণ কর, হিন্দুস্থান, শ্রবণ কর। প্রণবস্বরূপ ওঁকারের মধ্যে এ দেশে

হরি ছিলেন। তুমি প্রাচীন হরিকে বিসর্জ্জন করিয়া আধুনিক হরিকে কেন লও? কেবল যোগচক্ষে ভক্তিচক্ষেই হরিদর্শন হয়। চর্ম্মচক্ষে তাঁহাকে দেখা যায় না। হরি অত্যন্ত প্রাচীন আর্য্যজাতির কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়া সকল শ্রেণীর হিন্দুদিগের পরমারাধ্য হইয়াছেন। বৈষ্ণবের চরণে আমাদের নমস্কার; ঋষির চরণেও কোটি কোটি নমস্কার। যাঁহারা হরির কথা বলেন, তাঁহাদিগকেই আমরা আদর করি, সম্মান করি; প্রভুর দাস বলিয়া মান্য করি। ঋষি ও ভক্ত, যোগী ও বৈষ্ণব, উভয়ের কাছে গিয়া বলি, পদধূলি দাও। যে দিন দুইয়ের পদধূলি মিশ্রিত হইবে, সেই দিন ভারতের পরিত্রাণ।

যদি বৈষ্ণবের হরিকে ছাড়িয়া কেবল বেদান্তের ব্রহ্মকে লও, তবে অনেক অনিষ্ট হইবে; সকলে শুষ্কহৃদয় হইয়া পড়িবে। এখানকার হরিভক্তির সঙ্গে সঙ্গে বৈদান্তিক ব্রহ্মযোগকে একত্র মিলিত কর। যোগভক্তির যখন সম্মিলন হইল, হরি ব্রহ্ম যখন অভেদ হইলেন, তখন বঙ্গবাসীর সৌভাগ্যের দিন উদিত, ভারতবাসীর সুখের দিন নিকটস্থ হইল। তখন বলিব ব্রহ্মমন্দির সংস্থাপন সফল হইল; নববিধান পূর্ণ হইল। ব্রহ্মই হরি, তিনিই মা, লীলাকর্ত্তা ও লীলাকর্ত্রী। আমরা যে বেদান্তের ব্রহ্মকেই হরি বলি। নতুবা ওঁকারের সঙ্গে হরি কেন? ওঁ যে ব্রহ্মনাম; সাধনের উৎকৃষ্টতম শব্দ ওঁ যে বেদের শ্রেষ্ঠ অক্ষর, ওঁ যে ব্রাহ্মণের

সর্ব্বস্ব; ওঁ যে হিন্দুস্থানের মাথার মাণিক। ওঁ শব্দের ন্যায় আর শব্দ নাই। ওঁ শব্দের ভিতরে যেমন নিরাকার ভূমা ব্রহ্ম, এমন আর কোন শব্দে নাই। প্রথম অক্ষর ওঁকার ব্রহ্ম এবং হরি একই। যখনই ওঁকার সহকারে বলি. হরি হরি হরি হরি, তখন সেই নির্ম্মল নিরাকার ব্রহ্মকে দেখিতে পাই।

সেই সৎস্বরূপ নির্ম্মল ব্রহ্মকে হরি বলি কেন? হরি বলিলে সুখ হয়। এই যে হরি নামটী, ইহাতে গুড় মিছরি সুধা যত প্রকার মিষ্ট রস আছে, সমুদয় একত্র মিশ্রিত। হরিনাম শুনিয়া ভক্তেরা মোহিত হইয়া মূর্চ্ছিত হন; হরিনাম শুনিবামাত্র কত ভক্তে দশাপ্রাপ্তি হয়। হরিনাম যেন সুধাপূর্ণ সোণার কলস। হরিনাম কাণে প্রবেশ করিবা মাত্র মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত শীতল হইয়া যায়। বৈশাখ মাসে শীতল জলে অবগাহন করিলে যেমন সুখ হয়, ঠিক সেইরূপ সুখানুভব হয় হরিনামসলিলে অবগাহন করিলে, অত্যুক্তি নহে। হরিনামে এমনই মজা! হরিনাম এমনই সরস! ঐ যে অক্ষর দুইটী, ঐ যে শব্দটী উহা প্রেমামৃতে থই থই করিতেছে। লক্ষ লক্ষ ভক্ত নিমগ্ন হও, প্রাণ শীতল হইবে, ঠিক যেন স্নান করিয়া উঠিবে। আমরা কি এমনই আত্মপ্রবঞ্চিত, আমরা কি এমনই মূর্খ যে, পিতা প্রপিতামহ পিতামহ যে হরিনামকে আদর করিয়াছিলেন, আমরা সেই হরিনামকে ছাড়িয়া দিব? প্রপিতামহের

বহুপূর্ব্বে ঋষিরা প্রণবস্বরূপ ওঁকারের সহিত হরির আরাধনা করিতেন। হরিনাম ভারতের পুরাতন মধু। পুরাতন মধু, মিষ্টতম মধু। ইহা কি আমরা ছাড়িতে পারি? এ মধু ছাড়িলে নববিধান চলে না, উপাসনা শুষ্ক হয়। হরিনামে কি বিরক্ত হওয়া যায়? হরিনামবিহীন ধর্ম্ম, নীরস ধর্ম্ম।

সুধাসরোবর ফেলিয়া বালুকারাশির উপর বসিয়া তুমি কি ধ্যান করিতে যাইবে? হরি যে রস পান করাইয়াছেন, আমরা তাহাতে কখনই হরিকে ছাড়িতে পারি না। হরিকে লইয়া যে কি করিব, ঠিক পাই না। ব্রহ্মের সময় একটা ঠিক ছিল। এ হরির সময়, কিছুই ঠিক নাই। হাতে করি, বুকে ধরি, মুখে রাখি, মাথায় রাখি, তথাপি কি যে করিব ঠিক পাই না। দিন নাই, ক্ষণ নাই, মাস নাই, বৎসর নাই, উৎসবের পর উৎসব, তার পর মহোৎসব হইল, হরিকে লইয়া তবু আবার যে কি করিব, তাহার ঠিক পাই না। ভবিষ্যৎ তাহা জানে, বর্ত্তমান তাহা বলিতে পারে না। হরিনাম করিতেছি বলিয়া যে কত সুখ হইতেছে, দশ বৎসর চীৎকার করিয়া বক্তৃতা করিলেও সে সুখের বর্ণনা শেষ হয় না।

কেমন আত্মা, তুমি তো সাক্ষী। হরিনামে যে কত সুখ, তাহার সাক্ষ্য দিতে হইবে। হে আত্মন্, সাক্ষ্য দাও। যখন বলি প্রেমময় হরি, তখন সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হয়, চক্ষু হইতে প্রেমের জল পতিত হয়। পৃথিবী আছে কি গিয়াছে,

জানা যায় না। স্বর্গ কি আসিল নাকি, এই মনে হয়। হরিনামে যে কি হয়, তাহা হরি জানেন; হরিদাস জানে, হরিদাসী জানে, আর কেহই জানে না। এই এক শব্দে ভক্তের প্রাণ পাগল হইয়া যায়। যাই “হ” তার পর ‘রি’ ভক্তের মুখে উচ্চারিত হয়, মুখের পানে তাকাইয়া দেখি, তার শরীর গলিয়া গিয়াছে। মানুষ যে, নরাধম যে, সেও যেন প্রেমের পুতুল হইয়াছে। কি ছিল আর কি হইল? হরিকে পাইয়া কত সুখ!

এক দিকে নিরাকার, আর এক দিকে প্রেমলীলা। এত কালের পর কাশী আর বৃন্দাবন এক তীর্থ হইল। যদি সাকারবাদী থাকিতাম, কাশীধামে যাইতাম যোগসাধন করিবার জন্য, শ্রীবৃন্দাবনে যাইতাম প্রেম ভক্তি লাভের জন্য। কাশীধাম যোগধাম; বৃন্দাবন প্রেমধাম। এখন নববিধানবাদী হইয়া হৃদয়ের এক ভাগকে বলিয়াছি তুমি হও কাশী, অপর ভাগকে বলিয়াছি তুমি হও বৃন্দাবন। আমি যত কাল বাঁচিব, অন্তরে কাশী বৃন্দাবন এই তীর্থদ্বয় একত্র করিয়া রাখিব। এই নববিধানের মধুর ভাব কি তুমি গ্রহণ করিবে না? যোগ ভক্তির মিলন কি করিবে না? ইন্দ্রিয়সুখের বশীভূত হইলে, টাকাতে কত মোহ জানিলে, হে বিভ্রান্ত জীব, কিন্তু এ তত্ত্বসুধা পান করিলে না?

হরি ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম হরি উনবিংশ শতাব্দীর যে এই মন্ত্র। পিতামহ বলিতেন, ব্রহ্ম ব্রহ্ম; পিতা বলিতেন হরি হরি।

আমি বলিতেছি, হরিব্রহ্ম, ব্রহ্মহরি, হরিব্রহ্ম, ব্রহ্মহরি। আমি যোগাসনে বসি, যোগাসন হয় প্রেমাসন; প্রেমাসনে বসি, প্রেমাসন হয় যোগাসন। সন্ন্যাসী বৈষ্ণব এক হইয়া গেল। যে সন্ন্যাসী ছিল, সেই বৈষ্ণব হইল; যে বৈষ্ণব ছিল সেই সন্ন্যাসী হইল। ভক্ত যে ছিল সে হইল যোগী, যোগী ভক্ত হইল। আমরা অর্দ্ধেক সন্ন্যাসীর পথে, অর্দ্ধেক বৈষ্ণ-বের পথে; আমরা অর্দ্ধভাগ বেদান্ত সাধন করি, অপরার্দ্ধ শ্রীমদ্ভাগবত সাধন করি। আমার অঙ্গের এক দিকে লেখা ব্রহ্ম, অপর দিকে লেখা হরি। এক চক্ষে ব্রহ্মতেজ, অপর চক্ষে হরিপ্রেম। মুখে একবার বলি ব্রহ্ম, আর একবার বলি হরি। এক কর্ণে শুনি যোগেশ্বরের নাম, পরব্রহ্মের নাম; অপর কর্ণে শুনি প্রেমময়, দয়াময়, চিরসুন্দর হরির নাম। আমার দুই হস্তে দুই ধন। ব্রহ্মনাম এক হস্তে, হরিনাম অপর হস্তে। যদি এমন অবস্থা আমার হয়, আমার ন্যায় সুখী আর কে আছে? যোগের সাগর প্রেমের খনি আমার কাছে। হে নববিধানবাদী ব্রহ্মসাধক হরিকিঙ্কর! হরিনাম ব্রহ্মনাম লইয়া সুখী হও। হরি ব্রহ্ম, হরি ব্রহ্ম বলিয়া সুখী হও। দিবানিশি হরিনাম কর। হরিনাম অপরকে শ্রবণ করাও। ব্রহ্মহরি, হরিব্রহ্ম বলিতে বলিতে হরির সাগরে ডুবিয়া যাও। সুখের পর সুখ তার পর সুখ হইবে। কত যে সুখ তাহা বলা যায় না। বল সকলে, হরিপদ প্রান্তে থাকে যেন এই কিঙ্করের মন! এই বিনীত নিবেদন।

দুর্ব্বোধ্য নববিধান।

রবিবার ১০ই আশ্বিন, ১৮০৩ শক; ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৮৮১।

ঈশ্বর স্বয়ং সত্যকে দুর্ব্বোধ করিয়াছেন। মনুষ্য সহস্র চেষ্টা করিয়া সহজে কি সত্যকে বোধগম্য করিয়া দিতে পারে? ঈশ্বর যদি আপনাকে আপনি সহজে বুঝিতে না দেন, আমরা কিরূপে বুঝিতে পারিব? যদি তাঁহার শাস্ত্রের কথা তিনি আমাদিগকে অনায়াসে বুঝিতে না দেন, আমরা তাহা কোন মতেই বুঝিতে পারি না। আমরা ধ্যান করিব, সাধন করিব, কিন্তু মনঃকল্পিত সহজ পথে যাইতে পারিব না। যদি যাই তাঁহাকে পাইব না; সত্য লাভ করিতে পারিব না। দয়াসিন্ধু নিজে জানেন, কোথায় তাঁহাকে রাখিতে হয়। তাঁহার তেজ অতি ভয়ানক। যদি তিনি আপনাকে সাধকের অতিশয় নিকটস্থ করেন, সাধক তেজ সহ্য করিতে পারিবে না। যদি তিনি আপনাকে অনেক দূরে রাখেন, তাপের অল্পতানিবন্ধন কষ্ট হইবে। ঈশ্বর সূর্য্য হইয়া যদি আমাদিগের স্কন্ধে আসিয়া পড়েন, তুমি সে তেজ সহ্য করিতে পারিবে না। তুমি ইচ্ছা কর, হাত বাড়াইবে, সুফল পাড়িবে, মুখে দিবে, রসাস্বাদন করিবে, মুহূর্ত্তের মধ্যে অশেষ আনন্দ উপভোগ করিবে, কিন্তু তাহা হইবে কেন? এরূপ করিতে কার না আনন্দ হয়? কিন্তু মনুষ্যের বিচার অপেক্ষা ঈশ্বরের সিদ্ধান্ত শ্রেষ্ঠ। সেই সূর্য্য যদি আবার বলেন, এত নিকটে

আলোক দুর্ব্বিসহ হইবে; খুব দূরে গিয়া লুকাইয়া থাকি, তাহা হইলে কিছুই বাঁচিবে না। এই জন্য ঈশ্বর নিজ ইচ্ছায় আপনাকে আপনি দুর্ব্বোধ করিলেন। পণ্ডিতেরাও তাঁহাকে সম্যক বুঝিল না। যাহারা জানিল, তাহারা অল্প জানিল।

এই যে পবিত্র নববিধান, যাহা পরমবিধান, যাহাকে স্বয়ং স্বর্গীয় সত্য বলিলেও বলা যায়, ইহাও বিধাতার ন্যায় দুর্ব্বোধ। বক্তৃতার পর বক্তৃতা হইল, উপদেশের পর উপদেশ দেওয়া হইল, পুস্তকের পর পুস্তক সকল প্রকাশিত হইল, কিন্তু মানবসমাজে কে কবে গূঢ় ব্যাপার সকল পরিষ্কাররূপে বুঝিয়াছে? আমরা কিরূপে বলিব, নববিধান পূর্ব্বাপেক্ষা লোকে বুঝিল? প্রাণেশ্বরকে কে কে বুঝিল? পৌত্তলিক ভাইরা কি বুঝিল? জ্ঞানী তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বহুশাস্ত্রজ্ঞানে নিপুণ হইয়া, ব্যুৎপন্ন হইয়া কি তাঁহাকে বুঝিল? শাস্ত্রী যাঁহারা, তাঁহারা শাস্ত্রের সঙ্গে মিলাইয়া কি বুঝিলেন? আমাদের ধর্ম্মকে হৃদয়ের সহিত কি গ্রহণ করিলেন? আমরা রাস্তার লোকের কাছে নববিধানকে প্রকাশ করিবার জন্য কত চেষ্টা করিলাম, ধনীর প্রাসাদে ও নীচতম কুটীরবাসী দুঃখীর নিকটে ব্রহ্মগান শুনাইলাম, কিন্তু কে বুঝিল? সংগীত দ্বারা প্রচার করিলাম, নানা ক্রিয়া কর্ম্ম দ্বারা কত বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম, সকলই ব্যর্থ হইল। নিশান প্রভৃতি, হোম প্রভৃতিও তেমনি নিষ্ফল হইল। আমরা স্ত্রীজাতির জন্য অমিয় মাখিয়া হরিনাম সহজ ও

মিষ্ট করিয়া দিলাম, কে বুঝিল? বালকদিগের জন্য এরূপ করিলাম, যাহাতে তাহাদের ক্ষুদ্র হস্ত ধরিতে পারে, কিন্তু কে ধরিল? আমরা ইংলণ্ডের জন্য বিজ্ঞানসঙ্গত পদ্ধতিতে নববিধানকে প্রকাশ করিলাম, কিন্তু কার কার মস্তিষ্কে তাহা প্রবিষ্ট হইল? কোন্ কোন্ ব্যক্তি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, চারিদিকে আনন্দধ্বনি হউক; কেন না নববিধান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে? পূর্ব্বাঞ্চল, আসিয়াখণ্ড, পূর্ব্ব-জাতির মধ্যে হৃদয়ের পূর্ব্বসংস্কারের সাহায্য পাইয়া কই নববিধানকে বুঝিল? পশ্চিমাঞ্চল কই ইহাকে আদর করিল? পূর্ব্ব পশ্চিম কেবল হাহাকার করিল; বিদ্বান্ মূর্খ কেবল নিরাশ হইয়া ফিরিল।

হে ঈশ্বর, তোমার নববিধান কি দুর্ব্বোধবস্তু? বিনা আয়াসে এত বড় ধর্ম্ম কিছুই বোঝা যায় না। যাঁহারা বুঝিতে পারলেন না, তাঁহারা ইহার প্রতি দোষারোপ করিলেন। যাঁহারা ধরিতে পারিলেন না, তাঁহারা ইহাকে হেয় জ্ঞান করিলেন, যে দেশ ইহাকে গ্রহণ করিতে পারিল না, সে দেশ ইহাকে ঘৃণা করিল। যে ইহার মর্য্যাদা করিতে পারিল না, সে ইহাকে অপদস্থ করিল। যে হরির চরণশোভা দেখিতে পাইল না সে হরিকে বিদায় করিয়া দিল। কেন না সে হরিকে না বুঝিলে কল্পনার হরিকে তো হৃদয়ের সিংহাসনে বসাইতে পারে না। ব্রহ্মভক্ত কি বিবেচনা কর? সময় কি আসিবে? উপায় কি আছে?

যাহাতে লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। দুই তিন বৎসরের পরীক্ষায় ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে, যতই সাধুদের সমাগম হইতেছে, যতই শাস্ত্রসংখ্যা বাড়িতেছে, ততই যেন আমাদের ক্ষেত্র সুবিস্তৃত হইতেছে ; ততই লোকে বুঝিতেছে না।

এত বড় সমুদ্র সমান ধর্ম্ম! কিরূপে বুঝিবে? এক ঈশার ধর্ম্ম বুঝিতে দুই সহস্র বৎসর গেল ; এক হিন্দুধর্ম্ম বুঝিতে চারি হাজার বৎসর অতীত হইল। এখন নববিধানে বিস্তৃত ধর্ম্ম দেখিয়া যাত্রীরা ভয় পাইল। এক ঈশা, এক মুষা, এক বুদ্ধ, এক শ্রীগৌরাঙ্গকে বুঝিতে কত চেষ্টা করিয়া পৃথিবী পারিতেছে না ; এমন সময় নববিধান আসিয়া চারি জনকে একজন করিতে চাহিতেছেন ; চারি জনের মিলন করিতে-ছেন, ইহা পৃথিবী কিরূপে বুঝিবে? বৈরাগ্য কি তাহা লোকে বুঝিতে পারে, সংসার কি তাহাও বোঝা যায়, কিন্তু নববিধান যদি বলেন, সংসারও যা, বৈরাগ্যও তা, অমনি আর লোকে বুঝিতে পারে না। আপনার স্ত্রী পুত্র লইয়া গৃহ কর্ম্ম করার যে পথ, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হইবারও সেই পথ ;—আর লোকে বুঝিল না। যোগ কি, বড় বড় যোগী যখন বুঝাইতে পারিলেন না, ভক্তি কি, সহস্র সহস্র ভক্ত যখন ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম হইলেন, তখন নববিধানের পরী আকাশে উঠিয়া বলিতেছেন, যোগের পথে গেলে ভক্তিকে পাওয়া যায়। ভক্তির পথে গেলেও যোগকে পাওয়া যায়। কি অসম্বন্ধ কথা! মনে মনে আলোচনা করিয়া কতরূপে

বুঝাইতে গেলাম ততই লোকে বুঝিল না। ভ্রম দূর করিবার জন্য কত যত্ন করিলাম, বিফলপ্রযত্ন হইলাম।

অন্যান্য ধর্ম্মের প্রারম্ভেও এইরূপ। কোন্ ধর্ম্মের আরম্ভে না লোকে বিদ্রূপ করিয়াছে ও খড়্গাহস্ত হইয়াছে? প্রাণের ভাই সব রক্ত দিয়া গেলেন, তথাপি তাঁহাদের ধর্ম্ম লোকে বুঝিল না, তার উপর নববিধান কেবল যোগী নন, কিন্তু মহাযোগী, কেবল ভক্ত নন, কিন্তু মহাভক্ত; কেবল উৎসব নয়, ইহাঁর মহা উৎসব। মহাবুদ্ধি, মহাজ্ঞান, মহাবিদ্যা স্বয়ং না আসিলে ইহাঁকে বুঝিতে পারা যায় না। ইহাঁর কালী মহাকালী, ইহাঁর ব্রত মহাব্রত। আমরা বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে ইহাঁর বিপক্ষে অনেক অমূলক অসত্য শুনিতেছি। কেন শুনিতেছি? যাঁহারা ইহাঁর প্রচারোদ্যোগী, তাঁহাদিগের অবর্ত্তমানেও নহে। যখন তাঁহারা বর্ত্তমান, যখন প্রত্যেকের মুখ হইতে বক্তৃতার পর বক্তৃতা দ্বারা নববিধান প্রচারিত হইতেছে, পুস্তকের পর পুস্তক লেখা হইতেছে, তখন ইহা এত কি দুর্ব্বোধ, যে অনেকে বুঝিতেছেন না? পরব্রহ্ম যদি বল, লোকে বুঝিতে পারে, কিন্তু হরিব্রহ্ম বলিলে আর লোকে বুঝিতে পারে না। হরিনাম যদি বল, শ্রীগৌরাঙ্গের হরিনাম সকলেই বুঝিবে; আমরা হরিনাম করিলেই আর কেহ বুঝিবে না। বেদ বুঝিল, পুরাণও বুঝিল; যাই বলি বেদে পুরাণ, বেদ আর কেহ বুঝিতে পারে না।

অনন্ত কালের সত্য বুঝিবার পক্ষে ধৈর্য্য ধরিতে হইবে। ঈশ্বরপ্রসাদে নববিধানকে আমরা যেন আরও দুর্ব্বোধ করিতে পারি। যদি লোকে ইহার প্রেমকে বুঝিতে না পারে, আমরা আরও প্রেম দেখাইব, প্রেমের মাত্রা বৃদ্ধি করিব। জাতিভেদকে উঠাইতে গেলে যদি লোকে না বুঝে, আমরা সকল ভেদ উঠাইব। পিতা পুত্রে অভেদ, শাস্ত্রে শাস্ত্রে অভেদ ইহ পরলোকে অভেদ প্রচার করিব। সর্ব্বত্যাগী হইতে হয়, তাহাও হইব। সময় আসিলেই লোকে বুঝিতে পারিবে। যখন ছয়টা বাজে নাই, তখন বারটার সূর্য্যকে কেমন করিয়া দেখাইব? তখন ঘড়ির দিকে দেখাইয়া কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে কহিব। যখন সময় হয় নাই, তখন ঈশা, মুষা, শাক্য, চৈতন্যের মিল কে বুঝাইবে।

আমাদের সকলে এক একজন নারদ ও এক একজন যাজ্ঞবল্ক্য হউন। তাঁহারা বীণা বাজাইয়া যোগতত্ত্ব প্রকাশ করুন, তবে তো লোকে বুঝিবে। দুই ঘণ্টার যোগ বুঝিতে পারিতেছে না, তুমি যোগের মাত্রা বৃদ্ধি কর। তুমি কি যোগ কমাইতে চাও, লোকে দুই ঘণ্টার যোগ বুঝিতে পারিল না বলিয়া? তুমি মূর্খকে বুঝাইবার জন্য কি মূর্খ হইবে? যদি যোগ বুঝাইতে চাও, খুব যোগী হও। যখন সকলে দেখিয়া হতাশ হইবে, তখন সকলেই বুঝিবে। হিমালয়ের উচ্চস্থানে বসিয়া যোগ সাধন কর, নিবিড় জঙ্গলে বসিয়া যোগ সাধন কর। সজনে নির্জ্জনে খুব যোগ

সাধন কর; নতুবা লোকে বলিবে, তুই মানুষ, পাপ রাখিয়াছিস্ হৃদয়ের মধ্যে, তোকে কেন যোগী বলিব? ঈশ্বর নাম করিবে, মুষাকে শিরোধার্য্য করিবে, আর চৈতন্যকে অপমান করিবে, ইহা হইলে হইবে না। হিমালয়ের উপর বসিয়া যোগ কর, লোকে না বুঝিয়াও বুঝিবে। লোকে বলিবে, আমরা মহাযোগীকে না বুঝিয়াও বুঝিব; অযোগীকে কিছুতেই পারিব না। মহাযোগীর ভিতরের কার্য্যপ্রণালী না জানিয়াও জানিল।

প্রেমের অবতার, ভাবের অবতার, যোগের অবতার যাঁহারা লোকে তাঁহাদিগকে না বুঝিয়াও বুঝিতে পারে। তুমি যদি কাহাকেও ভালবাসিতে পার না তোমাকে কি বুঝিবে? লক্ষ লক্ষ বার যদি বলিতে পার, "আমায় মার্‌লি কলসীর কাণা, তাই বলে কি প্রেম দিব না।" তোমাকে সকলেই বুঝিবে। যখন প্রেমে উন্মত্ত হইবে, যখন দেখিবে, নববিধানের লোকে এত দিনের পর বুদ্ধিহীন হইয়াছে, সবাই নির্ব্বোধ, পাগল, ব্রহ্মেতে বিলীন, তখন নববিধানকে সহজে লোকে বুঝিবে।

বুদ্ধকে কিছু কিছু লোকে বুঝিতে পারে, তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যদিগকে কিরূপে বুঝিবে? যাহাদের ভিতরে এক রকম, তাহাদের বোঝা যায়, যাহাদের ভিতরে পাঁচ খানা পাঁচ রকম, তাহাদের কিরূপে বুঝিবে? নববিধান দুর্ব্বোধ হইয়াছে, অনেকে বুঝিতে পারিতেছে না, এই দোষ হইতে

যদি ইহাকে মুক্ত করিতে চাও তবে আরও যাতে দুর্ব্বোধ হয়, তাহার চেষ্টা কর। আমার ক্ষুদ্র সিদ্ধান্ত বুঝাইবার চেষ্টা করিলে কি হইবে। অতএব উপাসনা এখন এজন্য যে, যাহাতে নববিধান আরও দুর্ব্বোধ হয়, ঘৃণার পর ঘৃণা যাহাতে আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যে দিনে নববিধানকে স্বর্গীয় বলিয়া লোকে বুঝিবে, সে দিন সমাগত হইবে।

যে রাজ্যে তেল জল একত্রিত হয় না, ভাই ভাই পরস্পর প্রাণ নাশের চেষ্টা করে, সে রাজ্যে নববিধানকে কিরূপে বুঝিবে ? সেখানে যদি বুঝাইতে যাও, পৃথিবীর অসদ্দৃষ্টান্তে যদি ইহাকে বোধগম্য করিতে চাও, কেহই বুঝিবে না। তুমি বলিলে, ঈশ্বরকে আমি দেখিয়াছি, লোকে তোমার কথা বুঝিল না, তুমি বল তাঁহাকে আমি স্পর্শ করিয়াছি। যদি তাহাতেও না বুঝিতে পারে, বল আমি চব্বিশ ঘণ্টা ঈশ্বরের ভিতর ঘুমাইয়া থাকি। তুমি বলিলে, ভক্তি এমনি যে, চরণ জড়াইয়া ধরিয়া থাকি। লোকে বুঝিল না, বল, সুন্দর গোলাপ ফুলকে আমি বুকে করিয়া রহিয়াছি। অবশেষে যখন দেখিবে তুমি পাগল হইয়াছ, তখন বুঝিতে পারিবে। যেমন পাগলকে যে পাগল হয় নাই সে বুঝিতে পারে, সেরূপও বুঝিবে। ধ্যানের সময় যদি কম কর, প্রার্থনার ভাব যদি সহজ হয়, তাহা হইলে লোকে কখনই নববিধানকে বুঝিতে পারিবে না। নাচের পর গান, গানের পর নাচ, হাস্যের পর ক্রন্দন ক্রন্দনের পর হাস্য করিতে থাক, ক্রমে

নববিধানকে বুঝিবে। কেবল কাঁদিতেছ, ইহা লোকে বুঝিতে পারে; কেবল হাসিতেছ, ইহাও লোকে বুঝিতে পারে। কিন্তু হাস্য ক্রন্দন, ক্রন্দন হাস্য বুঝিতে পারে না। খুব দুর্ব্বোধ হইলে বুঝিবে।

জানে না পৃথিবী; আমরা কিরূপ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি। একজন স্বর্গ হইতে বলিতেছেন, আর আমরা লিখিতেছি। এই সকল অহঙ্কারের কথা শুনাইতে হইবে। আরও অহঙ্কারী নীচ ঘৃণিত বলিয়া যাহাতে লোকে আমাদিগকে আরও ঘৃণা করিতে পারে, এরূপ করিতে হইবে। কি করিব? আমরা দুর্ব্বোধ নববিধানের পাল্লায় পড়িয়াছি। আরও দুর্ব্বোধ ব্যাপার সকল স্বর্গ হইতে হুড় হুড় করিয়া আসিতেছে। আমরা কয়েকটী ভাই এমনই যোগ প্রেম সাধন করিব, যে ইহা আরও দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিবে। যে বুঝিবে না, তাহাকে আমরা কি করিব? আমরা বুঝাইতে আসি নাই, পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। কোন ধর্ম্ম প্রচারকই সম্যকরূপে বুঝাইয়া দিবার জন্য আসেন নাই। ঈশ্বর স্বয়ং যখন দুর্ব্বোধ, তখন আমরা কি ঈশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ করিব? যদি দুর্লভ সুলভ হয় তা হলে যে মরিব। নববিধান যদি সামান্য হয়, তবে যে সকলই ব্যর্থ হইয়া যায়।

হরি, যেন না বোঝে যেন না বোঝে। যেন খুব সাধন কষ্টের ভিতর দিয়া লোকে নববিধানের মধ্যে আসে। যোগ্য কি তাহারা ইহা বুঝিতে? যাহারা আমাদের হরিকে কটু

কহে, স্বর্গীয় সাধুদিগকে অবিশ্বাস করে, ঘৃণা করে। হরির চরণে ধরিয়া কাঁদিব যেন তাহারা না বোঝে। যাহাদের বুঝাইতে হয়, তিনি বুঝাইয়া দিবেন। বাড়াও, সাধনের মাত্রা আরও বাড়াও। আমরা যেন পশ্চাদ্গমন না করি। আরও উপাসনা সুমধুর কর। রাস্তার মধ্যে দাঁড়াইয়া বল, "ঈশ্বর এখানে যে হঠাৎ?" একদিন "ঈশ্বর দাঁড়াও, ঈশ্বর দাঁড়াও" বলিয়া দৌড়িয়া যাও। লোকে বলিবে, রাস্তার মাঝে দৌড়িতেছে কে? তুমি একেবারে প্রেমে যোগে উন্মত্ত হইয়া যাও। একটী ছোট গাড়ী হাতে করিয়া হরিকে লইয়া রাস্তায় যাও। লোকে হাসিবে, পাগল বলিবে, নববিধান বুঝিবে। আশি বৎসরের বৃদ্ধের বালকের ন্যায় ব্যবহার হউক। ভয় কি? বালকের পথে, পাগলের পথে, মাতালের পথে না চলিলে নববিধান বুঝিবে না। যখন তিনের লক্ষণাক্রান্ত হইবে, লোকে তখন বুঝিবে, নববিধান কেমন।

পার্ব্বতীবিদায়।

রবিবার ১৭ই আশ্বিন, ১৮০৩ শক; ২রা অক্টোবর ১৮৮১।

পার্ব্বতি, তুমি কি এখন আমাদিগকে ছাড়িয়া স্বামীর আলয়ে গমন করিবে? অদ্য রজনী অবসান হইলে দশমীর সমাগমে বঙ্গদেশে এই গম্ভীর প্রশ্ন উত্থিত হইবে; বঙ্গীয় নরনারীর চক্ষু হইতে বারিধারা পতিত হইবে। আদরের

দুর্গাকে তিন দিবস তিন রাত্রি যথোচিত ভক্তি সম্মান প্রদান করিয়া অবশেষে বিদায় করিয়া দিতে হইবে। আনন্দের উৎসব, হে বঙ্গদেশ, প্রায় শেষ হইল। আনন্দের বাজার ভগ্নপ্রায়। যাহার দুর্গা সেই লইয়া যাইবে; তোমার শাস্ত্রেই বলিতেছে। কেবল তিন রাত্রি উৎসব, চতুর্থ রাত্রি কি ভয়ানক! সেই বেদী শূন্য হইবে, সেই গৃহস্থের বাটী আনন্দবিহীন হইয়া পড়িবে। বিচ্ছেদ! বিচ্ছেদ! বিচ্ছেদ! কাল এই মহাবাক্য তিন বার উচ্চারণ করিতে করিতে উড়িয়া গেল।

বাস্তবিক সংসারে কেবলই বিচ্ছেদ, কিছুই স্থায়ী নহে। তিন রাত্রির পর আর কিছুই থাকে না। সম্পদ থাকে না; ধন থাকে না; স্ত্রী পুত্র পরিবারও থাকে না, ঈশ্বরও কি থাকেন না? তোমার আদরের ঈশ্বর যিনি, তিনিও কি থাকেন না? তিনিও কি চলিয়া যান? যান কোথায়? পিত্রালয় হইতে শ্বশুরালয়ে? দুর্ভাগ্য বঙ্গবাসী গালে হাত দিয়া কাঁদিবে। ধন আসে, ধন যায়; সম্পদ আসে, সম্পদ যায়; তিন রাত্রির পর মদের সুখ, পাপের সুখ, ইন্দ্রিয়ের সুখ চলিয়া যায়। তিন রাত্রির পর সাংসারিক বিলাস মজা কিছুই রহিল না। কেহই রহিল না। ঈশ্বরও কি সেই দলে পড়িলেন? মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত হইব যাঁহার কৃপায়, তিনিও কি মৃত্যুর অধীন হইলেন? এই যে দেবী ঠাকুর দালান সুশোভিত করিয়াছিলেন, এই চলিয়া গেলেন! ভয়ানক অন্ধকার!

বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়া আর কি দালানের পানে কেহ তাকাইতে পারে? চক্ষু কি আর ওদিকে রাখা যায়? কিন্তু নগরের ঘরে ঘরে এই ব্যাপার। দুর্গাকে হারাইয়া দেশ শোক, সন্তাপ ও বিচ্ছেদজ্বালায় আবার এক বৎসরের জন্য অধীর হইল। বঙ্গদেশবাসী আপনার ঘরে বসিয়া জিজ্ঞাসা করে, এ সকল স্বপ্ন না সত্য? ভ্রম না যথার্থ? এ কি অনুমান, ভ্রান্তি, মনকে মিথ্যা কষ্ট দিতেছে, না সত্য সত্যই হৃদয়ের পরমাত্মা পাখী উড়িয়া গেল? স্ত্রী যায় স্বামীর বাড়ীতে; বউ যায় বাপের বাড়ীতে; দেবীরও কি মানুষের ন্যায় ব্যবহার? দেবীও কি বৎসরান্তে স্বামীকে ছাড়িয়া পিত্রালয়ে যান ও পিত্রালয় ছাড়িয়া স্বামীর আলয়ে গমন করেন? দেবীর আবার নিজের ও পরের আলয় কি? তাঁহার আবার পতিগৃহ পিতৃগৃহ কি? দেবী কি আসেন যান? দেবীসম্বন্ধে কি এ সকল লৌকিক আচার খাটে?

যেখানে দেবত্ব, সেখানে সর্ব্বব্যাপিত্বের ভাব। সেখানে বিচ্ছেদ কি? আসা যাওয়া কি? শান্ত হও, বঙ্গদেশ! শান্তচিত্ত হইয়া অনুধাবন কর। কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া গূঢ় রহস্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হও। মহাদেবের ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্না হইয়াছেন যে সতী, মহাদেবের স্বরূপ হইতে স্বতন্ত্র পৃথক হইয়াছেন যে দেবী, তিনি বঙ্গদেশে আরাধিত হইবার জন্য আসিয়াছেন। শ্বশুরধাম পরিত্যাগ করিয়া আপন ধামে, স্বধামে আগমন করিয়াছেন। সতীর প্রকৃত বাসস্থান

পতির কাছে। মহেশ্বরের সহিত প্রকৃতির বিবাহ যোগ। যথা মহেশ্বর, তথা দেবী। এই তো স্বভাব বলে, আমাদিগের সহজ বুদ্ধি বলে। কিন্তু প্রকৃতি কেবল মহেশ্বরের সহিত থাকিলে আমাদিগকে কৈলাস যাত্রা করিতে হয়। মহাদেব বাস করেন কৈলাসে, যোগধামে। এখান হইতে কৈলাসে যাইতে হইবে। পথ প্রদর্শক নাই, নেতা নাই, পাণ্ডা নাই। সেখানকার লোক আসিয়া যে এখান হইতে যাত্রী লইয়া যায়, এরূপ তো শুনি নাই। বৃন্দাবনের লোক এখানে আসে; কাশীর পাণ্ডা এখানে দেখিতে পাওয়া যায়; শ্রীক্ষেত্রের পাণ্ডারাও পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবার জন্য চারিদিকে বেড়ায়। নেতার হাত ধরিয়া জগন্নাথক্ষেত্রেও যাওয়া যায়, শ্রীবৃন্দাবনেও যাওয়া যায়। অন্যান্য তীর্থভ্রমণের জন্য সমুদয় সুযোগ আছে; কিন্তু কৈলাস হইতে কে আসে? বঙ্গদেশের ইতিহাসপাঠক, বল কখন কি কেহ তথা হইতে আসিয়াছে? মহাদেবের নিকট লইয়া যাইবার জন্য পথপ্রদর্শক কে আসে? সেখানে কি যাত্রীদল যায়, না সন্ন্যাসীরা একা একা যায়?

পাহাড় অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। অনেক ঊর্দ্ধে উঠিতে হইবে। বড় দুর্গম স্থান! কৈলাসধাম নির্জ্জন সাধনের স্থান, যোগীদের তপস্যার স্থান। বঙ্গদেশ সেখানে কিরূপে যাইবে? বঙ্গদেশ তথায় যাইতে পারে না, যাইতে চায়ও না। যদি বঙ্গদেশ যাইতে পারিল না, মহাদেব বলি-

লেন, "যাও পার্ব্বতি, তুমি বঙ্গদেশে যাও।" কঠোর সন্ন্যাসী যোগেশ্বর বসিয়া রহিলেন, তাঁহার কোমল প্রকৃতি বঙ্গে আরাধিত হইতে আসিলেন। অখণ্ড ব্রহ্ম চিন্তাতে দুই খণ্ড হইলেন। যোগী এবং সতী; সতী এবং যোগী। কাহাকে চায় বঙ্গদেশ? ঘোর সন্ন্যাসী হইবার যদি ইচ্ছা থাকিত, সন্ন্যাসধর্ম্মের আদর্শ মহেশ্বরকে প্রাপ্ত হইবার জন্য বঙ্গবাসী-গণ কৈলাসে গমন করিত। এখানে? এখানে চায় মহা-দেবের ভার্য্যাকে, মহাদেবের সুলভ অংশকে; গৌরী, পার্ব্বতী, দুর্গা, দুর্গতিনাশিনীকে। দুর্গতিনাশক? না; মহেশ্বরী, সতী, দুর্গতিনাশিনীকে সকলে চায়, অন্ধকার-নাশিনী, শমনবিনাশিনী, স্ত্রীপ্রকৃতি, প্রেমদায়িনী, কোমলাঙ্গী, —কঠোরাঙ্গ নয়। ভক্তি চাই, সন্ন্যাস নয়।

গৃহস্থের বাড়ীর বালক বালিকা যাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিবে, তিনি আসুন, বাবা বলিয়া পাহাড়ের উপর চীৎকার করিয়া যাঁহাকে সন্ন্যাসীরা ডাকে, সে দেবতা নয়। দেব নয়, দেবী। বঙ্গদেশ এই নিবেদন করিল; স্বর্গ বলিলেন, তাহাই হউক। দেবী কোথায় আসিলেন? যাঁহার সহিত উদ্বাহযোগে আবদ্ধ, তাঁহাকে ছাড়িয়া পৃথিবীতে আরাধিত হইবার জন্য আসিলেন। কৈলাস কি? স্বর্গ। সেখানে বাস করেন দেব দেবীতে; দেবী দেবেতে। দেব যিনি, তিনিই দেবী; অবিভক্ত নিত্যকালের একেশ্বরী। স্বর্গে যিনি এক, পৃথিবীতে তিনি ভিন্ন হইলেন। চৈত্র মাসে

গৃহস্থের বাড়ীতে কে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিতে চায়? যেখানে সাংসারিক সম্বন্ধ আছে, মায়া মমতা আছে, সেখানে সন্ন্যাসীর রাজাকে কে অভ্যর্থনা করে? সন্ন্যাসী যদি গৃহস্থের বাড়ীতে ঢোকেন, যেমন দুর্গার আগমনে শঙ্খধ্বনি হয় সেরূপ হইবে না। কি হইবে? শঙ্খধ্বনির পরিবর্ত্তে সন্তানদিগের ক্রন্দনধ্বনি।

মহাদেব যদি আগমন করেন, মহাদেবকে দ্বারের ভিতরে এক পা, দ্বারের বাহিরে আর এক পা রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়; কেহ ঘরে ডাকে না। কুলবালারা তাঁহাকে আদর করিতে পারেন না। যিনি ধ্যানে অচেতনপ্রায়, যাঁর চক্ষু যোগেতে ঢুলু ঢুলু, বৈরাগ্য যাঁহার সর্ব্বাঙ্গে, ব্যাঘ্র-চর্ম্ম যাঁহার পরিধেয় বস্ত্র, সে লোককে গৃহস্থের পরিবার কিরূপে আদর করিবে? তাই বঙ্গদেশ বলিল, "মা দুর্গে, তুমি এস; সন্তান সহিত এস।" সেই দেবীর নিকট ক্রন্দন করিল, নিবেদন করিল। দেবী তথাস্তু বলিয়া অবতীর্ণ হইলেন। কুশলবিহীন অশান্ত নিরানন্দ বঙ্গদেশ শান্তি ও আনন্দে পূর্ণ এবং সমুজ্জ্বলিত হইল। পাপভারাক্রান্ত পৃথি-বীর ক্রন্দন থামিল।

মহাদেবের অর্দ্ধভাব হাসিতে হাসিতে উপস্থিত হইল। শোন। রহস্য আরও শোন। জগতে তাঁহার আবির্ভাব কিরূপ? পৃথিবীতে থাকেন পার্ব্বতী, কৈলাসে থাকেন স্বামী। কিন্তু সতীর প্রাণ সদা সেখানে যেখানে স্বামী

অর্দ্ধাঙ্গ; শরীর কেবল পিত্রালয়ে। সতী যখন পিত্রালয়ে যান, তাঁহার শরীর সেখানে যায়, প্রাণ স্বামীর নিকটে পড়িয়া থাকে। আমরা ব্রহ্মমন্দিরে বসিয়া যে দুর্গার পূজা করি, সে কোন দুর্গা? সে কি কল্পনার দুর্গা? না। প্রকৃতিপূজাই প্রকৃত দুর্গাপূজা। মহেশ্বরের শক্তিপ্রকাশ পূজা। ব্রহ্মকে পর্ব্বতবাসী নির্জ্জনসন্ন্যাসী পূজা করেন। শক্তির আরাধনা সর্ব্বত্র দেখা যায় ব্রহ্ম প্রকৃতিতে প্রকাশবান্। হে ঈশ্বর, তোমার প্রকৃতি কোথায়? পর্ব্বতে, নদীতে, বৃক্ষে, গৃহের সকল বস্তুতে। হে ঈশ্বর, তোমার প্রকৃতি কোথায়? আমার ভিতরে, মনোমধ্যে, আমার বাহিরে, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে।

প্রকৃতি ব্রহ্মেতে অব্যক্ত ছিলেন, সৃষ্টিতে প্রকাশিত হইলেন। জগতে প্রকৃতির আবির্ভাব, জগতেই প্রকৃতির আরাধনা। পূজা হয় স্বর্গে, না পৃথিবীতে? বিশ্বেশ্বরের শক্তি কোথায়? কেন, পৃথিবীতে। মহিমা কোথায়? কেন, পৃথিবীতে। বাসস্থান পৃথিবীতে। অতএব পৃথিবীতে থাকিয়া আমরা শক্তির আরাধনা করিতে পারি। মহেশ্বরের শক্তি উদ্যানে, আকাশে, গ্রহ তারা নক্ষত্র মধ্যে। বিশ্বপিতার শক্তি, বিশ্বমাতার শক্তি বিশ্বেতে, সৃষ্টিতে, সমুদয় জগতে। অতএব এখানেই ব্রহ্মপ্রকৃতির পূজা করিবে। যিনি স্বর্গে, তাঁহার শক্তি জগতে, অতএব গৃহমধ্যে তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। হিমালয়ে তাঁহার সঙ্গে যোগসাধন কর; আবার সংসারে, সৃষ্টিমধ্যে

তাঁহার শক্তি ও মহিমা পূজা কর। জগন্মধ্যে তিনি সর্ব্বদা অর্চ্চনীয়া। কিন্তু কেহ কেহ তাঁহাকে কেবল তিন রাত্রি জগতে অধিষ্ঠান করিতে দেয়। বঙ্গদেশে ঘোষের বাড়ী, মিত্রের বাড়ীতে যে পূজা হয়, তাহা অল্পকালস্থায়ী।

তিন দিন পূজা করিয়া বঙ্গবাসী বলিল, আমি তিন রাত্রি দিলাম ঈশ্বরকে, চতুর্থ রাত্রি আর দিতে পারি না। আমরা অধিক কাল কাহাকেও গৃহে রাখিতে পারি না। সংসারের ধন মানকে তো রাখিতে পারিই না, ভালকে রাখিতে চেষ্টা করিয়াও রাখিতে পারি না! দেবীপূজা, দেবীর আরাধনা অনেক হইল আর পারা যায় না; তিন দিনের পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন হইয়াছে, মন দুর্ব্বল হইয়া, হৃদয় রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। আজ ভগবতী মাকে বিদায় করিয়া দিতেই হইবে। মা কি ছেলের নিকট বিদায় লইতে পারেন? যিনি জননীরূপে প্রকাশিত হইলেন, তিনি কি আবার চলিয়া যান? সন্তানকে ছাড়িয়া মা কি অন্যত্র গমন করেন? সকল মায়া মমতা কাটাইয়া যদি তিনি চলিয়া যান, তাহা হইলে সন্তানের কি হইবে? মাতৃবিচ্ছেদে কে সন্তান পালন করিবে? সন্তান ছাড়িয়া মা যাইতে পারেন না। আমরা যদি ইচ্ছা করি মাকে ছাড়িতে তিনি কদাপি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না, করিতে পারেন না। সতীত্ব, প্রেমশক্তি সমুদয় ব্রহ্মের ভিতর; সে সকল আবার পৃথিবীতে। তোমার বাটিতে হে বঙ্গবাসি! তুমি

কি দুর্গাপূজার দশমী করিতে চাও? নববিধান বলেন, ব্রহ্মপূজায় কেবলই সপ্তমী, কেবলই অষ্টমী, কেবলই নবমী, দশমী আর নাই।

পিত্রালয়ের তত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিয়া লও। বিশ্ব ছাড়া বিশ্বমাতা, বিশ্ব ছাড়া বিশ্বপিতা থাকিতে পারেন না, হইতে পারেন না। শক্তি ছাড়া অগ্নি, শক্তি ছাড়া জল, শক্তি ছাড়া স্ত্রী পুত্র পরিবার কল্পনা কর, কল্পনা হইল না। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহার প্রতিবাদ করিবে। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা ইংলণ্ড হইতে চীৎকার করিয়া বলিবে, শক্তি ছাড়া কিছুই থাকিতে পারে না। শক্তিই বিশ্বের প্রাণ। সেই শক্তি যদি যায়, যেমন ভগবতী পৃথিবী ছাড়িয়া কৈলাসাভিমুখে চলিয়া যাইবেন, তৎক্ষণাৎ গৃহ বাড়ী ব্রহ্মাণ্ড সমস্ত ধ্বংস হইবে। শক্তি ছাড়া জগৎ ভাবা যায় না। মা ছাড়া সন্তান! এ নিষ্ঠুর কল্পনার ছবি আঁকিও না। স্বদেশবাসী, তোমরা ক্রন্দন কর, আমরা ক্রন্দন করিব না। আমরা যে পূজা করি, তাহাতে দশমী নাই। আমাদের যে প্রতিমা, তাহা সৃষ্টির মধ্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত। চন্দ্রের মুখে, পৃথিবীতে, আকাশে, জলে স্থলে সর্ব্বত্র প্রকাশিত। কিছুতেই যে এই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত ছবি মুছিয়া ফেলা যায় না। আমরা কি অনুমান দ্বারা এই দেবীকে আঁকিয়াছি? না, ইনি অনুমানের দেবী নন। আমাদের সত্য দেবীকে সদ্রূপে উজ্জ্বলরূপে দশ দিকে দেখিতেছি। খুব চক্ষুকে মার্জ্জনা কর, পরিষ্কার কর, সত্য

কি অনুমান পরীক্ষা দ্বারা এখনি বুঝিবে। আমাদের দেবী তো কিছুতেই অন্তর্হিত হন না। সূক্ষ্ম দৃষ্টির সম্মুখে ছোট প্রতিমা, স্থূল দৃষ্টির সম্মুখে বড় প্রতিমা। সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর আমাদের সেই দেবীর প্রকাশ, আবার প্রকাণ্ড হইতে প্রকাণ্ডতর তাঁহার প্রকাশ। এই নিরাকারা দেবীকে পূজা কর, হে বঙ্গদেশ। পরাৎপর পরব্রহ্মের মধ্যে তাঁহার যে প্রকৃতি আছে, সেই চিন্ময়ী সেই শক্তিরূপিণী দুর্গতি-নাশিনী দেবীর পূজা আরম্ভ কর, এবং চিরস্থায়ী আনন্দে দেশকে পরিপূর্ণ কর।

হে প্রেমসিন্ধু, হে মহাদেব, আমরা ক্ষুদ্র দেবতার পূজা করি না। হে মহেশ্বর, হে সাধকের ধন, তোমার কোমল প্রকৃতি আমাদিগের নিকট প্রকাশিত কর। তুমি মহেশ্বরী-রূপে দর্শন দাও। তিন রাত্রির পূজার নিয়ম আমাদিগের নাই। পাঁচ বৎসর পাঁচ শতাব্দী পূজা করিলেও তোমার পূজার নিবৃত্তি হয় না। তোমাকে আমরা বিসর্জ্জন দিতে পারি না। তোমাকে বিদায় দেওয়া? এরূপ নিদারুণ বাক্য আমরা সহ্য করিতে পারি না। আমরা তোমাকে যাইতে দিতে পারি না। যাইতে দিব না, যাইতে দিব না। এবার মহেশ্বরী পূজার অত্যন্ত ধূমধাম। কে তোমাকে এবার যাইতে দিবে? মহেশ্বরীরূপে মাতঃ, চির প্রকাশিত থাক; পার্ব্বতী-মূর্ত্তি ধরিয়া ভক্তের চিত্তরঞ্জন কর। দুয়েতেই আমরা আছি। আমরা নববিধানবাদী, যোগেতে আছি, ভক্তিতেও

আছি। হে মহাদেব, তুমি এসেছ? তবে বস, বাঘছালের উপর বস। মা এসেছ? মা দুর্গে, বস। আমরা দুঃখী বঙ্গবাসী, আমাদিগের প্রাণ কেমন করিয়া তিন দিনের পর তোমাকে বিদায় করিয়া দিবে? গৃহস্থের বাড়ী ছাড়িয়া যাইলে বাড়ী যে তোমার জন্য ক্রন্দনে পরিপূর্ণ হইবে। ছেলেদের সকলকে ফেলে তুমি কি মা, সত্য সত্যই চলিয়া যাইবে? তুমি যে মা, তুমি যে মহেশ্বরী। মাকে মা বলিয়া, তিন দিন মাত্র ডাকিয়া তো সুখ হয় না, তুমি তো তাহা জান। মানুষ কি এত উন্নত হইল যে, তিন রাত্রির পর আর তোমাকে প্রয়োজন নাই? কোন হিন্দু কি এমন আছে, যে তিন রাত্রিতেই তাহার সুখের শেষ হইল? মা, এ কথা ঠিক নয়। তিন দিবসের ভজন সাধনে সুখ হইল না, দয়াময়, আর তিন দিবস। তিন দিনে হইল না; আর তিন দিন। হিন্দুকে এ কথা বলিতে হইবে। কাল যখন অসার মৃণ্ময় প্রতিমা স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইবে, তখন সবাই কাঁদিবে। মা, আমাদের ঘরে ফিরে আয়, আবার ফুল দিয়ে পূজা করি। আবার নামিয়া আয় মা, আমরা আবার নৈবেদ্য সাজাই, আবার সপরিবারে সবান্ধবে আমোদ করি। বঙ্গদেশকে অন্ধকার করিয়া কোথায় যাস্? "ওরে তোরা নিয়ে যাস্‌নে, আমার সোণার মাকে তোরা নিয়ে যাস্‌নে।" কোন্ সরলহৃদয় বাল্যস্বভাব হিন্দু না এইরূপ বলিবে? এরূপ বলা স্বাভাবিক। প্রতিমা যদি

জাগ্রৎ সং হইত, তাহা হইলে সকলেই উহাকে ধরিতে যাইত। প্রতিমা তো শুনে না, ফেরে না। বঙ্গদেশ কাঁদিল, আহা, কেহ শুনিল না। নিষ্ঠুর মাটির দেবতা সকলকে কাঁদাইয়া চলিয়া গেল। নিত্যানন্দদায়িনী মা, আমরা তোমাকে অনন্তকাল পূজা করিব। আমরা কি বলিতে পারি, তুমি যাও? আমরা ব্রহ্মেতে ব্রহ্মের প্রকৃতি, ব্রহ্মের প্রকৃতিতে ব্রহ্মকে দর্শন করি। আমরা ব্রহ্মেতে ব্রহ্মসন্তান-গণকেও প্রাপ্ত হই। আমাদের বিচ্ছেদের ভয় নাই। মা আনন্দময়ী নিস্তারিণি, আমরা তোমার কাছে বসিয়াছি। এই স্থানেই কৈলাস। যেখানে মহেশ্বর ও তাঁহার প্রকৃতি মহাদেবী সেই কৈলাস। এখানে কেবলই সপ্তমী। দশমী যে ব্রাহ্মসমাজে হয়, কি হইতে পারে, এ কথা আমরা মানি না। আজ তাই ভাই ভগিনীদের জন্য বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেছি, সমুদয় বঙ্গবাসীকে বুঝাইয়া দাও, দুর্গা কে? দুর্গা কি? দুর্গা কোথায়? মা ধন যিনি, তাঁহার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় না। মা দয়াময়ি, আমরা যেন বলি, ভ্রান্ত বঙ্গবাসী ভাই, মার কাছে আয়, মার কাছে আয়, মার হাত ধর, মার পায়ে পড়; ও পথ ছাড়, এ পথ ধর; নিত্যানন্দের পথ ধর। হে মঙ্গলময়ী জননি, আশীর্ব্বাদ কর, আমরা এমন ভাবে যেন জীবন কাটাইতে পারি, যাহাতে দেশে চিন্ময়ী নিরাকারা সত্য দেবীর পূজা প্রতিষ্ঠিত হয়। মা দয়াময়ি, দয়া করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

দ্বিবিধ নাস্তিকতা।

রবিবার ২৪শে আশ্বিন, ১৮০৩ শক; ৯ই অক্টোবর ১৮৮১।

অবিশ্বাসীদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ঈশ্বরকে যাহারা অবিশ্বাস করে, তাহারা প্রথম শ্রেণীর অবিশ্বাসী; যাহারা ঈশ্বরবাণী অবিশ্বাস করে, তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর অবিশ্বাসী। চলিত ভাষায় বলিতে হইলে বলা যায়, যাহারা ঈশ্বরকে না মানে তাহারা নাস্তিক; শাস্ত্রকে যাহারা না মানে তাহারাও নাস্তিক। যদি কেহ ঈশ্বরকে মানিয়া শাস্ত্রে অবিশ্বাস করে, তাহা হইলে সকল দেশে তাহাকে নাস্তিক বলে। ইহার কি কোন অর্থ নাই? আমি ঈশ্বরকে মানিব, তাঁহাকে ধ্যান করিব, তাঁহার গুণ গান করিব, তাঁহার শাস্ত্র নাই বা মানিলাম, ইহাতে কি দোষ? কি অপরাধ? ব্রহ্মের যাবতীয় স্বরূপ এক এক করিয়া মানিব। ব্রহ্মের সমুদয় লক্ষণ বেদ বেদান্ত সহকারে প্রতিপন্ন কর, আমি অনায়াসে সায় দিব, কিন্তু শাস্ত্র মানিব না। কেবল ব্রহ্মকে মানিয়া কি বিশ্বাসীদের দলে স্থান পাইতে পারি না? পৃথিবী কেন আমাকে বিশ্বাসী বলে না? প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত সকলে ঘৃণার অঙ্গুলি, অবজ্ঞার অঙ্গুলি ও দয়ার অঙ্গুলি আমার প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া কেন বলে, দেখ দেখ, ঐ নাস্তিক যায় দেখ। শাস্ত্র না কি মানিলে নাস্তিক হইতে হয়? ঈশ্বরের সঙ্গে শাস্ত্রের কি যোগ আছে?

যেমন মানুষের সঙ্গে মানুষের মুখের যোগ, তেমং ব্রহ্মকে বিশ্বাস করার সঙ্গে, ব্রহ্মের আদেশে বিশ্বাস কর যোগ। ঈশ্বরের আদেশ, অনন্ত বেদ। ঐ বেদ না মানি সকলেই তোমাকে নাস্তিক বলিবে। এই ব্রহ্মমন্দিরও তোমাকে নাস্তিক বলিতে ছাড়িবে না। আমাদের ধর্ম্মেও তুমি নাস্তিক বলিয়া পরিগণিত হইবে। তুমি বলিবে, ইহার কারণ জানিতে চাই। কারণ জানিতে চাও? তবে শ্রবণ কর। যে বলিল, ঈশ্বর নাই, সে মতে নাস্তিক, বিশ্বাসে নাস্তিক। যে বলিল, ঈশ্বর আছেন, কিন্তু তিনি কথা কন না, নিরাকার বলিয়া তিনি কোন আদেশ করেন না, সে ব্যক্তি ব্যবহারে নাস্তিক, কার্য্যে নাস্তিক।

পণ্ডিতগণ, বিচার কর, অধিক অনিষ্টকারী কোন্ শ্রেণীর নাস্তিক? যে বলিল, ঈশ্বর নাই, সকলেই তাহাকে দেখিয়া সাবধান হইবে। সাপ আসিল বলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিবে, গৃহস্থ পুত্র কন্যাগণকে সাবধান করিবে। সেই যে ভয়ানক হিংস্র জন্তু ব্যাঘ্রতুল্য নাস্তিক, সে যখন আগমন করে, বোধ হয় স্বয়ং মৃত্যু যেন নগরে প্রবেশ করিতেছে। সকলে 'সাবধান! সাবধান!' বলিতে থাকে। উহাতে গৃহস্থ যথা সময়ে সতর্ক হয় ও লোকরক্ষা হয়। নাস্তিক যখন নগরে প্রবেশ করে, স্বয়ং মৃত্যু যেন নাস্তিকের আকার ধারণ করিয়া প্রবিষ্ট হয়। ঐ রাজধানীতে নাস্তিক এক দল প্রবেশ করিতেছে; শুনিবামাত্র লোকে যাহাতে

উহারা প্রবেশ করিতে না পারে, এরূপ উপায় অবলম্বন করিবে।

প্রথম শ্রেণীর নাস্তিকদিগকে যত ভয় করি, তদপেক্ষা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাস্তিকদিগকে অধিক ভয় করি। প্রথম শ্রেণীর নাস্তিকেরা মুখে নাকি স্বীকার করে, ঈশ্বর মানি না, কথায় নাকি বলে, ঈশ্বর নাই, এই জন্য ধর্ম্মসমাজকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিতে পারে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাস্তিক এত ভয়ানক কেন? কেন না, যে এই শ্রেণীর নাস্তিক, সে বলে, আমি ব্রাহ্ম, আমি ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিত, আমি ব্রহ্মবাদী, আমি ব্রহ্মবিশ্বাসী, ব্রহ্মযোগী; আমি ঈশ্বরকে ডাকি, তাঁহার নাম কীর্ত্তনও করি, ব্রহ্মনাম আমার রসনাতে লাগিয়া রহিয়াছে। যেখানে যাই লোকে ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া সমাদর করে। এই যে লোক, ভয়ানক প্রবঞ্চক।

ঈশ্বরবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরবাণী বিশ্বাস না করিলে কি দোষ? দোষ এই, যে ঈশ্বরকে মানে, ঈশ্বর যাহা বলেন তাহা সে মানে না। ঈশ্বর কি আদেশ করিতে পারেন না? তিনি কি কথা কন না? শাস্ত্র কি হইতে পারে না? পিতা মাতাকে মান্য কর, সত্য বল, এমন সব বিষয়েও কি তাঁহার আদেশ নাই? ভাত খাও ক্ষুধার সময়; জল পান কর তৃষ্ণা হইলে, ইহা কি তিনি বলেন না? বিদ্যা শিক্ষা কর, এ কথা কি ঈশ্বরের আদেশ নয়? প্রতি দিন উপাসনা কর, এ বিধির কি দলিল নাই? কেহ

কি সাক্ষ্য দিতে পার না যে, ইহা স্বকর্ণে শুনিয়াছ? তবে কর কেন? আমাদের জ্ঞানে উচিত বোধ হয় বলিয়া। অন্যথা এক সীমা হইতে দেশের আর এক সীমা পর্য্যন্ত সকলকে জিজ্ঞাসা কর, কেহই বলিবে না ইহা তাঁহার অভিপ্রেত। এইটী করা ঈশ্বরের অভিপ্রেত, ইহা কেহই বলিতে পারে না।

ঈশ্বরবাণী কি শোনা যায়? কি ভয়ানক ব্রহ্মজ্ঞ তুমি? তুমি খাও কেন? তুমি ধর্ম্ম সাধন কর কেন? গরিবকে কেন টাকা দাও? ক্ষুধিতকে কেন অন্ন দাও? পাথককে ঘরে লইয়া গিয়া সমাদর কেন কর? ঈশ্বর বলেন নাই নিশ্চয় জান? নিশ্চয় জানি। তবে এ সকল কর কেন? আমার করা ভাল বোধ হয় তাই করি। তবে যাহা তোমার ভাল বলিয়া বোধ হয়, তুমি তাহার উপর নির্ভর করিয়াছ। তোমার বুদ্ধি তোমার পরিত্রাণের নেতা হইয়াছে, তুমিই তোমার মুক্তির সোপান হইয়াছ? তুমি কপট ধূর্ত্ত। তুমি ঈশ্বরকে জ্ঞানে বিশ্বাস কর, ব্যবহারে, ঈশ্বর না থাকিলে যেমন লোকে করে, তুমি ঠিক তেমনই কর। তুমি সন্তানের মস্তক যে কাটিবে না তার প্রমাণ কি? তুমি যে অনায়াসে তাহা করিতে পার। না, আমি তাহা পারি না, কেন না আমার মনে হয় উহা ভাল কর্ম্ম নয়।

তোমার যা মনে হয় তাহাই তোমার শাস্ত্র? তাহাই তোমার মুক্তি? তোমার বুদ্ধি কি বেদ? নাস্তিক কি বলে? নাস্তিক, তুমি কি বল? আমিও ঠিক ঐ কথা

বলি। ঈশ্বর কি বলিয়াছেন, কি না বলিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত তাহার নিশ্চয় হয় নাই। কিছু কি ঠিক করিয়া বলা যায়? ঈশ্বরবাণী আবার কি? তবে এ উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি? প্রভেদ এই যে একজন বিদ্যালয়ে পড়িয়া বুদ্ধিকে কথঞ্চিৎ মার্জ্জিত করিয়াছে, আর একজন বুদ্ধিকে তেমন মার্জ্জিত করে নাই। একজন মুখে নাস্তিক, আর এক জন কার্য্যে নাস্তিক। একজনের যুক্তি কিছুমাত্র নাই যে ধর্ম্মকে প্রমাণিত করিবে, আর একজন আপন হস্তে আপনার পরিত্রাণ সাধন করিতে উদ্যত।

ঈশ্বর যে মানে না সেও নাস্তিক, শাস্ত্র যে মানে না সেও নাস্তিক। শাস্ত্র যে মানে না আমরা তাহাকে মানি না; তাহার ভ্রষ্টাচার আমরা অনুমোদন করি না। ঈশ্বরকে মানা অপেক্ষা ঈশ্বরবাণী মানা আবশ্যক। ঈশ্বর মানিয়া ঈশ্বরের বাণী অস্বীকার করা কিরূপ? ঈশ্বরকে অৰ্দ্ধেক গ্রহণ করিয়া অৰ্দ্ধেক অস্বীকার করা যেরূপ। ব্যবহারে যদি নাস্তিক হয়, কার্য্যে যদি নাস্তিক হয়, তবে তাহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাস্তিকের দলে গণ্য করিতে হইবে। বর্ত্তমান বংশ তাহাকে মর্য্যাদা দিতে পারে, কিন্তু যে বংশ আসিতেছে, সে বংশ কখনই মর্য্যাদা দিবে না, তাহারা ঘৃণা করিবে, প্রচ্ছন্ন নাস্তিককে সূক্ষ্মরূপে বিচারিত হইতে হইবে। পৃথিবী বলিবে, মুখে ইহারা ঈশ্বরকে অস্বীকার করে নাই বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ নাস্তিকতা অবলম্বন করিয়াছে।

ঈশ্বর আছেন, তাহার প্রমাণ কি? ঈশ্বরবাণীই তাহার প্রমাণ। ব্রহ্ম হইতে বেদ বড়, লোকে বলিয়া থাকে। ইহার গূঢ় অর্থ আছে। ব্রহ্ম যদি না বলেন, "আমি আছি," আমি মানিব না। তিনি আগে কথা কন, "আমি আছি" "আমি আছি" বলেন, পরে তাঁহাকে বিশ্বাস করি। না বলিলে কি বিশ্বাস করিতে পারিতাম? না কথা কহিলে কি বিশ্বাস করা যায়? শব পড়িয়া রহিয়াছে। সে "আমি আছি" বলে না, বলিতে পারে না। সেই জন্যই মনুষ্যাকৃতি থাকিলেও তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারি না। জাগ্রত জীবন্ত ব্রহ্ম আছেন যেমন বলিব, তেমনই বলিব, তিনি কথা কন; তিনি বলেন 'আমি আছি।'

যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে কি লেখা আছে? ঈশ্বরসত্তা বিশ্বাসের মূলে তাঁহার 'আমি আছি' এই বাণী। 'আমি আছি' এই কথার মধ্যে যে বেদ ইহা ঋক যজু সাম অথর্ব্ব বেদ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। সর্ব্ব প্রথমেই এই 'আমি আছি' বেদ ব্রহ্মমুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল। যেমনই ব্রহ্মাণ্ডপাত ব্রহ্মাণ্ডকে চমকিত করিয়া আকাশকে বিকম্পিত করিয়া 'আমি আছি,' 'আমি আছি,' বলিলেন অমনি তাঁহার উপাসনা হইল, স্তব স্তুতি পঠিত হইতে লাগিল, সঙ্গীত সহকারে চারিদিকে অর্চ্চনা আরম্ভ হইল। 'আমি আছি' শব্দ যখন বন্ধ ছিল, তখন বেদের প্রথম পৃষ্ঠাও রচিত হয় নাই। যাই ব্রহ্ম 'আমি আছি' বলিলেন, অমনি পূজা হইল, হরিসংকীর্ত্তন

হইল। তবে ঈশ্বর বড় না ঈশ্বরবাণী বড়? আমি বলি, ঈশ্বর অপেক্ষা ঈশ্বরবাণী বড়।

আমাদিগের নিকট ঈশ্বরবাণীর আদর অধিক। কেন না এই বাণীই আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকট লইয়া যাইবে। পথ বড় না ঘর বড়? পথের আদর করিলে ঘরে যাওয়া যায়। আমি যে বলিব, ঈশ্বর আছেন, আগে আমার ঈশ্বরবাণী শ্রবণ করা আবশ্যক। পর্ব্বতের মধ্যে ব্রহ্ম, সাগরের মধ্যে ব্রহ্ম; দক্ষিণে বামে, উৰ্দ্ধে অধোতে ব্রহ্ম বর্ত্তমান থাকিয়া 'আমি আছি' এই বেদ বাক্য, এই প্রাচীন কথা উচ্চারণ করিতেছেন। যাই জীব শুনিতে পাইলেন, শরীর কম্পিত হইয়া উঠিল। যদি তুমি বল, ব্রহ্মকে মান, কিন্তু তাঁহার কথা শোন নাই, তবে আমি জানি না, তুমি কোন শ্রেণীর লোক। এই গেল প্রথম কথা।

পরে আমি জিজ্ঞাসা করি, হে মানব, তুমি আহার কর কিসের জন্য? ক্ষুধা শব্দের অর্থ কি? দেহগুরু, জগদ্‌গুরু, ক্ষুধার ভিতর দিয়া আদেশ করিতেছেন, 'আহার কর।' প্রথম পরিচ্ছেদে যিনি 'আমি আছি, আমি আছি' বলেন, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি 'তুমি খাও, তুমি যাও, তুমি কাজ কর, বলিয়া কথা কন। এই যে ক্ষুধার সময় আহার করিয়া আমরা শরীরকে স্বচ্ছন্দে রাখি, ইহা কোথা হইতে আসিল? যদি তিনি না বলিতেন, ক্ষুধা কি আসিত? বল, খাইব না। এমন আদেশ আসিল যে খাইতেই হইবে। তুমি

অনুভব করিতেছ, এমন শক্তি আছে যাহা বলপূর্ব্বক খাও-য়াইয়া থাকে। ক্ষুধা সহজ নয়। রাজা অপেক্ষা ক্ষুধা বড়। ক্ষুধা গুরু পরম গুরু। ক্ষুধাকে জগতের গুরু বলি কেন? বারম্বার বলিব। ইহার মধ্যে এমন একখানি বেদ আছে যে, কোন ক্রমেই ইহাকে অবজ্ঞা করিতে পারি না। বরং ঋগ্বেদে ভ্রম বাহির করিতে পারি, কিন্তু ক্ষুধাবেদ অভ্রান্তবেদ। ক্ষুধার অবস্থায় আহার দ্বারা শরীরকে রক্ষা করিবে, ঈশ্বরের ইহা আদেশ। কে পুস্তক পড়িয়া অন্ন খায়?

সামান্য সামান্য বিষয়ে যখন আদেশ হয়, তখন বড় বিষয়ে কি হয় না? পূজা কর, ইহা কি ঈশ্বর বলেন না? তুমি কি বল, ঈশ্বরের কথা বলিবার শক্তি নাই? বাহির হও নাস্তিক। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রচ্ছন্ন নাস্তিকরূপে তুমি অবস্থান করিতেছ, নরনারীর প্রাণ নাশ করিবে? তুমি বল ঈশ্বরবাণীর যুক্তি নাই, প্রমাণ নাই? প্রকাণ্ড বজ্রধ্বনির ন্যায় গম্ভীর স্বরে তিনি বলিতেছেন, শরীর পোষণের জন্য আহার কর, আত্মার রক্ষার জন্য উপাসনা কর। কাহার কথা? সৃষ্টিকর্ত্তাকে মানাও যেমন, সৃষ্টিকর্ত্তার আদেশ মানাও তেমনি। দুই সমান। ঈশ্বর আছেন বলাও যেমন, তিনি কথা কন স্বীকার করাও তেমনি। এ দুই বিচ্ছিন্ন কর, বিচ্ছিন্ন করিয়া বল, আমি ঈশ্বরের উপাসনা করি ভাল বোধ হয় বলিয়া, অথবা অমুক বন্ধু বলিয়াছেন বলিয়া; আমি তোমার কথায় সায় দিব না, লোকের কথায় উপাসনা করিব

না। উপাসনা করিব মানুষের কথায়? মানুষ এখন যাহাকে ভাল বলে, দুই ঘণ্টা পরে যদি তাহাকে মন্দ বলে? তুমি নিজের বুদ্ধিতে ভাল লাগে বলিয়া উপাসনা কর?

অহঙ্কারী মানব, তুমি পর্ব্বতকে রাখিতেছ চুলের উপর! ঘর বাঁধিতেছ, ঘরের পত্তন ভূমি নাই! আকাশে পর্ব্বত স্থাপন! গোড়াতে ঈশ্বরবাণী নাই, ফল লইয়া আমোদ করিতেছ, মূলের দিকে দৃষ্টি নাই! কি ভয়ানক ব্যাপার! ঈশ্বরবাণী না মানা কি ভয়ানক! কাল সকাল হইতে না হইতে ব্রহ্মযোগ, ব্রহ্মভক্তি, ব্রহ্মবিশ্বাস, সকলে মিলিয়া নগরকীর্ত্তন, সকলই চলিয়া যাইতে পারে। সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার দূর হয়, হয় তো কতকগুলি লোকের কথায় তুমি মনে করিতে পার, সে সকলও তেমনি তিরোহিত হইল। অহঙ্কার করিও না; বলিও না, কাপড় পরি, আহার করি, গরিবকে টাকা দিই সংস্কার বশতঃ। ভাল লাগে বলিয়া তুমি হরিনাম কর?

অন্য সব ব্যাপারের তোমার প্রমাণ আছে, কেবল এই ঈশ্বরবাণীর প্রমাণ তুমি পাও না? তোমার পুত্রের মস্তক যে তুমি কাটিবে না, তাহা কে বলিল? অবস্থায় পড়িলে তোমার সম্বন্ধে এ সব কিছুই আশ্চর্য্য নয়। তোমার সমস্ত জীবনটা নাস্তিক। তোমার গৃহ ভিত্তিশূন্য। যখন বৃষ্টি পড়িবে, পত্তনভূমি আন্দোলিত হইবে, ঝুপ ঝাপ করিয়া প্রকাণ্ড বাড়ী পড়িয়া যাইবে। বৃক্ষতলে বসিয়া তুমি ফলরাশি

দেখিতেছ, কিন্তু অবিশ্বাসের প্রচ্ছন্ন কীট যে সব কাটিয়া ফেলিল দেখিলে না? দেখ, গোড়া একেবারে কাটিয়া শূন্য করিল। মড়্ মড়্ করিয়া পড়িল বৃহৎ তরু। কোথায় ফল, কোথায় ছায়া? সেই জন্যই বিনীত ভাবে অনুরোধ করিতেছি, এখনও দিন আছে, সাবধান হও। শমন নিকটে এখনও আসে নাই। ঈশ্বরবাণী শ্রবণ কর। ঈশ্বরবাণীতে অবিশ্বাস করিও না। ইহা অবিশ্বাস করিয়া কেহ বাঁচে নাই।

কেবল ঈশ্বর বিশ্বাস করিলে চলিবে না। যে বলে ঈশ্বরের বাণী মানি না, সে ব্যক্তি অনেক অন্যায় কর্ম্ম করিতে পারে। তুমি বুদ্ধিকে গুরু করিবে? সেই পুরাতন গুরু অহঙ্কারী বুদ্ধি, তাহাকে ছাড়িবে না? ঈশ্বর যাহা বলিবেন, তুমি তাহা শুনিবে না? আমি কি তোমাকে চিনি না? তুমি বেদ উড়াইলে, শাস্ত্র উড়াইলে, আপনাকে আপনি পরিত্রাতা করিলে। পাছে তোমার পুরাতন দুষ্ট বুদ্ধি মারা যায়, পাছে তোমার অহংভাব চলিয়া যায়, পাছে ঈশ্বর-চরণে আত্মবিসর্জ্জন করিতে হয়, এই ভয়ে তুমি ঈশ্বরবাণী মানিতে চাও না। আচ্ছা, দেশের বেদ, আধুনিক পুরাণ তুমি মান না, দৈববাণী, বিবেকবাণী, যোগের অবস্থায় যাহা আত্মার মধ্যে নিনাদিত হয়, গম্ভীর ভাবে উচ্চারিত হয়, সে শব্দকে কেন মান না? শব্দই যে ব্রহ্ম। শব্দ নাই অথচ ব্রহ্ম, একি কথা?

যে ঈশ্বর কথা কয় না, সে তো কল্পনা। তোমার মনের অহঙ্কার কি ঈশ্বর? অহঙ্কারের নাম তুমি ঈশ্বর রাখিয়াছ? যথার্থ ঈশ্বর কে? যিনি বলেন উঠ, বস, খাও, পড়, ধ্যান কর, একতারা বাজাও, এই নির্জ্জন স্থানে বসিয়া সাধন কর, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ কর, উৎকৃষ্ট শ্লোক সকল চিন্তা কর, সাধুদের দৃষ্টান্ত অবলম্বন কর। যাঁর মুখে এ সব কথা তিনিই ব্রহ্ম। যে কথা কয় না, সে তো ভূত প্রেত। আমাদিগের ব্রহ্ম কি ভূত প্রেত? ঐ দেখ, ঐ দেখ, কথা কহিল না, প্রেতত্ব সিদ্ধ হইল, ভূত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। ব্রহ্ম কথা কন, ব্রহ্ম ভূত ও প্রেত নহেন। নিঃশব্দতার মধ্যে তিনি উপদেশ দেন; অবাক্ হইয়া তিনি কথা কন। যাহারা অৰ্দ্ধেক ব্রহ্ম মানে, তাহাদের হস্ত হইতে ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করুন। ব্যবহারে যাহারা নাস্তিক, তাহাদের হস্ত হইতে যেন আমরা নিয়ত রক্ষা পাই।

প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতাকে আমরা বড় ভয় করি। এ নাস্তিকতাকে দূর করিয়া দাও। মান, এখনই মান, ঈশ্বরবাণী মান। ঈশ্বরের নিকট উপদেশ শ্রবণ কর। নীতি উপদেশ সকল ঈশ্বরপ্রমুখাৎ শ্রবণ কর। বল, যাহা তিনি বলিবেন তাহাই করিব। যে আসনে বসিয়াছ সে আসন হইতে উঠিবে না, যতক্ষণ না তিনি আদেশ করিবেন। কোন কার্য্য তাঁহার আদেশ ব্যতীত করিবে না। তুমি মনুষ্য, একটী তৃণ নাড়িবার তোমার অধিকার নাই। যতক্ষণ না মহাপ্রভু বলিবেন,

যতক্ষণ না কোন আদেশ করিবেন, ততক্ষণ কিছুই করা হইতে পারে না। যদি ঈশ্বর না আদেশ করেন, পাঁচ বৎসর এই স্থানে বসিয়া থাকিতে হইলেও থাকিবে। তিনি বলিবেন খাও, তবে আমি খাইব। খাওয়াও ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝিয়া সমাধা করিব। তিনি না বলিলে, সংসারের কোন কার্য্য করিতে পারিব না।

কে যায় কার্য্যালয়ে ঈশ্বরের আদেশ ব্যতীত? যে টাকা উপার্জ্জন করে ঈশ্বরের আদেশ ব্যতীত, ঈশ্বরাদেশ না পাইয়া যে কাজ করিতে যায়, সে নাস্তিক। এক পয়সা যে ঈশ্বরের অনভিপ্রায়ে উপার্জ্জন করে সে নাস্তিক। কে যায় বিদ্যালয়ে উপাধি লইবার জন্য ঈশ্বরের আদেশ ব্যতীত? ঈশ্বরাদেশ না শুনিয়া বিদ্যালয়ে যায় যে যুবা, সে নাস্তিক। ব্রহ্মমন্দিরে রবিবারে রবিবারে ঈশ্বরের আজ্ঞা না শুনিয়া যে ব্যক্তি আগমন করে, সে নাস্তিক। এই সকল নাস্তিক কি পূর্ব্বাঞ্চলে কি পশ্চিমাঞ্চলে সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই নাস্তিকতার আগুন যেন জীবকে দগ্ধ না করে, এই হৃদয়ের প্রার্থনা।

তীর্থ-চতুষ্টয়।

রবিবার ১লা কার্ত্তিক, ১৮০৩ শক; ১৬ই অক্টোবর ১৮৮১।

কোন বিচক্ষণ তত্ত্বপ্রিয় পরিব্রাজক চারি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া তথায় কি কি দেখিলেন, তদ্‌বৃত্তান্ত বলি শ্রবণ কর। এই চারি তীর্থ পৃথিবীতে সর্ব্বাদৃত আশ্চর্য্য তীর্থ। ইহার

প্রত্যেকটী দেখা আবশ্যক, নতুবা জ্ঞান ভক্তি চরিতার্থ হইবে না, ঘরে বসিয়া থাকিলে বিবিধ ভ্রান্তিতে ক্লেশ পাইতে হইবে, এই ভাবিয়া পরিব্রাজক স্থির করিলেন, সমুদয় নিজ চক্ষে দেখিব, নিজ কর্ণে শুনিব, বিবিধ তীর্থ সন্দর্শন করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্মের পন্থা অবধারণ করিব; ভ্রমণ দ্বারা ভগবানের কীর্ত্তিকলাপ দর্শন করিলে হৃদয়ে পুণ্য শান্তি সঞ্চিত হইবে; তীর্থভ্রমণে নিশ্চয়ই মোক্ষফল লাভ হইবে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কাহারও সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া পরিব্রাজক গৃহ হইতে নির্গত হইলেন।

প্রথমেই অতি নিকটবর্ত্তী দেহতীর্থ। তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কেবলই কর্ম্মকাণ্ডের প্রাদুর্ভাব। হস্ত পদ কর্ম্মে ব্যস্ত; চক্ষু কর্ণ কর্ম্মে ব্যস্ত; প্রাতঃকালে কর্ম্ম, মধ্যাহ্নে কর্ম্ম, অপরাহ্নে কর্ম্ম, রজনীতে কর্ম্ম। এই কর্ম্ম যে আবার কত প্রকার তাহা গণনা করা যায় না। হিন্দুর আচার ব্যবহার দেখিলেই জানা যায়, বাহ্যলক্ষণে মুসলমানকে চিনিতে পারা যায়, খ্রীষ্টবাদীকে সহজেই মুসলমান হইতে পৃথক করা যায়, বৌদ্ধকেও অন্য তিন সম্প্রদায়ের বহির্ভূত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বৈশেষিক লক্ষণ আছে। উহার দ্বারা এক সম্প্রদায়কে অপর সম্প্রদায় হইতে প্রভেদ করা যায়। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকে আপন আপন বাহ্যিক লক্ষণ দেখাইয়া সকলকে আহ্বান ও আকর্ষণ করিতেছে।

দেহতীর্থে কেবলই ক্রিয়াকলাপ, কেবলই বিধি নিয়ম, কেবল কার্য্যের আড়ম্বর, দেহতীর্থ কেবলই বলিতেছে, আইস, আমার নিকটে আইস। মোক্ষধামে যদি যাইবে, এইরূপে ব্রতাদি গ্রহণ কর, এইরূপে যাগ যজ্ঞ অনুষ্ঠান কর। এই গৃহধর্ম্ম, এই বনবাসীর ধর্ম্ম, এই ব্রহ্মচারীর লক্ষণ, এই নির্ব্বাণের লক্ষণ। এইরূপে হোম করিতে হয়, এইরূপে জলাভিষেক করিতে হয়। এই এই মন্ত্র উচ্চারণ করা আবশ্যক, এইরূপে শরীরকে নিগ্রহ করা উচিত; এই প্রণালীতে ঈশ্বরের পূজা করিতে হয়। সকলেরই বিভিন্ন লক্ষণ, বিভিন্ন আচার ব্যবহার। এ সকলই মায়া। দেহ যদি মায়া হইল, অসার হইল, তবে যাবতীয় কর্ম্মকাণ্ড কেবল মায়ার খেলা। তন্মধ্যে শান্তি কুশল নাই।

চারিদিকে পরিব্রাজককে লইয়া টানাটানি। কর্ম্মকাণ্ডের ভয়ানক ভিড়ের মধ্যে তিনি প্রাণরক্ষায় অসমর্থ; স্থির হইয়া বিবেচনা করিবেন কিরূপে? কোন্ কর্ম্মে ধাবিত হইবেন, কোন্ ব্রত গ্রহণ করিবেন, তাহা নিয়ম করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য। এত কর্ম্ম! শরীরটা কলের মত একবার এদিক একবার ওদিক ঘুরিতেছে। এ তীর্থে কেবল কর্ম্মের উপরে পরিত্রাণ নির্ভর করে। আত্মার কল্যাণ নির্ভর করিতেছে সাত্ত্বিক আহারের উপর, কিম্বা বৈরাগ্য বস্ত্রের উপর। কেবল বাহ্য লক্ষণেই ধর্ম্ম স্থাপিত। হস্ত যদি এই কাজ

করে, মানুষ বৈকুণ্ঠে চলিল; মুখ যদি এই শব্দ উচ্চারণ করে, তবেই তাহার পরিত্রাণ।

কর্ম্মকাণ্ডের ভিড়ে অবসন্ন হইয়া পথিক চলিলেন, দ্বিতীয় তীর্থে। দেহতীর্থের পার্শ্বেই মন তীর্থ। এখানে কোন প্রকার শারীরিক ভাব নাই, কিন্তু সাম্প্রাদায়িক ভাব তদ্রূপই। সেই ঈশাবাদী, সেই মহম্মদবাদী, সেই হিন্দু, সেই বৌদ্ধ, সেই শিখ। সমুদয় সম্প্রাদায়ের মধ্যে কেবলই কলহ বিবাদ, মতে মতে বিবাদ, গ্রন্থে গ্রন্থে বিরোধ। এখানে বুদ্ধি সর্ব্বদাই ব্যস্ত রহিয়াছে। দেহতীর্থে হাত যেমন, এখানে বুদ্ধি তেমনই সর্ব্বপ্রধান। বুদ্ধি কত মত উদ্ভাবন করিতেছে, কত মত প্রচার করিতেছে। এখানে রাশি রাশি পুস্তক; রাশি রাশি সিদ্ধান্ত। নানা সম্প্রদায়ের নানা শাস্ত্র। এ সম্প্রদায়ের বেদ ও সম্প্রাদায়ের কোরাণ। যেমন কলহ বিবাদ প্রথম তীর্থে, তেমনি কলহ বিবাদ দ্বিতীয় তীর্থে। এই মন তীর্থের ভিতর কত বিবাদ! কার মত ভাল, কার মত মন্দ? ললিতবিস্তর মহৎ, কি বাইবেল মহৎ? কোরাণ বড়, কি বেদ বড়? কেবল এই সকল কথা লইয়া তুমুল সংগ্রাম। সমস্ত নিরাকার রাজ্য বটে, সাকার বাহ্যাড়ম্বর কিছুই নাই; কিন্তু সাম্প্রাদায়িকতা ন্যূনতর নহে।

দেহতীর্থে হস্তসঞ্চালন যেমন দেখা যাইত, এখানে তেমন নাই বটে, কিন্তু বিদ্যা ও বুদ্ধির ঠিক সেইরূপ ব্যবহার হইতেছে। বুদ্ধি কেবল এক এক মত প্রচার করিতেছে,

আর কতকগুলি মত খণ্ডন করিতেছে। পরিব্রাজক দেখিলেন, সকলেই আপনাপন ধর্ম্মে অপরকে টানিবার জন্য ব্যস্ত; আপনাপন মতে অপরকে দীক্ষিত করিবার জন্য চেষ্টিত। মতই সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিয়াছে। এইটী মানিলে স্বর্গ, এটী না মানিলে নরক, কেবল এই যুক্তি। আমার মত ভাল, তোমার মতে দোষ আছে, আমার গ্রন্থ ভাল, তোমার গ্রন্থে ভুল আছে, এইরূপ পরনিন্দা লইয়া সকলে ব্যস্ত। শত্রু যেমন বৈরনির্যাতন করিয়া বিনাশ করিবার চেষ্টা করে, তেমনই এক ধর্ম্মসম্প্রদায় আর এক ধর্ম্মসম্প্রদায়কে বিনাশ করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতেছে। এ তীর্থে কি মনুষ্য সুখী হইতে পারে? বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি বলিতেছে, এখানে মিলনের সম্ভাবনা নাই। দেহতীর্থে যেমন সকলের হস্ত ভিন্ন ভিন্ন দিকে, এখানে সকলের বুদ্ধি তেমনই ভিন্ন ভিন্ন দিকে ঘুরিতেছে। বুদ্ধিতে মঙ্গলের পথ মিলিল না; বিচারে কুশলের সম্ভাবনা নাই।

দ্বিতীয় তীর্থ পরিত্যাগ করিয়া সেই তত্ত্বান্বেষী তৃতীয় তীর্থে প্রবেশ করিল। সেখানে কিছু কিছু কুশলের বাতাস বহিতেছে। সেটী হৃদয়তীর্থ। মন তীর্থের পার্শ্বেই ইহা অবস্থিত। এই তীর্থ অতি সুবিস্তৃত, এখানে সঙ্কীর্ণতা নাই। দেহ মন যেমন সঙ্কীর্ণ তীর্থ, ইহা সেরূপ নহে। এখানে প্রেম সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে। ভাবিতে ভাবিতে, দেখিতে দেখিতে এখানকার উচ্চতর গভীরতর প্রেমের ব্যাপারের

মধ্যে পরিব্রাজক প্রবেশ করিলেন। সেখানে আত্মপর যে নাই এমন নহে, আপনার ধর্ম্ম, অন্যের ধর্ম্ম, আপনার সম্প্রদায়, অন্যের সম্প্রদায়, এরূপ প্রভেদ আছে। স্বজাতীয়, বিজাতীয়ের ভিন্নতা সেখানেও আছে। কিন্তু প্রেম সেই দেশের রাজা। তিনি এমন সুব্যবস্থা করিয়াছেন যে, সহস্র প্রকার মতভেদ থাকিলেও একজন অপরকে ভালবাসিতে পারে। এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়স্থ লোকের সেবা করিয়া সুখানুভব করিয়া থাকে। এক দেশের লোক দয়ার্দ্র হইয়া অপর দেশীয় ব্যক্তির দুঃখ মোচন করে। দেশভেদে জাতিভেদে প্রণয়ের ব্যাঘাত হয় না। মতসম্বন্ধে যে যত দূরস্থ ও বিরোধী হউক না কেন হৃদয়ের পক্ষে সকলেই ভ্রাতা ও ভগিনী। প্রেমের এইরূপ মিলনবিধি। ধর্ম্ম কেবল এ রাজ্যে ভালবাসা। পরম পিতাকে ভালবাসা এবং ভ্রাতাকে ভালবাসা।

চারিদিকে নানা সম্প্রদায়। তাহাদের বিবাদ বিসম্বাদ সত্ত্বেও হৃদয় এমনই কোমল যে, উহা স্বভাবতঃ সকলকে ভাই বলিয়া ডাকিতেছে। হিন্দু যিনি, তিনি ক্রিয়া কর্ম্মে মুসলমান প্রভৃতিকে বিজাতীয় মনে করেন, বিধর্ম্মী জ্ঞান করেন। কিন্তু যাই তিনি উচ্চ ছাদের উপর দাঁড়াইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, বিভিন্ন মত ও ক্রিয়া সকল অবলোকন করিলেন, অমনি তাঁহার হৃদয় উন্মুক্ত হইল, সর্ব্বজীবে প্রেম ছড়াইয়া পড়িল। তিনি বলিলেন, "হইলই

বা বিরোধী, হইলই বা ভিন্ন সম্প্রদায়; সকলকে ভাই বলিয়া, ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া ভালবাসিব, ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে দয়া করিব। কেবল হিন্দুকে কেন? যবনকে মুসলমানকেও আলিঙ্গন করিব। কেন না ঈশ্বরের দ্বারে উচ্চ নীচ নাই।"

বুদ্ধি বলে উচ্চ নীচ আছে, কর্ম্মকাণ্ডও বলে লোক মধ্যে শুদ্ধ অশুদ্ধের প্রভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু যখন প্রেম উথলিল, হৃদয়তীর্থ প্রেমে ভাসিল, তখন প্রভেদসেতু উলঙ্ঘন করিয়া শান্তি জল বিস্তৃত হইল। তর্ক কর, বিচার কর, কর্ম্মকাণ্ড লইয়া; আপনার মত ঠিক রাখ, অপরের বিরুদ্ধমতের প্রতিবাদ কর, কিন্তু আবার ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে সকলকে ভালবাস, হৃদয়তীর্থে কেবলই ভালবাসা। পথিক ভাবিলেন এ কোথায় আসিলাম? এই দেখিলাম, বুদ্ধি শাস্ত্র লইয়া ঘোরতর বিচার করিতেছে, ভয়ানক বিবাদ চলিতেছে, এ আবার কোথায় আসিয়া পড়িলাম? এত দলাদলির ভিতরেও প্রেম! যে যেরূপ বিচার করে করুক, যেরূপ অনুষ্ঠান করিতে চায় করুক, কিন্তু মার সন্তান হইলেই ভাই, এখানে কেবল এই যুক্তি। ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে সকলকে ভালবাসাই এখানকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম।

প্রেমের সুশীতল বায়ু সেবন করিতে করিতে পরিব্রাজক অবশেষে চতুর্থতীর্থে প্রবেশ করিলেন। এটীর নাম আত্মা-তীর্থ। এখানে কেবল সুশীতল সমীরণ নয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সুমিষ্ট পুষ্পসৌরভ হৃদয় মন প্রাণকে আমোদিত

করিতেছে। তীর্থ ভ্রমণের ক্লেশ দূর হইবে, এই আশা করিয়া তিনি আত্মতীর্থে শান্তভাবে একটী মনোহর বিজন স্থানে বসিলেন। দেহরাজ্যে কর্ম্মের গোলমাল; এখান হইতে তাহা বহু দূরে। মন তীর্থে বুদ্ধির আন্দোলন এবং বহু বিচার ও বিবাদ। সেখানকার শব্দ দূরতা বশতঃ এখান হইতে অতি অল্প শোনা যায়, বিবাদ বিসম্বাদ রহিত যে হৃদয়তীর্থ, যেখানে কেবলই প্রেম, তাহাও নিতান্ত নিম্নে। এখানে তীর্থবাসী-দিগের দিব্য চক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছে, যাঁহারা এখানে বাস করিব বলিয়া স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট সেই প্রাচীন কথা নূতন অর্থ ধারণ করিয়াছে। কোন্ প্রাচীন কথা? মায়া। তাঁহারা শুনিয়াছিলেন এ জগতে সকলই মায়া। অন্ন মায়া, জল মায়া, বায়ু মায়া, ধনসম্পত্তি সকলই মায়া, এই পর্য্যন্ত বলিয়া মায়াবাদীরা নিরস্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু মায়ার রাজ্য আরও বিস্তৃত।

সংসার তো মায়া, জল অগ্নি তো মায়া, ঈশা মুসার যে প্রভেদ তাহাও মায়া; শ্রীগৌরাঙ্গ ও গৌতম, কবির ও নানকের যে প্রভেদ তাহাও মায়া। একজন ধনী, একজন দরিদ্র, এ সব কল্পনা। কেহ ধনী নহে, কেহ দরিদ্র নহে। ইহার লক্ষ টাকা আছে, ইহার এক পয়সা আছে, ইহাও মায়ার খেলা। লক্ষ টাকা আন, জ্ঞানীরা উহাকে তৃণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া দিবেন। যাহাকে রজ্জু মনে কর, তাহা সর্প হইতে পারে, যাহাকে সর্প বল, তাহা রজ্জু হইতে পারে।

যাহাকে বলিতেছ টাকা, তাহা মাটি হইতে পারে, যাহাকে মাটি বলিতেছ, তাহা টাকা হইতে পারে। পৃথিবীতে রাজপ্রাসাদে বাস, ধনীর ঐশ্বর্য্য, সকলই মায়ার কথা। বৃক্ষতলে যে বসিয়া থাকে আর রাজপ্রাসাদে যে বাস করে, দুইয়ের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা মায়ার ব্যাপার। যে বৃক্ষতলে থাকে, সে সুখী হইতে পারে, যে রাজপ্রাসাদে বাস করে, সে হয় তো দুঃখের আগুনে জ্বলিতেছে। তবে এই যে ধনশীলতা ও দারিদ্র্য, ধনাঢ্য হওয়া ও পথের কাঙ্গালী ও ভিখারী হওয়া, এ কেবল মায়া। সুশোভন শরীর সোণার অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, এ সব মায়ার খেলা। এই আছে, এই নাই; ধন মান এই আছে, এই নাই।

এই সকল যদি মায়া হইল, তবে হিন্দু মুসলমানে, শাক্ত বৈষ্ণবে, দণ্ডী গৃহীতে যে প্রভেদ, তাহাও মায়া না হইবে কেন? কেন আর বল, বেদবাদী; পুরাণবাদী; বিষ্ণুবাদী; শক্তিবাদী; ইনি শক্তির উপাসক, উনি ভক্তির উপাসক। যিনি ঈশা তিনি মুসা; অভেদশাস্ত্র শ্রবণ কর। ক্রিয়াতে হিন্দু, হিন্দু; ক্রিয়াতে যবন, যবন। হিন্দু মুসলমানে, খ্রীষ্টবাদী ও মহম্মদবাদীতে অনেক মতভেদ, মনে হয় কিছুতে মিল হইবে না। যতক্ষণ চক্ষু কর্ণ দেখিবে, শুনিবে, কর্ম্মকাণ্ড লইয়া থাকিবে, হস্ত পদ ধরিবে ও চলিবে, ততক্ষণ প্রভেদ থাকিবেই থাকিবে। উপরে উঠ, দ্বিতীয় তলে বুদ্ধির ঘরে যাও, তখনও ভেদাভেদ জ্ঞান। যতক্ষণ বুদ্ধির তর্ক ও

বিচার আছে, ততক্ষণ ভেদজ্ঞান যাইবে না। তৃতীয় তলে উঠ, সেখানে ঐ কোলাহল ক্রমে শান্ত হইতেছে। চতুর্থ তলে উঠ, সেখানে সকলই নিস্তব্ধ, কেবল অভেদজ্ঞান।

যে হিন্দু, সেই খ্রীষ্টবাদী ; যে কৃষ্ণ ধর্ম্ম, সেই খ্রীষ্টধর্ম্ম ; যে শঙ্করাচার্য্য, সেই যাজ্ঞবল্ক্য ; যে বেদ, সেই পুরাণ ; যে পূর্ব্ব, সেই পশ্চিম ; যে স্বদেশী লোক, সেই বিদেশী লোক ; যে বিদেশী, সেই স্বদেশী। কর্ম্মকাণ্ডে ভিন্নতা। তাই এ ধর্ম্মে যে ধার্ম্মিক, সে ও ধর্ম্মে ধার্ম্মিক নহে। যেমন রঙের ভিন্নতা, তেমনি বর্ণের ভিন্নতা, তেমনি সাম্প্রদায়িক ভিন্নতা, সকলই অসার। যেমন বর্ণেতে কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ, তেমনই জানিবে, কাহারও কাল বুদ্ধি, কাহারও শ্বেত বুদ্ধি। বর্ণের ভিন্নতা কে মানে ? অসার মতের প্রভেদ কে মানে ? সূক্ষ্মদর্শী লোকে বলে কৃষ্ণ খ্রীষ্ট, বেদ পুরাণ, এ সমুদয় বিভিন্নতার নিম্নে ঐক্য আছে।

সমস্ত তীর্থ অতিক্রম করিয়া যখন আত্মা সমাধির অবস্থায় ডুবিল, ওঁকার ধরিয়া ব্রহ্মে বাণ নিক্ষেপ করিল, ব্রহ্মেতে আত্মা প্রবিষ্ট হইল, তখন অভেদ জ্ঞান। সকল দিকে তখন ব্রহ্মদর্শন ; সেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম, সেই ভক্তি, সেই প্রেম, তখন চারিদিকে অভেদ ভাবে বিস্তৃত রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। স্থূল জ্ঞান হৃদয়ে কমিল, আত্মাতে একেবারে বিলুপ্ত হইল। যোগাসনে বসিয়া যদি দেখ দেখিবে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে মূলগত বিবাদ নাই ; বেদ পুরাণে বিবাদ নাই, খ্রীষ্ট বিধানের

সহিত হিন্দু ধর্ম্মের বিবাদ নাই। আত্মা রাজ্যে যাঁহারা বাস করেন, বিবাদের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা বলেন, কি আশ্চর্য্য? ঈশার সঙ্গে গৌরাঙ্গের বিবাদ? কিসে কিসে বিবাদ হয়? অভেদ যেখানে, সেখানে কিরূপে বিবাদ হইবে? সমুদয় সত্যই এক।

নববিধানরূপ নূতন শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন, ভেদবুদ্ধি অসার। পুরাতন শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন, ব্রহ্ম আর পৃথিবী অভেদ, সকল ভেদজ্ঞানই মায়া; তেমনই নূতন শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন, সমুদয় সাম্প্রদায়িক ভেদজ্ঞান মায়ার খেলা। ব্রহ্ম যেমন অদ্বিতীয়, ধর্ম্মও অদ্বিতীয়, এবং শাস্ত্র তন্ত্র সাধু মহাত্মাও অদ্বিতীয়। সমুদয় ঋষিতে অভেদ, প্রেরিতে প্রেরিতে অভেদ, মহাপুরুষে মহাপুরুষে অভেদ; ইহাঁদের মধ্যে বিরোধ নাই, সংগ্রাম নাই, পৃথিবীতে দেশ বিশেষে ঋষি প্রেমিক মুনি যোগী সংখ্যায় অনেক, কিন্তু সমুদয় অভেদ ও এক। সমুদয় বেদ বেদান্ত এক শাস্ত্র, এক ভিন্ন আর দ্বিতীয় নাই। ধর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছি, "একমেবাদ্বিতীয়ং" বলিয়া, এবং চির-দিন সাধন করিব "একমেবাদ্বিতীয়ং" বলিয়া। কর্ম্মকাণ্ডের ভিতর থাকাতে মায়ার জন্য ভেদজ্ঞান ছিল; এখন সকলে এক হও। ভেদদৃষ্টি করিব না, ভেদসৃষ্টি করিব না, ভেদ-বুদ্ধির পথে চলিব না। তিন তীর্থ অতিক্রম করিয়া চতুর্থ তীর্থে যাইবই যাইব; এবং ঈশ্বরপ্রসাদে নিশ্চয়ই তথায় মোক্ষ ও শান্তি লাভ করিব।

হে দয়াসিন্ধু, হে করুণাময়, কল্পনার অতীত তুমি, ভেদাভেদের অতীত তুমি, তোমার চরণ ধরিয়া কাঁদিতেছি। পৃথিবীর অনেক বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছ, এখন এই মিনতি করি, ধর্ম্মরাজ্যে শান্তির পথ দেখাইয়া দাও। নৌকা ডুবিতেছে; পাপে পরিপূর্ণ; দুষ্প্রবৃত্তি-বায়ুতে আন্দোলিত হইয়া জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে। এ সময় তোমায় ডাকিতেছি, হরি, কোথায় রহিলে? এ যে মতের তরঙ্গে মারা যাই, এ সময়ে তুমি রক্ষা কর। অনেক লোকে সাম্প্রদায়িক তর্কে মরিতেছে। এই জন্য ঠাকুর, কাঙ্গালদিগের পরিত্রাণের জন্য তোমায় জানাইতেছি, সকল প্রকার ভ্রান্তি ও ভেদ বুদ্ধি হইতে রক্ষা কর। দেহতীর্থে কর্ম্মকাণ্ড, মনতীর্থে জ্ঞানকাণ্ড, হৃদয়তীর্থে কোলাহল শান্তি ও নিবৃত্তির আরম্ভ। কিন্তু আত্মা তীর্থে যোগী ভিন্ন আর কেহই তো শান্তি লাভ করিতে পারে না। সকল তীর্থ দেখা হইল, শান্তি কোথাও পাওয়া গেল না। না বৃন্দাবনে, না কাশীতে, না গয়াতে। শাক্য যখন বিবাদ করেন শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে, পৃথিবীতে তখন শান্তি পাইব না। শান্তি পাইব পৃথিবীর অতীত স্থানে, আত্মাতে; যেখানে কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ড কিছুই নাই, যেখানে কেবলই যোগ। দেখিব সেখানে এক সাধুকে অপর সাধুর বক্ষে। দেখিব সকল মনুষ্য এক জাতীয়। দিব্য চক্ষু দাও, হে ঈশ্বর, অভেদ দর্শন করিয়া চরিতার্থ হই।

দয়াময়, ব্রাহ্মদের মধ্যেও নানা গোলযোগ নানা বিবাদ

হইয়াছে। ইচ্ছা হয় তোমাকে লইয়া এমন কোন নিভৃত স্থানে বসি, যেখানে কোন গোল নাই, বাগ্‌বিতণ্ডা নাই, কোন ভেদাভেদ নাই। শুনিয়াছি, জগন্নাথের নিকটে থাকিলে সমুদ্রের শব্দ শোনা যায় না। হে কৃপাসিন্ধু, হে জগৎপতি জগন্নাথ, আত্মা তীর্থে যখন বসিব, সমাধিমন্দিরে বসিয়া যখন তোমার মুখশ্রী দেখিব, তখন প্রেমেতে যোগেতে সব একাকার হইয়া যাইবে। দুরন্ত বিচারসমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গের শব্দ শোনা যাইবে না। একেবারে শান্তিরাজ্য প্রচার কর, মা। বহুকাল হইতে ধর্ম্মের নামে, তোমার নামে, নানাপ্রকার অশান্তি প্রচারিত হইতেছে। বারণ করিতে পার কেবল তুমি, হে জগজ্জননি, তুমিই কেবল এ সকল বারণ করিতে পার। মাতঃ, কৃপা করিয়া শান্তিরাজ্য প্রচার কর। সকল ধর্ম্ম এক হউক, সকল প্রকার গৃহবিচ্ছেদ চলিয়া যাউক। সকল সম্প্রদায় একবার হরিচরণতলে নৃত্য করুক। বুঝি এ আশা দুরাশা! লোকে বলে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে এত কলহ বিবাদ ইহা কি যায়?

দয়াময়, দেহে, বুদ্ধিতে, কার্য্যে যদিও ভেদাভেদ ও বিবাদ থাকে, যেন যোগেতে সকলে অভেদ দর্শন করিতে পারে। যোগে সকল এক কর। যোগেশ্বর, তোমাকে সকলের মধ্যে দর্শন করি, তোমাতে অপর সকলকে অবলোকন করি। দেখি "মিশে নদী জলধিতে হয় একাকার।" আমি তোমাতে, জগৎ শুদ্ধ তোমাতে। এই অভেদ জ্ঞানে জ্ঞানী হইব।

আমরা পুলকিত হইয়া বলিব, ভেদাভেদ নাই; জাতীয় বিজাতীয় নাই; কলহ বিবাদ নাই; শান্তি হইল, শান্তি হইল, যুদ্ধক্ষেত্র বন্ধ হইল। হে দয়াময়, কবে এ কথা পৃথিবী বলিবে? কবে আনন্দে সবাই মিলিয়া নৃত্য করিব? আশার কথা শুনিয়াছি। নূতন শঙ্করাচার্য্য শ্রীনববিধান সার অভেদ-তত্ত্ব প্রচার করিবেন। ইহাঁকে ক্ষমতা দাও, প্রভুত্ব দাও। ইনিই সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় করিবেন; সকল সাধুকে এক করিবেন। মা কল্যাণদায়িনি, তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক। সর্ব্বদেবময় হরি যে তুমি, তোমার চরণতলে আমরা এক হইয়া বসিব। আমাদিগের এক শাস্ত্র, এক জাতি, এক হরি তুমি। শ্রীহরি, সর্ব্বদেবময় হরি, হরিনাম রসে মাতিয়া সকলকে আলিঙ্গন করিব। ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া তোমার চারিদিকে সবাই মিলিয়া নৃত্য করিব। হে রূপাময়ি, আত্মার ভিতরে সকলে যেন এক হইয়া যাইতে পারি, পুণ্য ও আনন্দে যেন উন্মত্ত হইতে পারি, দেবি, দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

ঈশ্বরের ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি।

রবিবার ৮ই কার্ত্তিক, ১৮০৩ শক; ২৩শে অক্টোবর ১৮৮১।

ঈশ্বরের বাহ্যিক লক্ষণ ও লীলা বিভিন্ন ভাব ধারণ করে, কিন্তু যিনি অনন্ত, তিনি সদা অপরিবর্ত্তনীয় থাকেন।

অনন্ত অপরিবর্ত্তনীয় থাকিয়াও তাঁহার ক্রিয়া অনুষ্ঠান এবং লীলাকে সর্ব্বতোভাবে বিচিত্র করেন। তাঁহার স্বরূপ এবং আখ্যা এক থাকিয়াও ভিন্নতা দেখায়। যদিও অনন্তের ভিতরে ব্রহ্মপ্রকৃতি আছে, সময়ে তাহা প্রকাশ পায়, এ জন্য অনেক পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্ম যিনি তিনি নির্গুণ, অটল, অচল, অপরিবর্ত্তনীয়। তাঁহাতে দিবা নাই, রাত্রি নাই, বর্ষা নাই, বসন্ত নাই; যৌবন নাই, বার্দ্ধক্য নাই, পুরুষের ভাব নাই, স্ত্রীর ভাব নাই; তিনি এক ছিলেন, এক আছেন, এক থাকিবেন। অনন্তে বিকার নাই, অনন্তের এক স্বভাব। তাঁহার বাহিরের লক্ষণের দিকে ফিরিলে তাঁহার কার্য্য প্রকারান্তর হইবে, বর্ণের পরিবর্ত্তন হইবে, ভিন্নতা হইবে, ভাবান্তর হইবে। এ সকল বাহিরে হয়।

দেখ এই কয়েক দিন পূর্ব্বে বঙ্গবাসীগণ দুর্গাকে নমস্কার করিল, পূজা করিল। তাঁহার সুন্দর মূর্ত্তি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিল, প্রাণকে মোহিত করিল, তাঁহার রূপে হিন্দুর ঘর আলোকিত হইল, তাঁহার কাছে বসিয়া তাহার চিত্তের ভাবান্তর হইল। সকলে প্রণত হইয়া তাঁহাকে অঞ্জলি দিল। কিন্তু অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সিংহবাহিনীকে অন্য বর্ণে রঞ্জিত করিয়া সকলে পূজা করিতে লাগিল। এমন সুন্দরবর্ণ কৃষ্ণ-বর্ণে পরিবর্ত্তিত হইল! লোকে সুন্দরী দেবীকে পরিবর্জ্জন করিয়া কালী দেবীর পূজা করিতে গেল কেন? কি সেই রুচি যে রুচি দুর্গাকে ছাড়িয়া কালীপদে ভূমিষ্ঠ হয়। এই

পরিবর্ত্তনের মধ্যে অবশ্য কোন নিগূঢ় অর্থ আছে তাহা বুঝা আবশ্যক।

মানুষ দুর্গাকে ছাড়িয়া কালীর নিকটে গমন করিল কেন? দুর্গাদাস আপনাকে কালিদাস কেন বলিল? মানুষের প্রকৃতি, মানুষের স্বভাব ও মতি যাঁহারা জানেন, তাঁহারা এ পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারেন, বুঝাইতে পারেন। দেবীপ্রকৃতি একই। যিনি দুর্গা তিনি কালী। শক্তি এক। যিনি পূজা করিলেন, তিনি দুয়েতেই শক্তি দেখিলেন। কিন্তু যাঁহাতে এত আকর্ষণ ছিল, যাঁহাকে দেখিলে মন মোহিত হইত, তাঁহার রূপান্তর দেখিয়া ভয় হয় কেন? আনন্দ হয়, ভয় হয়, এ দুই ভাব কোথা হইতে আসিল? এ দুই মনেতেই আছে। কেবল মনের ভাব দেবীকে দুই বর্ণে প্রতিফলিত করিল। যখন ভালবাসাকে লইয়া পূজা নমস্কার করিলে, আশ্রয় গ্রহণ করিলে, অভয়াকে ভক্তি দান করিলে, তখন এক বর্ণ বিশ্বাসী নয়ন দর্শন করিল; কিন্তু যখন ভয়ে ভীত হইয়া দেবীকে দেখিতে প্রবৃত্ত হইল, সে সময় সেই নয়নই অনন্তকালের ভিতরে ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি বিরাজমানা দেখিতে পাইল।

ভাবে সাদা কাল হয়। দুর্গার সোণার রূপ ছিল, ভয় দুর্গাকে কাল করিল। শক্তি একই রহিল, কিন্তু দর্শনভেদে দেবীর ভাব বাহিরে ভিন্ন হইল। প্রকাণ্ড এক শক্তি, তাঁহার এক পার্শ্বে লক্ষ্মীশ্রী, এক পার্শ্বে জ্ঞান বিদ্যা সরস্বতী। এক পার্শ্বে সুন্দর বীর সন্তান, অপর দিকে মঙ্গল ও বিঘ্নহরণ।

দেখিতে দেখিতে চারি মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান হইল, না আছে সখী, না আছে সন্ততি। এক ভয়ঙ্করা করালবদনা বাহির হইল। সে শ্রী নাই, সে রূপ নাই, সে প্রেম নাই, সে স্নেহ নাই, সে আমোদ নাই, সে উল্লাস নাই, এমন কাল যে ঘরে আলোক না থাকিলে অন্ধকার মধ্যে এ দেবীকে অন্বেষণ করিয়া বাহির করা কঠিন। অন্ধকারে অন্ধকার মিশাইয়া গিয়া ক্রমে এক হইয়া গেল। যিনি দুর্গা ছিলেন, যিনি সখী ও সন্তানদ্বয় লইয়া দেখা দিয়াছিলেন, তিনিই রূপান্তর হইয়া গেলেন। আবার যখন ইচ্ছা প্রবল হইবে, তখন পুনরায় তাঁহাকে উপাসক দেখিতে পাইবেন। এখন সে মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়া আর এক মূর্ত্তি উপস্থিত। ইহাঁর গলায় মুণ্ডমালা, হাতে খড়্গ, একটা বিকটাকার ভয়ানক মূর্ত্তি, দেখিয়া মনুষ্যের হৃদয় কম্পিত হয়।

যে মূর্ত্তি দেখিয়া পূর্ব্বে ভক্তি উদ্দীপ্ত হইয়াছে, মন মুগ্ধ হইয়াছে, সেই মূর্ত্তির পরিবর্ত্তন দেখিয়া এখন ভয় উপস্থিত। এ মূর্ত্তি কোথায় দেখিবে, ভক্তিপূর্ব্বক শুন। একবার হৃদয়ের মধ্যে যাও, সেখানে খুঁজিলে এ মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। ভিতরে আলোক নাই, অন্ধকার তোমাকে পরিবেষ্টন করিবে। অনন্ত আকাশ কাল, সেই অনন্ত আকাশে বিলীন এই শক্তি। এখানে অন্ধকারে অন্ধকারে এক, নিরাকারে সকলই একাকার হইয়া গিয়াছে। আকাশ ও অন্ধকারে কিছুই প্রভেদ করা যায় না। সেই ঘন কাল আকাশের ভিতরে, অন্ধকারের

ভিতরে, ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মজ্ঞান। বাহিরে তাঁহারই কালীমূর্ত্তি, দেবী বাহিরে, অন্তরে ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মজ্ঞান। হৃদয়ে সময়ে সময়ে বিশ্বাসনয়নে অন্ধকার, নির্ব্বাণ ও আকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। যখন হৃদয় পাপে আচ্ছন্ন হয়, তখন কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই অশান্তির সময়ে মনে বড় ভয় উপস্থিত হয়। সেই ভয়ের মধ্য হইতে ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি বাহির হইয়া জীবগণকে কম্পিত করে।

সেই ভীষণরূপা দেবী অনন্তকালরূপঅস্ত্র ধারণ করিয়া জীবগণের মস্তক ছেদন করেন। এই কাল অস্ত্রের আঘাতে কত মুণ্ড উচ্ছিন্ন হইল, কত বংশ বিলুপ্ত হইল। কাল অস্ত্র ধারণ করিয়া যিনি ছেদন করেন তিনি কালী। সেই কালীকেই সকলে মা বলে। কাল যাহাদিগকে মারিল, তাহাদিগের ছিন্ন মস্তক লইয়া মুণ্ডমালা করিয়া কালীর গলায় পরাইয়া দিল। কি জন্য? জীবকে ভীত করিবার জন্য। শক্তির এরূপ মূর্ত্তির অভিপ্রায় এই, জীবকে ভীত করিয়া পরলোকের সম্বল করিয়া দেওয়া। ভীত না হইলে জীবের অর্দ্ধ অংশ পাপে ডুবিয়া যায়, কিছুতেই উন্নত হইতে পারে না। তুমি বলিতেছ, কই কোথাও ভয় নাই। প্রেমের চন্দ্র আকাশে উদিত, ভয়ের কারণ কোথায়? ভয়ের বস্তু কি কিছুই নাই? ঈশ্বর রাজা ইহা মান? ঈশ্বর রাজা হইয়া দণ্ড দেন, পাপীর বিচার করেন, শাস্তি বিধান করেন, শাস্তি দিয়া পাপীর পাপ নিবৃত্ত করেন।

শক্তির এক মূর্ত্তি অতি মনোহরা, আর এক মূর্ত্তি ভয়ঙ্করা। সমস্ত পৃথিবীর অনিত্য বস্তু এই ভীষণমূর্ত্তি দেবীর তীক্ষ্ণ অস্ত্র সংহার করিতেছে। এই অস্ত্র কত মুণ্ড ছেদন করিতেছে অন্ত নাই। কাটা মুণ্ডের মালা পরিয়া ভয়ানক হইয়াছে, ছিন্ন মস্তকে ঘোরাল হইয়াছে। জীব অসার অনিত্য সংসারে মত্ত হইয়া আছে, প্রতিদিন অনন্তকালরূপ তীক্ষ্ণ অসি সুখ সম্পত্তি ধন ঐশ্বর্য্য বিনাশ করিতেছে, সংসারের অনিত্যতা বুঝাইয়া দিতেছে। দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতীকে লইয়া জ্ঞান দেন, সম্পদ দেন। তোমার আমার মা হইয়া ঘরে লক্ষ্মী শ্রী আনিয়া দেন। মা কেবলই ভালবাসেন. এইরূপ আলোচনা করিয়া মাকে ছাড়িয়া অনিত্য সম্পদের উপরে লোকে প্রেম স্থাপন করে; সংসারের বিষয়সুখের উপর মায়া স্থাপন করে।

ব্রহ্মশক্তি দুর্গা হইয়া সমুদয় সংসারে মঙ্গল কল্যাণ বিস্তার করিতেছেন। মঙ্গল ও কল্যাণ আর দুর্গা এক। যিনি সরস্বতী তিনিই জ্ঞান বুদ্ধি, যিনি লক্ষ্মী তিনিই শ্রী সম্পত্তি। যাই লোকে দুর্গাকে ভুলিয়া গিয়া পাপে মজিল, সুবুদ্ধি ছাড়িয়া কুবুদ্ধি অনুসরণ করিল, লক্ষ্মীকে ছাড়িয়া অলক্ষ্মীর শরণাপন্ন হইল, তৎক্ষণাৎ মহাদেবী কালী উপস্থিত হইলেন, তাঁহার নয়ন ঘুরিতে লাগিল, বিশাল খড়্গ উত্তোলিত হইল, করাল বদন প্রকাশিত হইল। তাঁহার ভয়ানক মূর্ত্তি দেখিয়া, শাণিত অস্ত্র দেখিয়া হৃৎকম্প উপস্থিত। আজ

চারিদিকে ঘোর অন্ধকার, এই অন্ধকারের মধ্যে মুণ্ডমালার ভয়ঙ্কর প্রকাশ। যেমন আপনি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, তেমনি ঘোর অমাবস্যা তাঁহার পূজার সময়।

বাহিরে ভয়ানক অন্ধকার। সেই বাহ্যিক অন্ধকারের মধ্যে ঘোর ঘটা করিয়া সকলে কালীপূজা আরম্ভ করিয়াছে। কালীর কৃষ্ণবর্ণে অন্ধকার যেন আরও ঘনীভূত হইয়াছে। কাল সময়ে কাল দেবী আমাদের কাল হৃদয়ের ভিতরে স্বর্গ হইতে অবতরণ করিলেন। কাল কাল কাল, সমুদয়ই কৃষ্ণ-বর্ণ। সকলই কালতে মিশ্রিত, যেন ভাল কিছুই নাই। মন পাপে কাল হইয়াছে, অবাধ্য হইয়াছে, হৃদয় কলুষিত হইয়াছে, এমন অবস্থায় কালী প্রকাশিত হইলেন। দেহ কম্পিত হইল, মন কম্পিত হইল। অমাবস্যাসময়ে শ্মশানের মধ্যে ছিন্ন মস্তক স্মরণ করিলে কার না ভয় হয়? দেখ, সম্মুখে ছিন্ন মস্তক হাতে লইয়া, মুণ্ডমালা গলায় পরিয়া খড়্গহস্তে দেবী প্রকাশিত হইলেন। পদতলে শম্ভু শবাকার হইয়া পড়িয়া আছেন।

জীব আপনার পাপ বুঝিতে পারে না, তাই তাহার পাপ বুঝাইয়া দিবার জন্য ব্রহ্মের শক্তি ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করিয়াছেন। এ সময় সুখের সময় নহে। যখন সুখের সময় ছিল, পৃথিবী চমৎকার জ্যোৎস্নায় আলোকিত ছিল, তখন লক্ষ্মীর সময় ছিল। সে সময়ের আলোক মলিন হয় না, ম্লান হয় না। চারিদিক দেখ আজ ঘোর অন্ধকারের

আবাস হইয়াছে। কাল রাত্রি আসিয়া উপস্থিত, আর জ্যোৎস্না নাই। সকলের মন প্রসন্ন ছিল, মুখ প্রফুল্ল ছিল, এখন ভয়ে ম্লান। সকলকে ঘোর অমাবস্যায় ঘেরিয়াছে। লক্ষ্মী যে শক্তি, কালীও সেই শক্তি, কিন্তু সেই সাদা মূর্ত্তি কাল হইল কেন? এ যে ব্রহ্মের রুদ্রমূর্ত্তি! অধর্ম্ম দেখিয়া ধর্ম্মরাজ কালীমূর্ত্তি প্রকাশিত করিলেন।

যেখানে পাপ সেখানে ভয় থাকিবে, সেখানে অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার দেখা দিবে। সেখানে ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া অপরাধীকে শাস্তি দিবে। জীব, মনে করিও না তোমার ঈশ্বর সর্ব্বদা তোমায় সুখ দিবেন, তোমার হৃদয়াকাশে সর্ব্বদা চাঁদ বিরাজ করিবে, তুমি একবারও অমাবস্যা দেখিবে না। স্মরণ কর, আকাশে পূর্ণিমার চন্দ্র চিরদিন থাকে না, একদিন অমাবস্যা আসিয়া সমুদয় অন্ধকারে আচ্ছাদন করিয়া ফেলে। যে দেশে দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতীর প্রতি ভক্তি, সেই বঙ্গদেশেই কালীমূর্ত্তির অর্চ্চনা। দুর্গার মুখ দেখিয়াছ বলিয়া কদাপি কালীর মুখ ভুলিও না। কালীমূর্ত্তি যেন সর্ব্বদা পাপহৃদয়কে কম্পিত করে।

যিনি বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, তাঁহারই ভিতরে দুর্গাও আছেন, কালীও আছেন। যিনি অনন্ত মঙ্গলময় ব্রহ্ম, তাঁহারই মধ্যে সেই রুদ্রমূর্ত্তি "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্"। সেই ব্রহ্মই এই প্রকাণ্ড মূর্ত্তি প্রকাশিত করিলেন, যাহা দেখিবা মাত্র ভয় উপস্থিত হয়। এ মূর্ত্তি এমনি যে সাধুকেও ভীত

করিতে পারে। ভাবুক হিন্দুহৃদয় এই মূর্ত্তিকে বাহিরে কালী-রূপে সংস্থাপন করিল। কালের ঘোর কাল রং দিয়া অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারের সঙ্গে উহাকে মিশ্রিত করিল। হিন্দুর উদ্ভাবিত এই মূর্ত্তিকে জ্ঞানচক্ষে অবলোকন কর। দেখিবে এই মূর্ত্তি শাস্তি দিবার জন্য অবতীর্ণ। আমাদিগের মধ্যে ভক্তি শীঘ্র আসিতে পারে না, কিন্তু ভয় শীঘ্র আসিতে পারে। পাপের বিষয় চিন্তা করিলে আমোদ হয় না, সুখ হয় না। এ জন্য ঈশ্বরের মাতৃমূর্ত্তি দেখিতে ইচ্ছা হয়, এবং সেই মার মূর্ত্তির ভিতরে সুবর্ণ প্রতিমা দেখিতে বাসনা হয়, অন্ধকারময় দেবীকে মনে স্থান দিতে প্রবৃত্তি হয় না।

অন্ধকারের ভিতরে অন্ধকারবর্ণা দেবী অতি শীঘ্র দেখা যায় না। অন্ধকারের ভিতর হইতে দেবীকে যত টানিবে, তত তিনি অন্ধকারের ভিতরে মিশিয়া যাইবেন। হে সাধক, আরও চিন্তা কর, আরও স্মরণ কর, দেখিবে অন্ধকারের ভিতরে দেবী দেখা সহজ নহে; অন্ধকার অন্ধকার মূর্ত্তিকে আপনার ভিতরে টানিয়া লয়। কৃষ্ণবর্ণা দেবীকে কেহই অন্ধকার হইতে সমুৎপন্ন করিতে পারে না। মনে করিলে ঈশ্বর কেবল সেই দেবীকে প্রকাশ করিতে পারেন। ঈশ্বর যখন এই ঘোরা ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি প্রকাশিত করেন, তখন উহা দেখিয়া পাপী ভয়ে ভীত হয়।

পাপ ছাড়িতেই হইবে। পাপের উপরে সুতীক্ষ্ণ খড়্গ পড়িবে। কালীর সুতীক্ষ্ণ খড়্গ অসুরকে বিনাশ করিবে।

সেই মূর্ত্তি হৃদয়ে স্মরণ কর। ভয়ে ত্রস্ত হইয়া দেবী কালীকে হৃদয়ে দর্শন কর। অসার মৃত্তিকা লইয়া সে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিও না। অকপট হৃদয়ে ব্রহ্মের দিকে নিরীক্ষণ কর, পাপীর প্রতি তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। নয়নকে আরও স্থির করিয়া রাখ, দেখিবে তিনি শাণিত অস্ত্রে অসুর বধ করিতেছেন। যত নিরীক্ষণ করিবে, তত অসুরের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠুর ভাব তোমার নিকটে প্রকাশিত হইবে। ঘোর পাপ অমাবস্যায় আচ্ছন্ন হৃদয়ে সেই ঘোর কাল মূর্ত্তি প্রকাশিত, আর হাসিও না। এত কাল ছিলে ব্রহ্মদাস, তার পরে প্রেমে হইলে হরিদাস, এখন ভয়ের সময়ে আমাদিগকে কালিদাস হইতে হইবে।

যখন যে ভাব, তখন সেই ভাবে ধর্ম্ম সাধন করিবে। প্রকৃত ধর্ম্ম সময়োচিত ভাব আনিয়া উপস্থিত করে। তুমি এখন হরির ভাবে প্রমত্ত। হরিকে নমস্কার কর, বন্দনা কর, তাঁহার নাম কীর্ত্তন কর। তোমার জীবনে এখন বসন্তের সময়। এখন তুমি বসন্তোৎসব কর, হরিকে লইয়া প্রেমের মহোৎসব কর। হরির মর্য্যাদা রক্ষা কর, প্রেমে মত্ত হইয়া, হরিদাস হইয়া, প্রেমের গৌরব বৃদ্ধি কর। কিন্তু মনে করিও না, তুমি এখন হরিদাস আছ, হরিকে ভক্তি করিতেছ, তাঁহার পূজায় আনন্দিত হইতেছ, ইহা বলিয়া হরি তোমাকে কেবলই প্রেমে মাতাইবেন, কখন শাস্তা হইয়া তোমার নিকটে প্রকাশিত হইবেন না। আজ তুমি

মিথ্যা কথা বলিলে, অপরের অনিষ্ট করিলে, পরদ্রব্য অপহরণ করিলে, কাম্যাদি পরতন্ত্র হইয়া হৃদয়কে অপবিত্র করিলে, দেখিবে তোমার হরি তোমার নিকটে বিদায় লইতে চেষ্টা করিতেছেন, আর ভাবিয়া চেষ্টা করিয়া কেবল ভক্তিসাধন করিতে পারিবে না। যত পার পাপ চাপা দাও, কিন্তু কিছুতেই আর উহা লুকাইয়া থাকিবে না।

শাক্ত না হইয়া ভক্ত হইয়াছি, এখন ভক্ত হইয়া শাক্ত হইব। হরিদাস হইয়া জীবন শেষ করিতে যত্ন করিব, সঙ্কীর্ত্তন করিব, হরিনাম করিব, কিন্তু সময়ে সময়ে শাক্ত হওয়া উচিত; শাক্ত না হইলে হৃদয়ের পবিত্রতা রক্ষা হয় না। কপট ভক্তিতে পাপ চাপা দিবার কৌশল করিলে কি হইবে? পাপ মহিষাসুর যখন হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, তখন উহা শান্তি ভঙ্গ করিবেই করিবে। ঈশ্বরনিয়মের গতিতে পাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভয় আসিয়া কালী-পদে তোমাকে অবনত করিবে। এ সময়ে তোমাকে রক্ষা-কালীর শরণাপন্ন হইতে হইবে, কালী কালী কালী কালী উচ্চারণ করিতে হইবে।

এখন ধর্ম্মের সুখ প্রাপ্ত হওয়া প্রেমে প্রমত্ত হওয়া অসম্ভব। পাপ করিবে অথচ প্রেমের সুখ কেন পাইবে? খোল করতাল বাজাইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিয়া পাপ ঢাকিবার চেষ্টা বৃথা। এখন মন শাক্ত, শক্তি চাই, বল চাই, অস্ত্র চাই। দেবীর বলে শক্তি পাইয়া পাপাসুরকে চূর্ণ করিব। তাই

বলি সকলে ব্রহ্মের রুদ্রমূর্ত্তির পদাশ্রিত হও, দেববলে স্বর্গীয় বলে বলী হইয়া পরাক্রম অবলম্বন করিয়া মার মার শব্দে পাপ চূর্ণ কর। অমাবস্যা শেষ হইলে আবার আলোকের সমাগম হইবে, পূর্ণলক্ষ্মীর উদয় হইবে।

দেবীপূজার সময় আছে, হরিপূজার সময় আছে। সময় অবস্থা ও ভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এক এক সময়ে এক এক পূজা করিতে হইবে। বঙ্গবাসীদের মত বাহিরে মাটির পুতুল গড়িও না, যখনই দেবীর পূজা করিবে, আধ্যাত্মিক দেবীর পূজা করিবে। বিবেকের অস্ত্র ধরিয়া বিশ্বাসের খড়্গ লইয়া পাপ অসুরকে মার, ঐ তীক্ষ্ণ অস্ত্র পাপাসুরের গলায় পড়িবে। যখনই পাপ হইবে, ভয়ের সহিত ঈশ্বরের কাছে যাও, ভয়ে ভজন সাধন কর। ভয়ে অসুর বধ করিয়া নির্ভয় হও। মার অভয়পদে আশ্রয় লইয়া রামপ্রসাদের শক্তি ভক্তি লাভ কর, শক্তি ও ভক্তি এক করিয়া নতন প্রকারের ধর্ম্মে মনকে মোহিত কর। হে নববিধানবাদী ব্রাহ্ম, নিরাকারা মহাকালীর রূপ স্মরণ কর, দেবীপদে পূজা উপহার অর্পণ কর, অভয়পদ প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা কর, নববিধানের এই মন্ত্র, এই তন্ত্র, এই শাস্ত্র।

অভ্রান্তবাদ।

রবিবার ১৫ই কার্ত্তিক ১৮০৩ শক; ৩০শে অক্টোবর ১৮৮১।

ঈশ্বরকে যাহারা না মানে ব্রহ্মমন্দির তাহাদিগকে নাস্তিক বলিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাস্তিক কে, উত্তর দেওয়া চাই। যাহাদিগের শাস্ত্রে অবিশ্বাস আছে, তাহারা নাস্তিক, আমরা এখানেই শুনিয়াছি। এই দুই শ্রেণী ছাড়া আর সকলকে আস্তিক বলিতে পারা যায়। একটু ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায়, শাস্ত্র মানিলাম বটে, কিন্তু শাস্ত্র মানিয়াও উহাকে ভ্রান্ত বলিলাম, উহা সম্পূর্ণ অভ্রান্ত হইল না। ঈশ্বর মানিলাম, শাস্ত্র মানিলাম, তথাপি বিশ্বাসীর রাজ্যে পরিগণিত হইলাম না, কেন না শাস্ত্র অভ্রান্ত বলি নাই বলিয়া সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই। অভ্রান্ত ঈশ্বর, অভ্রান্ত শাস্ত্র। ঈশ্বর প্রকাশিত শাস্ত্র, ঈশ্বর প্রকাশিত জ্ঞান, ঈশ্বর প্রকাশিত যে বুদ্ধি তাহা অভ্রান্ত, ইহা না মানিলে পূর্ণ বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাসীগণের মধ্যে কখন পরিগণিত হইতে পার না, যদি এই অভ্রান্ত মত গ্রহণ না কর।

এমন সম্প্রদায় আছে, এমন লোক আছে, যাহারা ঈশ্বর মানিল, শাস্ত্র মানিল, ব্যক্তিবিশেষে মনুষ্যবিশেষে অভ্রান্তি স্বীকার করিল। কি মানুষ অভ্রান্ত? কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! এই বলিয়া কতকগুলি লোক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। তাঁহারা এ পথ ছাড়িয়া অন্য পথে চলি-

লেন। মানুষ ভ্রান্ত এই কথা স্বীকার করিয়া তাঁহারা বিনয়ের মুকুট পরিধান করিয়া গৌরবান্বিত হইলেন। ছি! ছি! মানুষ অভ্রান্ত এ কথা কোন মূর্খে বলে! ইহাতে ঈশ্বরের অপমান, শাস্ত্রের অপমান। মনুষ্য পাপী, কিছুই তাহার স্থির নাই, সর্ব্বদা তাহার বুদ্ধি আন্দোলিত, তরঙ্গে পরিচালিত, পরিমাণে কীট, সেই মানুষ অভ্রান্ত? একটী ক্ষুদ্র রেণুর তুল্য যে নয়, তাহাকে অভ্রান্ত বলিয়া নমস্কার করিব? এ যে ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের অবমাননা, এই বলিয়া পণ্ডিত এক দিকে চলিলেন, অভ্রান্তবাদী লজ্জায় অধোবদন হইয়া ক্ষুন্নহৃদয়ে অপর দিকে চলিলেন। জনসমাজে ভ্রান্তিবাদ স্বীকৃত হইল। ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মত বলিয়া আত্মপরিচয় দিল। ভ্রান্তিবাদ স্বর্গীয় মাননীয় পন্থা বলিয়া সকলে গ্রহণ করিল। যত ভ্রান্তি বলি, তত ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হই। আমি ভ্রান্ত যত বলি, তত অপর সকলে মহৎ বলে। ভ্রান্তি-বাদী এবং পৃথিবীর লোক এ দুয়ের মধ্যে পরামর্শ ছিল, সুতরাং পৃথিবীতে পরিষ্কাররূপে ভ্রান্তিবাদ সংস্কৃত বলিয়া, বিনয়ের ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইল। অভ্রান্তবাদ হইতে ভ্রান্তিবাদ উৎকৃষ্ট, দুইজনে ছাপাইয়া দিয়া প্রচার করিল। যদি আজ আমি ভ্রান্তিবাদ গ্রহণ করি, গৌরবের মুকুট পাইতে পারি।

তুমি স্বীকার করিলে তোমার বুদ্ধি ভ্রান্ত, তোমার চরিত্রে আজ যাহা হইতেছে সকলই ভ্রান্ত, কাল কি হইবে কিছুই

স্থিরতা নাই, আজ যাহা বিশ্বাস করিতেছ কাল তাহার বিপরীত বিশ্বাস করিতে পার। অতএব, তোমার সমুদয় জীবন ভ্রান্তিপূর্ণ। আমি গুরু বলিয়া তোমাকে কি প্রকারে প্রণাম করিব? তুমি বলিলে পৃথিবীতে এমন সাধু বা মহাত্মা কেহ জন্মেন নাই যাঁহার ভ্রান্তি ছিল না। সুতরাং সরল অন্তঃকরণে ভ্রান্তি প্রকাশ করা ইহাই ধর্ম্ম। এ সরলতা ছাড়িয়া ধর্ম্ম হয় না। যখন এইরূপ বিবাদ উপস্থিত, তখন এই প্রশ্ন উপস্থিত, ভ্রান্তিবাদী অভ্রান্তবাদী ইহার মধ্যে কে ভাল? যে ব্যক্তি অভ্রান্তবাদ স্বীকার করিল সে অহঙ্কারীর মধ্যে গণ্য হইল, আর যে ভ্রান্তিবাদ প্রকাশ করিল সে বিনয়ী বলিয়া প্রশংসিত হইল। এখন বল কে ভাল?

ব্রহ্মমন্দিরের বেদী এ বিষয়ে কি বলে শুন। মানুষ যদি আপনাকে ভ্রান্ত বলে সে লোকের কাছে যাইও না। সে ভয়ানক ব্যাঘ্র, তোমাকে দংশন করিবে, মারিয়া ফেলিবে, সে তোমাকে গ্রাস করিবার জন্য মুখ ব্যাদান করিয়া আছে, সাবধান হও। ভ্রান্তিবাদী যদি উপদেশ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হন, ভয়ে ভীত হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিবে। যে এত দূর আপনাকে ভ্রান্ত বলিয়া মনে করে, সর্ব্বদা আপনাকে ভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করে, কোন মত তাহার ঠিক নহে, সকল মতই ভ্রান্ত, এই কথা বলে, তখন জানিও সে বলে না, কিন্তু ঈশ্বর তাহার মুখ দিয়া সেই কথা বলান, ঈশ্বর সকলকে সাবধান করেন যে তাহার নিকটে না যাওয়া হয়।

ভ্রান্তিবাদের নিগূঢ় অর্থ এই, আমরা মনুষ্য, আমরাই সকল করি, ঈশ্বর আমাদিগের ভিতর দিয়া কিছু বলেন বা করেন ইহা আমরা বিশ্বাস করি না, আমরা তাঁহার কোন কথা শ্রবণ করি না। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদিগের কোন সম্বন্ধ নাই। ভ্রান্তিবাদী যখন এ কথা বলিতেছে, তখন তিলার্দ্ধ আর তাহার সম্মুখে বিলম্ব করিও না। এই কথা যখন তাহার মুখ দিয়া ঈশ্বর বলাইতেছেন তখন আমাদের কর্ত্তব্য কি তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না। আমরা যত শীঘ্র পারি পলায়ন করিয়া, এ বিপদের পথ হইতে আপনাদিগকে উদ্ধার করিব। এই কুমতের উচ্ছেদ জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দেওয়া উচিত। যাহারা এই মত প্রচার করে অথচ উপদেষ্টা হয়, এক অন্ধ যেমন অন্য অন্ধকে পথ প্রদর্শন করে, তাহারা তদ্রূপ। তাহাদের সংসর্গ চির পরিহার্য্য।

ইহার বিপরীত কথা ঠিক। এই যে ভ্রান্তিবাদ ইহাই সংশয়বাদ, অবিশ্বাস, নাস্তিকতা। ইহার বিপরীত অভ্রান্ত-বাদ। মানুষ অভ্রান্ত হইতে পারে। মানুষ অভ্রান্ত হইয়াছে, অভ্রান্ত হইবে। চিরকাল অভ্রান্ত আছে, অভ্রান্ত হইবে, এই নূতন বিধি পাঁচটীর একটী। ভ্রান্তিবাদে যদি বিশ্বাস কর তবে মরিলে, নববিধানের মস্তকে কুঠারাঘাত করিলে, উন্নতির পথে কণ্টক রোপণ করিলে। ভ্রান্ত গুরুকে গুরু বলিয়া কি প্রকারে গ্রহণ করিতে পারা যায়। যে লোক ঈশ্বরকে সত্য বলিয়া স্বীকার করে না, সাবধান, যেন তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ না

হয়। যে লোকের ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, তাহার সকল সময়ে মত পরিবর্ত্তন হইবে। এ ব্যক্তি হয় তো প্রথমে দুই ঘণ্টা ঈশ্বরের পূজা করিবে, অল্পে অল্পে তদ্বিষয়ে তাহার মত পরিবর্ত্তন হইয়া আসিবে। যাই পবিত্র হিমালয়ের উপরে যোগমন্দিরে প্রবেশ করিবে, যেখানে সর্ব্বদা নির্ম্মল বায়ু বহিতেছে, চতুর্দ্দিক জনশূন্য, অমনি বলিয়া উঠিবে ভ্রান্তিবাদী চলিয়া যাও। নববিধান বলিতেছেন ঈশ্বর এবং তাঁহার শাস্ত্র মানিতে হইবে, ঈশ্বর যেমন অভ্রান্ত তাঁহার শাস্ত্রও তেমনি অভ্রান্ত বিশ্বাস করিতে হইবে।

অভ্রান্ত শাস্ত্রের কথা যখন বলা হইতেছে তখন ইহাও বলা হইতেছে যে ভ্রম আছে। কোথায় ভ্রম আছে? পুস্তকে ভ্রম আছে, মানুষের মনে ভ্রম আছে। যদি ভ্রম আছে তবে অভ্রান্তবাদ কি প্রকারে হইল? অভ্রান্তবাদ আছে। মানুষ ভ্রান্ত এ কথা বলিয়া আসিয়াছি, মানুষ অভ্রান্ত এ কথাও বলিয়াছি। কোন বিষয়ে কি মানুষ অভ্রান্ত নয়? বল, তুমি কোন বিষয়ে অভ্রান্ত নও। আলোচনা কর, আলোচনা করিয়া বল, তোমার অভ্রান্তি নাই, কোন বিষয়ে নাই। অভ্রান্ত বলিলে পূর্ণ ঈশ্বরের অধিকার আরোপ করা হয় না; অভ্রান্তি বলিলে অনন্ত অভ্রান্তি বুঝায় না। তুমি প্রেমিকও বট, অপ্রেমিকও বট, ভক্তও বট, অভক্তও বট। তোমার জীবনে মিথ্যা আছে, দুচারিটী সত্যও আছে। সুতরাং তোমাতে ভ্রান্তিও বিদ্যমান, অভ্রান্তিও বিদ্যমান বলিব।

অনন্ত অভ্রান্তি কেবল ঈশ্বরেতে; মনুষ্যে উহা কখন সম্ভব নহে। মনুষ্যতে তো অনন্ত শক্তি নাই, অনন্তজ্ঞান নাই, অনন্ত প্রেম নাই। সেই জন্য বলিতেছি মানুষ ভ্রান্তও আছে, মানুষ অভ্রান্তও আছে।

কিছুই যদি অভ্রান্ত নয়, সকলই ভ্রান্তি, তবে ভারতে ধর্ম্মের জয় সত্যের জয় হইবে কি প্রকারে বলিতে পার? সমুদয় ভ্রান্তি বলিলে ব্রহ্মমন্দিরে আসা বন্ধ করিতে হয়। আমার এ উপদেশ ভ্রান্তি, ঈশ্বরতত্ত্ব ভ্রান্তি, আমরা তাঁহার আদেশ পাই তাহা ভ্রান্তি, পরলোক ভ্রান্তি। যোগ করিলে ভক্তি সাধন করিলে তাহার নীচে ভ্রান্তি রহিল, এক এক ব্রহ্মমন্দির স্থাপিত হইল, তাহার নীচে কত ভ্রান্তি গুপ্ত-ভাবে রহিল। এ যদি বল ধর্ম্মের মূল শিথিল হইল, ঈশ্বর-বিশ্বাস বিনষ্ট হইল। কোন দস্যু কোন নাস্তিক, যে ঈশ্বর মানে না সেই এই ঘোর অবিশ্বাস আনিয়া উপস্থিত করি-য়াছে। নাস্তিক অবিশ্বাসী দস্যু যত দূর দৃষ্টি করে কেবলই ভ্রান্তি দেখে। এদিকে ওদিকে কেবলই ভ্রান্তি। আমার মত, বুদ্ধি, রুচি, ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু এই স্থানে এই প্রাচীরের মধ্যে ব্রহ্ম আছেন, জ্ঞানময় হইয়া বিরাজ করিতে-ছেন, আমি ইহার জন্য মরিলেও সত্য বলিব। ঈশ্বর যদি প্রবঞ্চক হইলেন, ভ্রান্তি যদি সমুদায় বস্তু হইল, তবে আর তুমি আমি কোথায় রহিলাম? রবিবারে রবিবারে এখানে আসিয়া প্রয়োজন কি? যদি সমুদয় ভ্রান্তি হইল তবে ভ্রান্তি

সাধন করিয়া কি হইবে? উপাসনা, ধ্যান, আরাধনা সমুদয়ই ভুল। এ সমুদয় ভ্রান্তি প্রচার করিবার জন্য প্রচারব্রত অবলম্বন কেন করিব? ব্রহ্ম আছেন ইহা যদি ভ্রান্তি হইল অব্রাহ্ম কেন হইব না, ভ্রান্তির পথে কেন ঘুরিয়া মরিব? ঈশ্বরের দয়া অনন্ত ইহাও ভুল, সুতরাং উপাসনাও ভুল, সাধনও ভুল। এ সব কাপুরুষের কথা কিছুতেই শুনিতে পারি না।

যদি ভ্রান্তিবাদ থাকে ব্রাহ্মধর্ম্মে থাকুক, নববিধানে নিশ্চয় ভ্রান্তিবাদ থাকিতে পারে না। তুমি আছ, আমাদের সম্মুখে এই উপাসকমণ্ডলী আছে, আমাদিগের মধ্যে ঈশ্বর আছেন, ইহা নিশ্চয় বিশ্বাস করিব। তুমি আছ, আমি আছি, এই সমুদয় লোক আছে, অনন্তশক্তি ঈশ্বর আছেন, ইহাতে ভ্রান্তি হইতে পারে না। যে আলোক দেখিতেছি, অভ্রান্ত বুদ্ধিতে বলিতে পারি না, আলোক নাই। এ সকল বিষয়ে পূর্ণ অভ্রান্তি, অন্যত্র ভ্রান্তির সম্ভাবনা। আমি আছি, ঈশ্বর আছেন, পরলোক আছে, এ সম্বন্ধে জ্ঞানকে কখন ভ্রান্ত বলিব না। সকল বিষয়ে অভ্রান্তি পরিমাণে, অনন্ত সম্বন্ধে নহে। আমা অপেক্ষা তুমি, তোমা অপেক্ষা অপরে সমধিক অভ্রান্ত হইতে পারে, কেন না অল্পাধিক সাধন দ্বারা একজন আর একজন অপেক্ষা অভ্রান্ত হইয়া থাকে। আমার অভ্রান্ত-তার ভূমির পরিমাণ অর্দ্ধ হস্ত, তোমার এক হস্ত, অপরের হয় তো পাঁচ হস্ত, আর একজনের হইতে পারে এক ক্রোশ,

এইরূপ অভ্রান্ততার ভূমির পরিমাণের তারতম্য হইয়া থাকে। মনুষ্যে মনুষ্যে এ সম্বন্ধে ইতর বিশেষ আছে, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিতে কিছু না কিছু অভ্রান্তি আছে। আমি আমার অভ্রান্ত জ্ঞানে স্থির বিশ্বাসী, তৎসম্বন্ধে আমার কখন ভ্রান্তি হয় না। এই জ্ঞান উজ্জ্বল এবং স্পষ্ট ইহাতে কখন ভ্রম আসিতে পারে না। সত্যবাদী হও, ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, ইহাতে কি তোমার জ্ঞান অভ্রান্ত নহে ?

তুমি আপনাকে বিনয়ী দেখাইবার জন্য আপনাকে ভ্রান্ত বলিলে, ইহাতে সামান্য অপরাধ হইল না। তুমি ইহার দ্বারা ঈশ্বরকে বঞ্চক বলিলে। এ যে কপট ধূর্ত্তের বিনয়। এ যে পৃথিবীর অবিশ্বাস নাস্তিকতা। আজ যাহা ঈশ্বরের বাণী বলিয়া বিশ্বাস করিলে, ধর্ম্ম বলিয়া সাধন করিলে, কয় দিন পরে সংসারের সামান্য বস্তুর ন্যায় তাহাকে ভ্রান্তি বলিয়া পরিত্যাগ করিলে, আজ বলিলে এক কথা, কাল প্রাতে তাহার বিপরীত বলিলে, ইহা কখন মনুষ্যোচিত নহে, বিশ্বাসোচিত নহে। যে ভ্রান্ত সে অবিশ্বাসী নাস্তিক। তোমার বিনয় ঈশ্বরকে প্রবঞ্চক করিয়া লোকের মন ভুলাইতে প্রবৃত্ত। ঈশ্বর আজ তোমার জন্য মিথ্যাবাদী হইলেন। ঈশ্বরকে মিথ্যাবাদী করিয়া পাঁচজনের মুখে তোমার বিনয়ের প্রশংসা শুনিতে অভিলাষ। দেখিও এরূপ যেন কখন তোমার আমার অবস্থা না হয়।

মুসা ঈশ্বরের মুখে যে যে আজ্ঞা শুনিলেন, তিনি তাহা

কাগজে লিখিলেন না, কেন না তাহা ছিঁড়িয়া যাইবে। পাথরের উপর সেই সকল লিখিত হইল। অতএব তুমি ঈশ্বরের মুখে যাহা কিছু শুনিবে প্রস্তরে খোদিত করিয়া তাহা রক্ষা কর। সেই সকল আপনি দেখ এবং দেখাও, ব্যাখ্যান করিতে সেই সকলের ব্যাখ্যান কর। ঈশ্বর "আমি আছি" মুসার ন্যায় প্রত্যেককে বলিতেছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, ঈশ্বর, তোমার নাম কি, তিনি বলিবেন "আমি আছি।" সকলকে গিয়া বল, "আমি আছি, আমায় প্রেরণ করিয়াছেন।" এ কথা শুনিয়া কি আর বলিতে পার ঈশ্বর আমায় কিছুই বলেন নাই? তুমি কার্য্যালয়ে বেতন গ্রহণ করিলে, তখন কি তোমায় কেহ বলিয়াছে, তুমি সংসারী হও, সুখপ্রিয় হও, তুমি টাকা লইয়া অনুচিত বড় মানুষী কর? ঈশ্বর কি তোমায় ধমক দিয়া লোভ সম্বরণ করিতে বলেন নাই? এই যে তোমায় লোভ সম্বরণ করিতে বলিলেন, এই তো দুটী অভ্রান্ত শাস্ত্র লাভ করিলে। এইরূপ গণনা করিয়া যাও, তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম নবম দশম একাদশ দ্বাদশ শত সহস্র অভ্রান্ত আদেশ দেখিতে পাইবে। সৎ পথে যাইবার জন্য যে ঈশ্বরের আদেশ পাইয়াছ তাহা যথার্থ বলিয়া জান। ঈশ্বরের যে যে উপদেশ সত্য তাহা প্রকাশ করিতে কেন ভয় করিবে? সমুদয় আদেশ উপদেশ সুচারুরূপে প্রস্তরে লিখিয়া রাখ। উহার পার্শ্বে অভ্রান্ত বেদ, অভ্রান্ত ঈশ্বরের বাক্য, অভ্রান্ত

ব্রহ্মবাণী, অভ্রান্ত দৈববাণী, এই শব্দ অঙ্কিত কর। সমুদয় আদেশ উপদেশ অক্ষরে সংযুক্ত হইলে উহা বেদ হইল। আমাদের হরির সমুদয় বিধি অভ্রান্ত। অভ্রান্ত জ্ঞান, অভ্রান্ত বুদ্ধি, অভ্রান্ত বিদ্যা, সমুদয় তাঁহার নিকট হইতে আইসে, তাঁহার অভ্রান্ত বিধির একটীও বর্ণান্তর হয় না। তিনি যাহা আদেশ করেন উপদেশ দেন, তাহা কিছুতেই নড়িবে না।

সকলের মধ্যেই এই অভ্রান্ত বেদ আছে, কেবল এই চাই যে তাহার ভূমি বিস্তীর্ণ হউক। আজ দশটী, কাল বারটী অভ্রান্ত সত্য লাভ করিলে, যাহাতে কুড়িটী অভ্রান্ত সত্য লাভ করিতে পার তাহার জন্য যত্ন কর। ক্রমে এমন সৌভাগ্য হউক যে এক শতটী অভ্রান্ত সত্য সংগ্রহ করিতে পার। যিনি এইরূপ অভ্রান্ত সত্য লাভ করিতে পারিবেন, তিনি ধন্য হইবেন। আজ যে পরিমাণে অভ্রান্ত আছ, কল্য তদপেক্ষা আরও অভ্রান্ত হইবে। আজ একজন একটী অভ্রান্ত সত্য পাইল। ক্রমে একজন পঞ্চাশটীর মধ্যে চল্লিশটী অভ্রান্ত সত্য লাভ করিবে। পৃথিবীর এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত এইরূপে অভ্রান্তবাদের রাজ্য বিস্তৃত হইবে। ক্রমে প্রেমেতে পুণ্যেতে অভ্রান্তি উপস্থিত হইয়া উন্নতির পর উন্নতি হইতে থাকিবে। ক্রমে সকল বিষয়েই এইরূপ উন্নতি হইবে, সুখ হইবে। এই নববিধানে আমি কেবলই সুখ সম্ভোগ করিব।

ঈশ্বর সহ বিয়োগের ভূমিতে আমি ভ্রান্ত, পূর্ণ অভ্রান্তি

আমার নাই। কিন্তু আমি যত যোগী হইব, তত অভ্রান্ত হইতে থাকিব। যোগের সময়ে আমার এ জিহ্বা আমার নয়, আমার হস্ত আমার নয়, এই কলম যাহা দিয়া আমি লিখিতেছি, তাহাও আমার নয়, ঈশ্বরের। এই রসনার বাক্যে, এই লিখিত প্রবন্ধে সমস্ত পৃথিবী কাঁপাইব। হিমালয় টলমল করিবে, সমুদ্রে মহা তুফান উঠিবে। মানুষ নয়, মহাদেব জীবের ভিতরে থাকিয়া হিমালয়কে টলান, সমুদ্রে মহা তুফান উত্থিত করেন। আমরা নীচ আমরা ক্ষুদ্র, আমাদের ভাবও অতি নীচ এবং ক্ষুদ্র। কিন্তু মহাদেবের সঙ্গে যোগ হইলে ক্রমে ক্রমে সমুদয় অভ্রান্ত হইয়া উঠে। কাহাকেও বলিতে দিব না তোমাদের সকল মত ভ্রান্ত। ভ্রান্তিবাদকে বিনাশ করিতে প্রস্তুত। শাণিত খড়্গ হস্তে ধারণ করিয়া ভ্রান্তিবাদের মত খণ্ড খণ্ড করিব। দৃঢ়তার সহিত নির্দ্ধারণ করিব, ঈশ্বরের ভক্ত সন্তানগণ নিশ্চয় অভ্রান্ত। সেই সকল লোকের মধ্যে প্রবল নরপতি থাকেন তাহাতে কি? বড় বড় যোদ্ধা বড় বড় মানুষ সত্যের পরাক্রমে সকলকে পরাজয় করিবে, অভ্রান্ত মত স্থাপন করিবে। যাহা যাহা ঈশ্বরের নিকটে শুনিয়াছি, বলিব ইহা নিশ্চয় সত্য। আমাদিগের শাস্ত্র এতগুলি, নিশ্চয় করিয়া বল। মনুষ্য মূর্খ, তাহাদের বুদ্ধি কিছুই নাই। ব্রহ্মসাধক, তুমি কি সত্য সকল ঈশ্বর হইতে পাইয়াছ? ইহার উত্তর—হাঁ পাইয়াছি। ব্রহ্মের আদেশকে ভূমি করিয়া তদুপরি

দণ্ডায়মান হও। সত্য উপলব্ধি কর। "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং, ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং" বলিতে বলিতে ঈশ্বরের কৃপার উপরে বিশ্বাস করিয়া পৃথিবীকে টলাইবে, ক্রমান্বয়ে সেই মহাবাক্য উচ্চারণ করিতে থাকিবে।

কর্ম্ম-যোগ।

রবিবার ২৯শে কার্ত্তিক, ১৮০৩ শক; ১৩ই নবেম্বর ১৮৮১।

সকলেরই একদিন মৃত্যু হইবে, এ জীবন পৃথিবীতে চিরকাল থাকিবে না। কিন্তু যাহা করিবার তাহা না করিয়া যে ব্যক্তি পৃথিবী হইতে চলিয়া যায়, সে অতি নরাধম। ভৃত্য বেতন পায়, কিন্তু যে ভৃত্য কার্য্য করে না, কে তাহাকে বেতন দিবে? তোমরা ভৃত্য, হে নববিধানবাদী ব্রাহ্ম, তোমাদিগকে এই জন্য বেতন দেওয়া হয় যে তোমরা উপযুক্তরূপে কার্য্য করিবে, তোমরা কখন কার্য্য না করিয়া থাকিতে পার না। পরম প্রভুর নিকটে পুরস্কার প্রাপ্ত হইবার আশা করিলে অনেক দিন তাঁহার কার্য্য করিতে হইবে, অচিরে তোমাদিগের জীবন নষ্ট হইতে পারে না।

প্রভু মনুষ্যকে অতি প্রথমে যে কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছেন, যাবজ্জীবন তাহাকে তাহা প্রতিপালন করিতে হইবে। শীঘ্র কার্য্য শেষ না করিয়া মরিলে আমাদিগের মরা পাপ হইবে। তুমি তোমার কার্য্য শেষ না করিয়া ইহলোক হইতে পর-

লোকে যাইতে পার না। ভৃত্য যদি আগে পলায়ন করিতে চায় কেহ তাহাকে যাইতে দিবে না। আগে সমুদয় কার্য্য শেষ করিয়া দাও, পরে ঈশ্বর তোমাকে অবসর দিবেন। যিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ী তিনি কেবল রোগ শান্তির উদ্যোগ চেষ্টা করিবেন, উপেক্ষা করিতে পারেন না। যতক্ষণ না রোগের প্রতিকার হয়, ততক্ষণ তাঁহার নিষ্কৃতি নাই। যদি তোমরা কার্য্য শেষ না করিয়া যমালয়ে যাইতে চাও, যম কখন তোমাদিগকে স্পর্শ করিবে না। পলায়ন করিয়া কোথায় যাইবে? সৃষ্টির সময়ে ঈশ্বর যে কথা বলিয়া দিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিতে পার না। কার্য্য না করিয়া ইহলোক হইতে পলায়ন করিলে দুর্নাম হইবে, পরলোকে কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। যদি কার্য্য করিয়া চলিয়া যাও, বিশেষ পুরস্কার লাভ করিবে।

ভৃত্য কার্য্য করিলে তবে সে বেতনের যোগ্য হয়। হে ব্রহ্মভৃত্যগণ, তোমরা কি কার্য্য করিতেছ? তোমরা কি জন্য দেহ ধারণ করিতেছ? কত লোক আসিল চলিয়া গেল, অদ্যাপি তোমরা বাঁচিয়া আছ কেন? রোগ যন্ত্রণা অনেক ভোগ করিলে, অকালে মৃত্যু হইল না কেন? এক এক সময় কণ্ঠাগত প্রাণ হইয়াও পুনরায় বাঁচিলে কেন? ইহার অর্থ এই, কার্য্য শেষ না করিয়া যাইতে পার না। কেহ প্রভুর কার্য্য শেষ না করিয়া পরলোকে যাইতে পারে না, নববিধান এই ব্যাপার জগৎকে দেখাইবে। পৃথিবীতে

ঈশ্বরের কার্য্য শেষ না হইলে পরলোকের দ্বার অবরুদ্ধ হইবে, সুতরাং সাবধান হইয়া ইহলোকে কার্য্য শেষ করিতে হইবে।

দাসের প্রতি ঈশ্বরের যাহা অনুজ্ঞা তাহা কে ফিরাইতে পারে? ভৃত্যমণ্ডলীর কি কার্য্য? দুবেলা উপাসনা করা, ধর্ম্মালোচনা করা, ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করা, সংসারের কর্ত্তব্য সাধন করা, দান ধ্যান করা, এই সকল করিলে কি পরলোকে যাইবার উপযুক্ত হইবে? তোমাদের এরূপ করিয়া জীবন কাটান অন্যায়। তোমরা এ জন্য আইস নাই। নববিধান কি করিবেন, তোমাদের কি দায়িত্ব মনে আছে? পৃথিবী হইতে সর্ব্ববিধ পৌত্তলিকতা দূর করিয়া দেওয়ার জন্য ঈশ্বর তোমাদিগকে দূত প্রেরণ করিয়াছেন। একেশ্বরবাদ বহন করিবার জন্য তোমরা আসিয়াছ। চারি হাত দশ হাত ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল প্রকারের মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে। সমুদয় মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্ম দেখিতে পাইবে। পৃথিবীকে এই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বুঝাইয়া দিয়া অবতারবাদ খণ্ডন করিতে হইবে। তোমাদের এ উদ্দেশ্য সাধিত না হইলে উপাসনালয় যমালয় হইবে; পৃথিবীর তাহাতে বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি।

তুমি বলিলে আমার আর করিবার কি আছে, বলিলে আর মরিলে। এ পথে গেলে আর উন্নতি নাই, মৃত্যু। স্বপ্ন যেমন, তেমনি জীবনের সমুদয় ঘটনা কল্পনা হইয়া যাইবে।

তোমার সকলই লোকের নিকট ছায়ার ন্যায় মিথ্যা প্রতীত হইবে। বল তোমার জীবন আর কেন লোকে স্মরণ করিবে। পৃথিবী তোমার এই মিথ্যা জীবনের জন্য যদি গৌরব না দেয় তবে তাহাকে তজ্জন্য ধন্যবাদ। তোমরা বলিতেছ তোমাদিগের কর্ত্তব্য ফুরাইয়াছে, নববিধান কখন কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে বুঝিতে দেন না। পৃথিবীতে যত দিন থাকিবে, পৃথিবীর প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করিবে, ইটী তোমার অভিলাষ নহে, ঈশ্বরের অভিলাষ। ঈশ্বর কর্ত্তব্য সাধন করিবার জন্য পাঠাইলেন এই বিশ্বাসে বক্ষঃ স্ফীত কর। মনুষ্য নানা পথে যাইতেছে, তাহাদিগকে জানিতে দাও যে, সকল পথ এক স্থানে সম্মিলিত হইয়াছে। কেহ অদ্বৈতবাদ অবলম্বন করিতেছে, কেহ বা পৌত্তলিক হইতেছে, কেহ বা সমুদয় ধর্ম্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নাস্তিক হইতেছে। বিস্তীর্ণ পৃথিবী, তুমি একা কি করিবে? তুমি যদি এখানে কার্য্য করিতে চাও, তোমার নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ থাকিবে না। তোমার চক্ষু ঈশ্বরের দিকে রাখ, বক্ষে হাত রাখিয়া তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর কর। তাঁহার কৃপায় তুমি এমন সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া চলিতে সক্ষম হইবে যে অদ্বৈতবাদ এবং পৌত্তলিকতার যে অংশ সত্য তাহা তুমি অনায়াসে গ্রহণ করিবে, অথচ তুমি অদ্বৈতবাদী বা পৌত্তলিক হইবে না, ভ্রম কুসংস্কারে পড়িবে না। হে ব্রাহ্ম, তুমি এইরূপে ঈশ্বর-প্রসাদে সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া চলিয়া যথার্থ একেশ্বরবাদ জগৎকে

দেখাইবে। তুমি এই কার্য্য সাধন করিয়া যাইতে পারিলে দেখিবে ঈশ্বর তোমার জন্য স্বর্গে সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। ঈশ্বরের স্বর্গীয় দূত আসিয়া তোমাকে ঈশ্বরের পার্শ্বে লইয়া যাইবে, এবং সেখানে সাধুমণ্ডলীর মধ্যে তোমাকে উন্নত স্থান অর্পণ করিবে। তাই বলি একা ঈশ্বরকে স্পষ্টরূপে সকল লোকের নিকট দেখাও। পৃথিবীর ছোট ছেলেরা যেমন তাহাদের মাকে ভালবাসে, তেমনি সেই নিরবয়ব অরূপমনোহর মাকে কেমন ভালবাসা যায় তাহার প্রমাণ জগৎকে দেখাও! এখানে অণুমাত্র ভ্রম তোমাকে স্পর্শ করিবে না, অথচ মার কত মূর্ত্তিকে হৃদয়ের প্রেমকুসুম দিয়া অর্চ্চনা করিবে।

তুমি মাকে ভক্তি করিবে, ভক্তির পরাকাষ্ঠা লাভ করিবে, অথচ মূর্চ্ছিত হইবে না, অজ্ঞান হইবে না। সর্ব্বদা জাগ্রৎ অবস্থায় তাঁহার সঙ্গে আত্মার যোগ সমাধান করিবে। মাকে না দেখাইয়া, যোগ ভক্তির পরাকাষ্ঠা না দেখাইয়া, তুমি কখন পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইতে পার না। যদি ইহা সাধন না করিয়া চলিয়া যাও অকাল মৃত্যু হইবে, কাপুরুষের মৃত্যু হইবে। সাধু সন্তান বলিয়া কেহ তোমার নাম কীর্ত্তন করিবে না, তুমি যে তাঁহার কার্য্যভার লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলে তাহা দাঁড়াইবে না, সাব্যস্ত হইবে না। যে জন্য আসিয়াছ তাহা জগতের নিকট সাব্যস্ত কর, যে সমস্যা পূরণ করিবার জন্য আসিয়াছ তাহা পূরণ কর, যাহারা বাহিরে

পড়িয়া রহিয়াছে তাহাদিগকে দলস্থ কর। পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে যাহাতে আর পৌত্তলিকতা, অদ্বৈতবাদ ভ্রম প্রমাদ, শুষ্কতা, ধর্ম্মহীনতা, নীতিহীনতা, চলিতে না পারে, তাহার উপায় কর। সমুদয় করিয়াও যদি নিরাকারা শক্তিস্বরূপাকে দেখাইতে না পারিলে, তাহা হইলে কিছুই হইল না! মান্দ্রাজ, বম্বে, পেশোয়ার, কন্যাকুমারী সকল স্থানে সিংহ-ধ্বনিতে প্রচার করিলে, ক্রমান্বয়ে এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা চীৎকার করিলে, সেনাপতির কথা দ্বারা লোকের মনের ভাব উদ্দীপন করিলে, অথচ এ কথা বলিতে হইবে তোমার এ সকল অনুষ্ঠানে কিছুই হইল না। কেবল এই মাত্র তোমাকে জিজ্ঞাসা, তুমি কয় জন লোকের জীবন, সেই সেই স্থানে যথার্থ ধর্ম্মের পথে রাখিয়া আসিলে? যদি স্থানে স্থানে লোকে নতন জীবন আরম্ভ করে তুমি যাহা বলিলে তাহা প্রতিধ্বনিত হইবে, ক্রমে সেই প্রতিধ্বনি প্রবলতর হইবে, সেই প্রতিধ্বনি তোমার কথাকে পরসীমায় লইয়া যাইবে।

কিন্তু এখনও সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তৃত হয় নাই, ঈশ্বর বলিবেন আরও স্তব কর, সঙ্গীত কর, আরও ধ্যান ধারণা উপাসনায় প্রবৃত্ত হও, যাহা ভারতে হইয়াছে, তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাও, আপনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যোগ করিলে চলিবে না। দেখাও, ভাই ভগিনীদিগকে দেখাও যে এই শুভক্ষণে প্রাচীন যোগের সমুদয় ভ্রম প্রমাদ

পরিত্যাগ করিয়া ইহার সঙ্গে ইংরাজদিগের কার্য্য করিবার সামর্থ্য সংযুক্ত হইয়াছে। শেখাও আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যেরা যোগ সাধন করিতেন, আমরা ইংরাজী লেখা পড়া শিখিয়া তাঁহাদিগের যোগের সঙ্গে ইংরাজদিগের পরিশ্রম ও বৈষ্ণবদিগের ভক্তি মিশাইয়াছি, এইরূপ মিলাইলে যোগ ভ্রষ্ট হয় না। ইউরোপীয়ের পরিশ্রম ঘূর্ণিত করিতেছে. রক্তের ভিতরে ঘুরিতেছে। কার্য্যে ঘূর্ণিত আত্মা স্থির শান্ত-ভাবে, ব্রহ্মযোগে নিমগ্ন। পৃথিবী ইহা কখন দেখে নাই। অনেকে হিমালয়ে বসিয়া দশ বৎসর বার বৎসর পঞ্চাশ বৎসর যোগ সাধন করিল, যোগের জন্য রাজাও ফকির হইল, স্ত্রী পুত্র ধন জন সংসার সমুদয় বিদায় করিয়া দিল; একাকী নির্জ্জন দেশে পর্ব্বতশিখরে নদীতটে বসিয়া যোগী হইল, ঋষি হইল। এ সকল হইয়াছে, তুমি ব্রাহ্ম, তোমাকে আর কিছু দেখাইতে হইবে।

আমি ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সর্ব্বপ্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি, অনেক ইংরাজী পুস্তক পড়িয়া বিদেশীয় তত্ত্ব, বিদেশীয় জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছি, ইংরাজী শিক্ষায় কোথায় সংসারে নাস্তিকতা বৃদ্ধি হইবে, না লোকে বিশ্বাসী হইবে? বিদ্যাতে কেবল অহঙ্কারই হয়, ইংরাজীতে কেবল বাহ্যসভ্যতার শোভাতেই লোককে শোভিত করে। ভারতবর্ষকে কি ব্রহ্মযোগ দ্বারা সংস্কার করিতে চাও? আর কি করিবে,

ইংরাজী যন্ত্র সকল আনয়ন কর, যন্ত্র দ্বারা সকলই হইবে। বিজ্ঞান ও যন্ত্রকে সহায় কর, কল আর বুদ্ধি দুইকে একত্র কর, আর সমুদয় দূরে নিঃক্ষেপ করিয়া পরিশ্রম কর। আমরা বলি পরের হিতসাধন করিবার জন্য পরোপকারের পন্থা বাহির কর। দশ ঘণ্টার স্থলে বার ঘণ্টা পরিশ্রম কর, বাহিরে ঠিক যেন সাহেব, বিদ্যাতে পরিশ্রমে সুসিদ্ধ হইয়া ইংরাজীপরায়ণ হও। সেই অবস্থায় পূর্ব্ব ও পশ্চিমের বিদ্যা কি অদ্য বঙ্গদেশে মিলিত হইতে পারে না? মিলিত হইতে পারে, কেবল যোগে। এতকাল যাহা হয় নাই, আজ তাহা হইবে, সকলে বলিল তাহা হয় না, হয় না। যাই ব্রাহ্ম পশ্চিমের জ্ঞান পরিশ্রম যোগ করিলেন, আর পূজা হয় না। হয় না, হয় না পৃথিবী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল। পূর্ব্ব পশ্চিমকে দুই হাতে করিয়া প্রতিবাদ করিতে চেষ্টা করিও না। ভিন্ন দুই জিনিস কখন এক হয় না, দুইকে এক করিতে চেষ্টা করিলে যোগ ভাঙ্গিবে। নিষ্ক্রিয়াপ্রধান যোগ, সভ্যতার মধ্যে কি প্রকারে থাকিবে? সভ্যসমাজ নিশ্চয় যোগবিহীন হইবে। নববিধান বলিলেন, না। হৃদয়ে ঋষিভাব, পাশ্চাত্য বিদ্যার ভাব, যোগের ভাব, মাতৃগর্ভে সঞ্চারিত হইয়াছে। ইউরোপের বিদ্যার সঙ্গে এ দেশের যোগ একত্র হইবে। এক এক জীবনে পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব সকল একত্র হইলে তবে স্বর্গ। সকলকে এক করিলে তবে স্বর্গে যাইবে। এখন সময় আসিয়াছে যে সময়ে এই

মিলনের কার্য্য সম্পাদিত হইবে। যাহা অসম্ভব নববিধান তাহাকে সম্ভব করিবে। পৃথিবী এই মিলন দেখিবে ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা ইহা দেখিবে। যাঁহারা এই মিলন সাধন করিবেন, তাঁহারা জগতের মহৎ উপকার সাধন করিবেন। তাঁহারা সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন, প্রাতঃস্মরণীয় হইবেন। ভ্রাতঃ, তোমাকে নমস্কার করি, তুমি ইংরাজী লেখা পড়ার মধ্যে এই অসম্ভব কার্য্য সাধন করিয়া নাম রক্ষা করিলে।

কেবল যোগ বৈরাগ্য, বৈষ্ণবের খোল করতাল, নামসঙ্কীর্ত্তন মিলাইলে নাম রহিবে না? বল নূতন কি করিলে? এত কাল যে প্রচুর লবণ খাইলে তাহার বিনিময়ে বল কি করিলে? তোমরা যে চাকর, সকলের ভৃত্য। প্রভুর কার্য্য তোমাদিগকে করিতেই হইবে। তোমাদিগের উপরে তিনি যে ভার অর্পণ করিয়াছেন তাহা তোমাদিগকে আদায় করিতেই হইবে। যে ব্যক্তির নববিধানের উপরে অনুরাগ আছে তাহার সকলকে সেবা করিতেই হইবে, পৃথিবীতে নূতন ভাবে ঈশ্বরের পূজা স্থাপন করিতেই হইবে। ঈশ্বরের ভৃত্য হইয়া, সংসারের ভৃত্য হইয়া, অন্য লোকদিগের মত আদায় দিলে চলিবে না। যাই বলিবে আর পারি না, স্বর্গের আদেশ মত খাওয়া বন্ধ হইবে। ঈশ্বরের লবণ যে খাইতেছ কাজ দেখাও। অমুকের চল্লিশ বৎসর বয়স, অমুকের পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইল, কিন্তু পৃথিবীতে যে জন্য আসা হইয়াছে,

তাহার কি হইল? হৃদয়কে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার সদুত্তর দাও। আজ যদি মৃত্যু হয়, বল স্বর্গের দ্বার খুলিয়া, দ্বারবান্ অনুগত ভৃত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে কি না? কার্য্য শেষ করিয়া মৃত্যু হইলে, পৃথিবী কেন তোমাদিগকে ঈশ্বরের ভৃত্য বলিয়া গৌরব অর্পণ করিবে না! তোমরা বলিবে, কেন আমরা কেহ স্রষ্টাকে ভক্তি দিয়াছি, কেহ মুসার সঙ্গে মিলন করিয়াছি, কেহ বা বৈষ্ণবদিগের শ্রীগৌরাঙ্গকে স্থান দিয়াছি, সকল সাধুর গুণ বর্ণনা করিয়াছি, ভক্তি দিয়া সঙ্গীত করিয়া সকলের সম্মান রক্ষা করিয়াছি, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীগণের সঙ্গে বন্ধুভাবে মিলিত হইয়াছি, ইহাতে আমরা স্বর্গে পরিগৃহীত, পৃথিবীতে সম্মানিত কেন হইব না? বল তোমরা পরম প্রভুকে সর্ব্বোচ্চ স্থান অর্পণ করিয়া একাধারে তিন সাধুকে বসাইয়াছ কি না? দেখাও দুই হাতে ঈশা ও চৈতন্যকে স্থাপন করিয়াছ কি না? যেখানে দুই জন দাঁড়াইয়াছেন, সেখানে অন্য পাঁচজনের স্থান হয় কি না? তোমাদের সহধর্ম্মিণী ভ্রাতা ও সন্তান-বর্গকে তোমার এই পথে আনয়ন করিয়াছ কি না? আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সকল ইহার অনুসারী হইয়াছে কি না? যদি সকলকে নূতন বিধানের ভাব দিতে অক্ষম হইয়া থাক, স্থির হও, স্বর্গের দ্বার খুলিবার সময় হয় নাই। এখনও মরিবার সময় দূরে। দাঁড়াও, পৃথিবী এখন বিদায় দিবে না। ঈশ্বরের পুণ্যকার্য্য সমাধা করিতে অনেক বাকি আছে।

তোমরা যথা সময় আসিয়াছ, কিন্তু তোমাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য এখনও তোমরা কর নাই।

যে জন্য আসিয়াছ তাহা সমাধা করিয়াছ কি না অন্তর্যামী জানিতেছেন। কার্য্য শেষ হয় নাই, এখনও দিন আছে, শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য শেষ কর। কার্য্য শেষ করিয়া গেলে স্বর্গের দ্বার আপনি খুলিবে। হে প্রসন্ন ভক্ত, প্রসন্ন মনে তোমার কর্ত্তব্য সমাধা কর, কর্ত্তব্যে অবহেলা করিও না, যাহা অসমাপ্ত আছে, তাহা সমাপ্ত কর, অপূর্ণ ব্রত সম্পূর্ণ কর। তোমার অদৃষ্টে কি আছে, কি লইয়া তুমি আসিয়াছ, ফল দেখাইয়া তাহা সকলের গোচর কর। তুমি কি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য পৃথিবীতে বাঁচিয়া আছ? তুমি কি নূতন ধর্ম্ম পৃথিবীকে দিবার জন্য আসিয়াছ, অথবা দু পাঁচ টাকা অর্জ্জন করিয়া অপরের হিতসাধন করিবার জন্য তোমার জন্ম? যদি কোন প্রকারে পরের একটু হিতসাধন করা তোমাদের কার্য্য হয়, তবে তো আদর্শ পূর্ণ হইল না। সংসারে প্রভুকে তুষ্ট করিলে, পাঁচ খানা পুস্তক লিখিলে, সংসারে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিলে, ইহাতে যদি তুষ্ট হও, কপালের লেখা কেহ বলিবে না। তুমি অন্য লোকের মত নও, তোমাকে বিশেষ বিধি স্থাপন করিতে হইবে। তুমি বিধি স্থাপনের সঙ্গে এমন কিছু কর যাহাতে লোকে বুঝিতে পারে, নববিধান কি? এমন কার্য্য করিয়া যাও, যাহা ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় নাই, পৃথিবীতে কেহ কোন দিন করিতে পারে নাই। আনন্দময়ী মাতার

বিধান যে আসিয়াছে তাহা পৃথিবী জানিতে পারে নাই, শীঘ্র যাহাতে সকলে জানিতে পারে তাহার চেষ্টা কর। পাপ করিয়া অধর্ম্ম করিয়া সকলে বিনাশের পথে যাইতেছে, যাহাতে তাহারা রক্ষা পায় এজন্য নূতন নূতন ব্রত গ্রহণ কর। যাহার জন্য আসা, সর্ব্বপ্রযত্নে কায়মনোবাক্যে তাহা সমাধা করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া যাও। প্রভু যে পাঁচটী কার্য্য, যে পাঁচটী মিষ্ট নাম পৃথিবীতে বিলাইতে দিয়াছেন, জীব সকল যাহাতে তাহাতে বিশ্বাসী হয়, তাহার উপায় কর, পৃথিবীকে হরিভক্ত প্রস্তুত কর। এখন বলিতে পার না যে মরিবার সময়ে বলিয়া যাইতে পারিবে যাহা করিতে আসিয়াছিলাম তাহা সম্পন্ন করিয়া চলিয়া গেলাম। ভ্রাতৃমণ্ডলী এই সময় আর সময় নাই। যে কয় বৎসর আছ, ইহার মধ্যে কার্য্য সাধন করিয়া যাও। উৎসাহ আনন্দের সহিত নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সমাধা করিয়া পরম প্রভুকে সন্তুষ্ট কর যে পুরস্কারের উপযুক্ত হইবে।

ব্রহ্মোপাসনা।

রবিবার ৬ই অগ্রহায়ণ, ১৮০৩ শক; ২০শে নবেম্বর ১৮৮১

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, কেন অনেকে মনে করিয়া থাকেন, ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে দুর্ব্বোধ সত্য সকল বিবৃত হয়। যাহা সাধারণ সাধকমণ্ডলীর বোধাতীত, যাহা অল্প-

সংখ্যক সাধকশ্রেণীর উপযোগী তাহাই এখান হইতে বলা হয়, যাহা বলা হয় তদপেক্ষা আরও সহজ সত্য সহজে বিবৃত করিলে সকলের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা। যদি এ যুক্তি অবলম্বনীয় হয়, তবে আজ উপাসনা সম্বন্ধে সহজ কথা বলি শুন। কিরূপে উপাসনা করিবে, কিরূপে ডাকিবে, কিরূপে ডাকিলে কি ফল লাভ করিবে, ইহা সকলেরই জানা কর্ত্তব্য। ডাকিবার প্রণালী কি? আজ শক্ত কথা কঠিন তত্ত্ব দূরে রাখিয়া, সহজ ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী নির্দ্ধারণ করা যাউক।

উপাসনার সর্ব্বপ্রথমে বসিবার আসন। উপাসনা করিতে গেলে আসন গ্রহণ করিতে হইবে। এমন আসন গ্রহণ করিবে যাহাতে উপাসনার ব্যাঘাত না হয়, মনকে উন্নত করিবার পক্ষে উহা অনুকূল হয়। উপবেশন যদি ভাল না হয়, উচ্চ সাধনে সক্ষম হইবে না, বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে আসন ঠিক করা উচিত। আসনে উপবেশন নিয়মানুসারে করিতে হইবে। মন সুস্থ, শরীর স্থির, হস্তপদাদি যথা স্থানে স্থিত, এইরূপ ভাবে আসনে উপবেশন করিবে। আসন তখনই যথার্থ হয়, যখন শরীর মন আসনে প্রকৃতিস্থ থাকে। যদি শরীর মন চঞ্চল হয়, উপাসনা হয় না। সুতরাং আসনের নিয়ম সর্ব্বপ্রথমে অত্যন্ত প্রয়োজন।

যখন আসনে উপবেশন করিলে, তখন তোমার মুখ চক্ষু হস্ত বক্ষ ঈশ্বরের সম্মুখীন হইল, সমস্ত অঙ্গ উপাসনার অভিমুখীন হইল, অনুকূল অবস্থায় নীত হইল। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী,

কিন্তু মনুষ্য উপাসনা কালে তাঁহাকে সম্মুখে উপলব্ধি করিবে তিনি চারিদিকে আছেন, অথচ উপাসনা কালে সাধক সমক্ষে তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিবেন। ঈশ্বরের সম্মুখীন হইয়া স্থিরভাবে পরিষ্কৃত আসনে পরিমার্জ্জিত স্থানে উপবেশন করিলে বিঘ্ন নাই, কোন অকল্যাণের সম্ভাবনা নাই, এখন মনকে ঈশ্বরের অভিমুখে স্থির রাখিবার জন্য উদ্বোধন করিবে। উদ্বোধন ও ঈশ্বরকে বোধের বস্তু করিবার জন্য যত্ন একই। বোধন উদ্বোধন নিতান্ত আবশ্যক। মন্দিরের দ্বার খুলিল, উপবেশন করিলে, এখন উপাসনার উপক্রমণিকা, আরম্ভ ও ভূমিকা উদ্বোধন।

উদ্বোধনান্তে আরাধনা। এই আরাধনা ব্রহ্মপূজার জীবন-স্বরূপ। উপাসনা করিতে গেলে কতকগুলি উদ্বোধক শব্দের প্রয়োজন। উপাসনার প্রধানোপায় কি? শব্দ। শব্দ কি? যে শব্দে ধর্ম্মের দুরূহ ব্যাপার সিদ্ধ হয়। মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হয়, ঈশ্বরজ্ঞান ঈশ্বরভাব উত্তেজিত হয়। শব্দ চিন্তার জন্য একান্ত আবশ্যক। চিন্তা মনে মনে কর, তথাপি তোমাকে শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। শব্দ অতীন্দ্রিয় ব্যাপার। শব্দ পরিত্যাগ করিলে কিছুই হয় না। "সত্যম্" এইটী সাধনের প্রথম মন্ত্র। "সত্যম্" এই শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে ঈশ্বরের ভাব উদ্বুদ্ধ হয়। যিনি উপাসনা করিবেন, তিনি নির্জ্জনে উপাসনা করুন বা আচার্য্যের সঙ্গে মিলিত হইয়া শত শত ব্যক্তির সঙ্গে উপাসনা করুন,

সকল ব্যক্তিকেই দুই পাঁচটী শব্দ মনে মনে চিন্তা করিতে হইবে, শব্দ সহকারে চিন্তার উদ্বোধন করিতে হইবে।

"সত্যম্" বলিতে বলিতে ভাবিবে, এই ঈশ্বর আমার সম্মুখে আছেন। যতক্ষণ এইটী স্থির না হয়, ততক্ষণ উপাসনা হয় না। এইটী হইলে পূজা অর্চ্চনা কি তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। এই হরি, এই আমি পূজা করি। তোমার ঈশ্বরকে তোমার সম্মুখে আনয়ন জন্য উদ্বোধনের প্রয়োজন, ব্রহ্মপূজা ইহা বিনা হয় না। তুমি সংসারে ছিলে, সংসারে আছ, তোমার সম্মুখে এমন পুতুল নাই যে, তুমি তাহাকে দেখিয়া পৌত্তলিকদিগের ন্যায় বাহ্য সামগ্রীতে পূজা করিবে। কোন পুতুল নাই, কোন বাহ্য পূজার উপকরণ নাই, জড়ের সঙ্গে একেবারে সম্বন্ধ বর্জ্জিত, অথচ সে সকল অবলম্বনশূন্য হইয়া ঠিক তোমাকে যেন সে সকল আছে এই ভাবে পূজা করিতে হইবে। শূন্যের ভিতর হইতে তোমাকে নিরাকার ঈশ্বর উদ্ভাবন করিয়া লইতে হইবে, বিশ্বাস বলে ঈশ্বরকে আপনার আয়ত্ত করিবে, সকল প্রকারের অবলম্বন ছাড়িয়া সংসারের বিষয় সমূহের অতীত হরিকে সন্নিধানে দেখিয়া পূজা করিবে। হরি সর্ব্বত্র সকল স্থানে আছেন এই যে সর্ব্বব্যাপী ভাব, এই ভাবকে সর্ব্বদা মনে রক্ষা করিয়া বিশেষ ব্রত বিশেষ সাধন বিশেষ আলোচনা আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিবে।

পৃথিবীতে আসন পাতিয়া বসিলে এই জন্য যে, যেমন

"সত্যং" এই শব্দ মুখ হইতে বাহির হইবে, অমনি তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া পূজা আরম্ভ করিবে। যাই তাঁহাকে সম্মুখে দেখিতে পাইলে অমনি আর একটী মন্ত্র আসিয়া উপস্থিত। ব্রহ্মপূজার দুই মন্ত্র প্রথম "সত্যং" দ্বিতীয় "জ্ঞানম্।" "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" এই যে মহাবাক্য ইহা সমুদয় মহাবাক্যের সার, সমুদয় শাস্ত্রের সার। এই মহাবাক্য সহকারে স্বরূপ চিন্তা করিতে হইবে। এক একটী স্বরূপ এক একটী কথাতে আছে। একটী শব্দ ব্রহ্মের একটী লক্ষণব্যঞ্জক। এক একটী শব্দে এক একটী লক্ষণ ধরিয়া ব্রহ্ম সাধকের নিকটে পরিচিত হন। জীবমুখবিনির্গত এক একটী কথা, এক একটী মহাবাক্য, ব্রহ্মের এক এক স্বরূপ এক এক অঙ্গ, সাধকের নিকটে প্রকাশিত করে। "সত্যং" এই বাক্য জীবমুখ হইতে নির্গত হইয়া ব্রহ্মের সত্যস্বরূপে প্রবিষ্ট হইল। ঈশ্বর এই বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া বলিলেন "আমি আছি।" তিনি অসৎ নন সৎ, কথা বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া সাধক জানিতে পারিলেন। এই কথা ভিতরে হৃদয়ের মধ্য হইতে ব্রহ্মের বুকের ভিতর গিয়া তাঁহার সৎস্বরূপকে অধিকার করিল। যেমন "সত্যম্" তেমনি "জ্ঞানম্", ব্রহ্ম জড় নন, জ্ঞান। ঈশ্বর নাই তাহা নহে, ঈশ্বর আছেন, সত্যস্বরূপে আছেন যাই নির্দ্ধারণ হইল, অমনি নির্দ্ধারণ হইল তিনি জড়ের ন্যায় আছেন তাহা নহে, তিনি চিৎ। মুখ বলিল "জ্ঞানম্" আর জ্ঞান শব্দের বাণ ঈশ্বরের জ্ঞানরূপকে

বিদ্ধ করিল, ভিতরে দেখি কেবলই জ্ঞান। সত্যমের সত্যে সমুদয় সত্যবান্, জ্ঞানমের জ্ঞানে চারিদিক জ্ঞানময় হইয়া উঠিল।

সত্যকে দেখিলাম জ্ঞানকে দেখিলাম, সত্যের তরঙ্গে জ্ঞানের তরঙ্গে ভাসিলাম, কিন্তু এখনও কূল দেখা গেল না। অনন্ত-বাণ নিক্ষেপ করিলাম, "অনন্তম্" উচ্চারণ করিতে করিতে সমুদয় কূল কিনারা অন্তর্হিত হইল। পূর্ব্বে গঙ্গায় জল ছিল, সমুদ্রের দিকে গমন করিতে করিতে, গঙ্গা ক্রমে বড় হইতে হইতে সাগরের সঙ্গে মিলিত হইল, তার পর ক্রমে দূরে যাইতে যাইতে অকূল সাগরের সঙ্গে মিশিয়া গেল। সত্য ও জ্ঞান তেমনি অনন্ত সত্য অনন্ত জ্ঞান হইয়া আমাদের জ্ঞানের অতীত হইল। কে সেই সত্যকে আর জানিবে, কে সেই জ্ঞানের অন্ত পাইবে, উহার সীমা নাই, উহার অন্ত নাই। ভাবিতে ভাবিতে বেদ বেদান্ত অপরাপর শাস্ত্র সকলে পরাজিত হইল। আমি ও তিনি এই মাত্র বুঝা গেল আর কিছু বুঝা গেল না। উপনিষৎ ভাবিতে ভাবিতে অদ্বৈতবাদে গিয়া দাঁড়াইল।

সাধক ভীত হইয়া আত্মার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, উপনিষৎ অতিক্রম করিয়া প্রেম ভক্তির শাস্ত্র বাহির হইল। হরিলীলা সাধকের নয়নগোচর হইল। এই লীলার কথা বলিতে বলিতে সাধকের চৈতন্য হইল, তখন তিনি প্রেমের বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মঙ্গলময়ের সাক্ষাৎকার হইল।

মঙ্গলময় ভাবিতে ভাবিতে মঙ্গলময় শব্দ হইতে নিত্যলীলা সকল বাহির হইতে লাগিল, পিতা মাতা গুরু সখা প্রভৃতি নানারূপে নানাভাবে প্রেমময় হরি নয়নগোচর হইতে লাগিলেন; হরির প্রেমময় লীলা ভক্ত সন্দর্শন করিয়া সুখী হইলেন। জ্ঞান ও অনন্তের অন্তে ভক্তি ও প্রেম লাভ হইল। প্রেম মন্ত্র মঙ্গল মন্ত্র। আত্মা প্রেমের ভিতরে হরিরূপ দর্শন করিয়া মোহিত হইতে লাগিল। চিত্ত হরিলীলাতে মগ্ন হইয়া হরিকে হৃদয়ের পুতুল করিল।

অনন্তের আরাধনাতে পৌত্তলিকতার ভয় নাই; প্রেমে সেই ভয় উপস্থিত। এখানে পুতুল নির্ম্মিত হইবার আশঙ্কা. কে যেন এই কথা বলিল, ভক্তির পথে অনেক দেব দেবী আসিয়াছে, লীলা ভাবিতে ভাবিতে অনেকে অনেক দেব কল্পনা করিয়াছে। যাই এই ভাব মনে আসিল, অমনি "অদ্বৈত" "অদ্বৈত" এই গম্ভীর শব্দ সাধকের মুখে উচ্চারিত হইতে লাগিল, পৌত্তলিকতার দ্বার বন্ধ হইয়া গেল। যিনি ব্রহ্ম তিনি একমাত্র, যিনি লীলারসময় তিনি এক অদ্বৈত। অনন্তের পর অদ্বৈত আসিলে অদ্বৈতবাদ হইত। তাই প্রেমের ভিতর দিয়া ঠিক সময়ে অদ্বৈতস্বরূপ আসিয়া সমুপস্থিত। এক দিকে প্রহরী হইলেন হরি, আর এক দিকে প্রহরী হইলেন অনন্ত। পৌত্তলিকতা আসিতে পারিল না, অদ্বৈতবাদ উপস্থিত হইল না। হরির একত্ব প্রকাশ পাইল। অনন্তের ভিতর দিয়া মঙ্গল স্বরূপ ভাবিতে ভাবিতে অদ্বিতীয়

আসিল। যখন অদ্বিতীয়ের উপাসনা করি, তখন অদ্বৈতের সঙ্গে অন্যান্য গুণ পরিষ্কার হইল, ঈশ্বর উচ্চ হইতে উচ্চ হইলেন।

যে ভাবটী পৃথিবীর বহির্ভূত পৃথিবীর অতীত, সমুদয় গুণগুলি তাহার সঙ্গে মিলিত হইল, দেবভাব নিষ্কলঙ্কস্বরূপ ধারণ করিল। আমি যে অধম ইহা বুঝি, নিষ্কলঙ্ক পবিত্র-স্বরূপ নিষ্কলঙ্ক না হইয়া কি প্রকারে বুঝিব? আমি "শুদ্ধম-পাপবিদ্ধম্" এই কথা সাধনের ধনুতে যোজনা করিয়া বাণ নিঃক্ষেপ করিলাম, বাণ পৃথিবী হইতে এত দূর উর্দ্ধে উঠিল যে পুণ্যস্বরূপে গিয়া প্রবিষ্ট হইল। বৈকুণ্ঠের বস্তু শব্দ-যোগে মনুষ্যের হৃদয় স্পর্শ করিল, পৃথিবীর মনুষ্য এই শব্দের সোপান দিয়া স্বর্গে আরোহণ করিল।

দক্ষিণে বামে উর্দ্ধে অধোতে দেখ কেবলই পুণ্য, কেবলই পবিত্রতা, কেবলই ধর্ম্ম। এমন অবস্থায় আনন্দবাণ শেষ বাণ নিঃক্ষিপ্ত হইল। যখন ঠিক পুণ্যের ভিতরে সত্য জ্ঞান অনন্ত, প্রেম একত্র মিশিল, সমুদয় এক স্বর্গীয় বর্ণে বিলীন হইল, তখন আনন্দের উদয় হইল। আর বিলম্ব না করিয়া সাধক আনন্দ আনন্দ বলিয়া চীৎকার করিল, মনে মনে সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইল, গভীর আনন্দের জল সাধককে নিমগ্ন করিল। ভিতরে উপরে নীচে গভীর আনন্দ জল বাড়িতে লাগিল, আর তাহার ভিতরে ডুবিয়া গেল।

যখন ভিতরে আনন্দ বাড়িতে লাগিল তখন আরাধনা শেষ

হইল। এখন একাকী নিমগ্ন হইবার সময় উপস্থিত। এখন আরাধনার রাজ্য হইতে ধ্যানের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। যেমন কোন একটা বাড়ীর এক এক অংশ দর্শন করিয়া পরে সমগ্র বাড়ী দেখা হয়, যেমন কোন একটী লোকের একটী একটী গুণ নিরীক্ষণ করিয়া পরে সমষ্টিতে তাহাকে দর্শন করা হয়, যেমন কোন একটী বৃক্ষের শাখা পল্লবাদি দেখিয়া পরে সমগ্র গাছটী প্রত্যক্ষ করা হয়, চিকিৎসায় একটী একটী ঔষধ ক্রমে সেবন করিয়া পরে মূল রোগের ঔষধ বাহির হয়, তেমনি আরাধনায় এক একটী স্বরূপ বিদ্ধ করিয়া তার পর ধ্যানের সময়। এ সময়ে বেদী হইতে মনঃসংযম করিবার জন্য অনুরোধ আইসে। ধ্যানের সময় উপস্থিত, ধ্যানের শঙ্খ ধ্বনিত হইল। তখন ভিন্ন ভিন্ন ছিল, এখন মিলন। এখন সমুদয় স্বরূপগুলিকে এক করিতে হইবে। আরাধনার সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপের এক একটী করিয়া বিদ্ধ করা হইয়াছে, এখন আর তাহা চলিল না। ধ্যান কি? এখন আর হাত পা চক্ষু কর্ণ এরূপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আমি দেখিব না; অর্থাৎ এক মাত্র রূপ একটী ব্যক্তিরূপে হৃদয়ের ভিতরে অবলোকন করিব। একটী মন্ত্রে ঈশ্বরধারণ ধ্যান। ধ্যান একত্র সমুদয় গুণের সমষ্টি। একটী মাত্র আধার, যাহাতে চক্ষু মুখ সকলই আছে। মা কি, ধ্যান তাহা বলে না, কেবল বলে মা। মার কি কি গুণ আরাধনায় বর্ণনা করিব, ধ্যানে কেবল মাকে দেখিব। মার কোন্ কোন্ গুণ ভাবিব, অর্চ্চনা

করিব, আরাধনায় তাহা ঠিক করিব। মার কাছে বসিয়া মা মা মা ভাবিতে ভাবিতে কেমন আনন্দ সাগরে ডুবিয়া যাই, ধ্যান আমাদিগকে ইহা বলে।

আরাধনায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বরূপ চিন্তন, ধ্যানে একত্র দর্শন। আরাধনার পাত্র তিনি, যিনি এক, যিনি অদ্ভুত, যিনি প্রেম, যিনি পুণ্য, যিনি জ্ঞান, যিনি সত্য, যিনি অনন্ত, যিনি আনন্দ। ধ্যানের পাত্র তিনি, যিনি এ সকলের আধার। আরাধনায় আমাদিগকে প্রস্তুত করে, ধ্যান আমাদিগকে সম্পন্ন করে। আরাধনায় আমরা যে যে স্বরূপ বলি, ধ্যানে সে সমস্ত একাধারে দর্শন করিয়া মোহিত হই। আরাধনা, মার চক্ষু মনোহর, মুখ উৎকৃষ্ট, কথা সুমিষ্ট, এইরূপে তাঁহার গুণের কথা বলিল, ধ্যান আর কোন কথা না বলিয়া কেবল বলিল মা, এই মা, ইনি মা, এখানে মা। ও মা বলিয়া সম্বোধন, ইহা ভিন্ন আর কিছুই নাই।

এই স্থানে এই সময়ে মা বলিতে বলিতে নেশা উপস্থিত, ক্রমে নেশা ঘনীভূত হইয়া বাক্যরোধ। আনন্দ যখন অল্প তখন কথা থাকে, যখন আনন্দ উথলিয়া উঠে, খুব মত্ততা জন্মে, তখন বাক্য বন্ধ হইয়া অবাক ধ্যান উপস্থিত হয়, মৌনাবলম্বন উপস্থিত হয়। তখন সাধক মুনি হইয়া একেবারে ব্রহ্মসাগরে ডুবিলেন। যত আস্বাদন করিতে লাগিলেন, তত আরও ডুবিতে লাগিলেন। ভ্রমর যখন প্রথম মধুর অন্বেষণ করে, তখন ক্রমাম্বয়ে গুন গুন করিতে থাকে, যাই

পুষ্প পাইল, তাহার চারিদিকে গুন গুন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল, ভিতরে যখন প্রবেশ করিল, তখন গুন গুন্ শব্দ করিয়া প্রবেশ করিল, যাই মধুপান করিতে লাগিল আর তাহার শব্দ নাই। মুনি যখন ধ্যানে ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন আর তাঁহার কোন শব্দ নাই; কিন্তু যখন তিনি আরাধনা করিতেছিলেন, স্বরূপ সকল নিরূপণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার শব্দ ছিল। ধ্যানে প্রবিষ্ট হইয়া যখন মধুপান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সকল শব্দের নিবৃত্তি হইল।

যখন এইরূপে হৃদয় আনন্দসাগরে খুব ডুবিল, মন সান্ত্বনা লাভ করিল, তখন তৃতীয় রাজ্যে যাইবার জন্য শঙ্খধ্বনি হইল। পাপী মনুষ্য তোমার অনেক অভাব আছে, এখন তোমার প্রিয় দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছ, এখন যাহা চাহিবার চাহিয়া লও। কি বলিলে, এমন সুখের ধ্যান বন্ধ করিতে হইবে? আরাধনা করিয়া সুখী হইয়াছি, কিন্তু ধ্যানে যে একেবারে সুখে মগ্ন হইয়াছি। মগ্ন হইয়াছ তাহাতে কি, ইহার মধ্যে যে তোমাকে চৈতন্য রাখিতে হইবে। এমন বক্ষের ধন পাইলে, এমন সুন্দর হরির পুণ্যময় উজ্জ্বল মুখ জাজ্বল্যমান দেখিলে, আহা, এমন রূপ যে চক্ষু দিয়া প্রেমধারা বহিল, হরি এত নিকটে, নিকটস্থ বন্ধুর নিকটে এখন চাহিবার সুযোগ দেখিতেছ না? এখন প্রার্থনা আরম্ভ কর। তুমি বলিবে, এখন আমার প্রার্থনা কি? আমি বলি তোমাকে এ সময়ে প্রার্থনা করিতেই হইবে। অন্ততঃ

তোমাকে মার নিকটে এ প্রার্থনাও করিতে হইবে, মা তোমার যে সৌন্দর্য্য দেখিলাম, এ সৌন্দর্য্য যেন এইরূপ চিরদিন দেখিতে পাই। পূজার সময়ে এ কথা তোমার বলিতে হইবে, এমন সুন্দর বস্তু যাহা দেখিলাম সংসারে গিয়া যেন ইহা কখন ভুলিয়া না যাই। এখন প্রার্থনা করাই ঠিক অবস্থা।

ধ্যানের পূর্ব্বে, ঈশ্বরকে দেখিবার পূর্ব্বে, প্রার্থনা হইতে পারে না। ঈশ্বরকে দেখিলে তবে মনে একটী আদর্শ উদিত হয়, সেই আদর্শ দেখিয়া বুঝিতে পারি তাঁহার নিকটে কি চাহিব। ধ্যানে বুঝিলাম এমন সুন্দর বস্তু, এমন আহ্লাদের সামগ্রী, ইঁহার সঙ্গে যেন নিরন্তর বাস হয়, পাপ আসিয়া যেন বিরোধী না হয়, বিচ্ছেদ না ঘটায়। মন এই বলিয়া যাই ব্যাকুল হইল, অমনি ধ্যান ছুটিয়া গেল। বিশেষ অবস্থা ধ্যানের অবস্থা, কেন না ইহাতে আদর্শ বোধগম্য হয়। আরাধনায় তাঁহার ভক্তবৎসলতা দীনবৎসলতা বিবৃত হইয়াছে। ধ্যানের সময় হৃদয়নাথ হৃদয়ে প্রকাশিত। এখন মনের অভাব প্রকাশ করা স্বাভাবিক। শব্দ সহকারে মনের কথা মনের ব্যাকুলতা, এ সময়ে উচ্চারিত হইবে, শব্দের আকার ধারণ করিয়া অন্তরের কথাগুলি বাহির হইবে। অনেক শব্দ আছে যাহাতে এই সকল আন্তরিক ভাব প্রকাশ পায়। যেমন আমি নরাধম, অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত, পাপী, দীন, হীন, কাঙ্গাল ইত্যাদি। এই সকল কথাযোগে যখন মনের দুঃখ

জানাই, যত বলি প্রার্থনা তত ভাল হয়, সুমিষ্ট হয়, ভক্তি ও প্রেম বাড়িতে থাকে। ঠিক অন্তরের ব্যাকুলতার বিষয়টী শব্দে প্রকাশ পাইলে তবে প্রার্থনা হয়। প্রার্থনা করিয়া উহার জন্য কি প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব? প্রার্থনা করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাঁহার অশান্তি চলিয়া গেল শান্তি আসিল, তিনিই যথার্থ সাধক তিনি প্রার্থনা করিয়া যথার্থ প্রার্থনার বস্তু পাইলেন। আনন্দ মনে "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ" বলিয়া তিনিই কেবল প্রার্থনা শেষ করিতে পারেন।

অনেকেই ঈশ্বরকে মা বলিয়া থাকে, কিন্তু জানিতে হইবে কেবল মা বলিবার জন্য উপাসনা প্রার্থনা নয়। ব্রহ্মজ্ঞানীরা অনেক সময়ে ঈশ্বরকে উপলক্ষ করিয়া বক্তৃতা করিবার জন্য, আমি কেমন বক্তৃতা করিতে পারি লোককে শুনাইবার জন্য, প্রার্থনা করেন। এ প্রার্থনায় ফল পাইবার প্রত্যাশা রাখিও না। ভাল করিয়া কথা সাজাইয়া ব্যাকরণ শুদ্ধ করিয়া প্রার্থনা করিলাম, তাহাতে বল আর কি হইবে? যে প্রার্থনা অন্তরের ব্যাকুলতার প্রার্থনা সেই প্রার্থনা ঠিক। যেমন আহার, প্রার্থনা তেমনি। আহার করিতে করিতে শরীর সবল সুস্থ বোধ হয়। উপাসনা করিলাম পরে ফল লাভ হইবে, ইহাতে মনের তৃপ্তি হয় না। দূরবর্ত্তী কোন ফল পরে হয় হউক, কিন্তু উপাসনার সঙ্গে কিছু ফল লাভ একান্ত প্রয়োজন। এই জন্য যেমন প্রার্থনা তেমনি স্পষ্ট উত্তর। আরাধনা ধ্যান—চিত্তের উদ্বোধন। যাই ধ্যানে ঈশ্বরালোকে অন্ধকার ঘুচিয়া

গেল, কার নিকটে বলিব স্থির হইল, আনন্দময়ী জননীর প্রতিমা ঠিক চক্ষের সম্মুখে বাহির হইল, প্রার্থনার কথা আপনা হইতে আসিল, প্রার্থনার ফলের বীজ হাত বাড়াইয়া প্রাপ্ত হওয়া গেল।

আমরা ধারে উপাসনা করিতে পারি না। আজ প্রার্থনা করিলাম পরশ্ব ইহার উত্তর পাইব, তত ধৈর্য্য ধারণ আমরা করিতে পারি না। অন্ততঃ আংশিক আজ লাভ করিলাম, কল্য অপর অংশ লাভ করিব। আজ রবিবারে মন্দিরে আসিয়া প্রার্থনা করিলাম, আজ কিছু বাড়ী লইয়া যাইব, বাকি সঞ্চিত রহিল, কল্য সোমবারে না হয় পাইব। অন্য শূন্য হৃদয়ে বাড়ী কেন ফিরিয়া যাইব? এই ভাবে আজকার জন্য একখানি পাত পাতিব। আরাধনাবাণে হৃদয় ঈশ্বরে বিদ্ধ হইল, ধ্যানে চুপ করিয়া মধুপান করিলাম, প্রার্থনার সময় মার মুখপানে তাকাইয়া হাত পাতিলাম, ভিক্ষা দাও। হাত পাতিয়া কি পাইলে দেখাও। দেখ, কিছু না লইয়া যাইও না।

প্রতি দিন যে কয়েকটী উপাসনার অঙ্গের কথা বলা হইল সাধন কর। শুষ্কভাবে উপাসনা পরিত্যাগ কর। নিরাকার ঈশ্বরকে হাতে ধরা বস্তুর ন্যায় ধারণ কর। উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনাতে প্রমত্ত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন কর। নগরে নগরে হরিনাম বিলাও; ভক্তিতে শুদ্ধ এবং পবিত্র হও। যদি সুখী হইতে চাও, প্রকৃত উপাসনা ভিন্ন আর

দ্বিতীয় উপায় নাই। এ সংসারে কেবল এক হরিনামানন্দে সকলে পুলকিত ও মত্ত হয়।

লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মিলন।

রবিবার ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৮০৩ শক ; ২৭শে নবেম্বর ১৮৮১।

হে ব্রহ্মসাধক, একখানি দুর্গা প্রতিমা বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়া আপনার সম্মুখে স্থাপন কর। সেই পুতুল সম্মুখে রাখিয়া যোগের ঐন্দ্রজালিক দণ্ডে তাহাকে স্পর্শ কর; সেই দণ্ড স্পর্শমাত্র দেখিবে প্রতিমাতে যাহা কিছু ভৌতিক আকাশে বিলীন হইয়া গেল। উপরে শ্রীমূর্ত্তি, মধ্যে দুর্গা মূর্ত্তি, পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী। যোগ-বলে দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী এই তিন মূর্ত্তিকে দেহশূন্য মৃত্তিকা বিবর্জ্জিত ভৌতিক লক্ষণ বিরহিত করিয়া অধ্যাত্ম চক্ষে ধারণ কর। মাটীর দুর্গা পড়িয়া গেল, পবিত্র অধ্যাত্ম দুর্গা উঠিল। অসার মাটী উড়িয়া গেল, ভিতর হইতে জ্যোতির্ম্ময় সার সত্য বস্তু দেখা দিল। দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী তিন ছিল, মহেশের ভিতর হইতে তিন উত্থিত হইয়া তিন এক হইয়া গেল। যেমন এক তিন হইয়াছিল, তেমনি তিনে এক হইল। দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী এই ত্রিমূর্ত্তি এক হইয়া সাধকের হৃদয়ে নৃত্য করিতে লাগিল। তিন মূর্ত্তিতে তিন ভাব প্রকাশিত হইল।

এক মহেশ্বরী দুই সখী কোমল হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া উল্লাসিত করে। তিন ঈশ্বর বা তিন ঈশ্বরী নহে। এক ঈশ্বরীই তিন ভাবে হৃদয়ে অবতীর্ণ হইলেন। যখন দুর্গা আসেন তখন লক্ষ্মী সরস্বতীকে পরিত্যাগ করিয়া কখন একা আসেন না। দুর্গা পূজা করিলে, অথচ লক্ষ্মী সরস্বতীর পূজা করিলে না, ইহা হয় না। তিনকে লও নতুবা কাহাকেও লইও না। যদি সকলকে না লও, অকল্যাণ জানিবে। পূর্ণ পূজা করিতে হইলে দুর্গাকে তাঁহার সখী দুই জন সহ বরণ করিতে হইবে। তুমি, তোমার স্ত্রী, ভাই ভগিনী পুত্র কন্যা, সকলে মিলিয়া সখী সহ দুর্গার পূজা কর।

তিন মূর্ত্তির তিন ভাবের অর্থ না করিলে কি প্রকারে সার বস্তু পাইবে। কঠোর প্রকৃতি হইয়া পৌত্তলিকগণকে নির্ব্বোধ বলিলে, আধ্যাত্মিক ভাবে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মপূজা না করিয়া তাহারা অকল্যাণ আনয়ন করিল বলিয়া ঘৃণা করিলে, কিন্তু বল তুমি কি করিলে? তুমি তিন ভাবকে স্বতন্ত্র রাখিয়া কি অকল্যাণের কার্য্য করিলে না? প্রতিমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দুই সখীকে বিদায় করিয়া দিলে, মধ্যে যে মঙ্গলের মূর্ত্তি আছে, যিনি পাপাসুরকে বিনাশ করিতেছেন, তাঁহাকে ঘরে আনিলে, ভাবিও না যে তুমি ইহাতে প্রকৃত কল্যাণ লাভ করিবে।

তুমি মনে করিলে, বিদ্যা এবং বুদ্ধি মহেশ্বরের শক্তি। যে ঘরে ঈশ্বরের এই শক্তি বিরাজ করে, সে ঘরে টাকা ধন

ধান্য থাকিলে তাহারা চলিয়া যাইবে। যেখানে ঈশ্বরের ধন ধান্য বিধায়িনী শক্তির পূজা হইল, সেখানে মুর্খতা ডাকিয়া আনা হইল, বুদ্ধি স্থূল হইল। যেখানে লক্ষ্মীর পূজা, সেখানে যদি সরস্বতীর মন্দির নির্ম্মিত হয়, পণ্ডিত শাস্ত্রের প্রতি বিরক্ত হইয়া সমুদয় শাস্ত্র জলে ফেলিয়া দিবেন। যে ব্যক্তি টাকা উপার্জ্জন করে, ধনাঢ্য, তাহার ঈশ্বরের দিকে অনুরাগ কি প্রকারে হইবে? সে ব্যক্তি ধনের অহঙ্কারে বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ কি প্রকারে রক্ষা করিবে? রাস্তার ভিখারী বৈরাগী ইহাদের ঘরে লক্ষ্মী নাই, কিন্তু ঈশ্বর আছেন।

সর্ব্বত্র দেখা যায়, ধন ধর্ম্মে মিল নাই। পৃথিবীতে সকলের এই সংস্কার, ধনী হইলে সে কখন ধার্ম্মিক হইতে পারে না। তাই ধন উপার্জ্জন করিতে গিয়া পুণ্য যায়, ধনী হইয়া লোকে ঈশ্বরকে ছাড়ে। আবার দেখ সরস্বতী ও লক্ষ্মী ইহাদের মধ্যে চির বিবাদ। বিদ্যা ক্রমে যত বাড়িতে থাকে, লক্ষ্মী তত সে স্থান ছাড়িয়া চলিয়া যান। ঘরে ধন অনেক আন, দেখিবে সে গৃহের যুবকগণ মূর্খ হইবে। ঘরে প্রচুর টাকা থাকিলে বিদ্যা উপার্জ্জনের আবশ্যকতা কেহ বুঝিতে পারে না। ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ এ কথার সাক্ষী। যত ধন বাড়ে, তত লোকে ভাবে বিদ্বান্ হইয়া কি হইবে? যাহার ধন আছে, তাহার সাহিত্য গণিতে কি হইবে? যে জন্য বিদ্যা উপার্জ্জন, যাহা সঞ্চয়ের জন্য বিদ্যা উপায়, সেই

ধন যদি ঘরে থাকিল তবে আর বিদ্যাতে প্রয়োজন কি? লক্ষ্য সিদ্ধি হইলে কে আর উপায়ের প্রতি দৃক্‌পাত করে।

যে পরিবারে ধনের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যে মন্দিরে লক্ষ্মীর অর্চ্চনা হইয়া থাকে, সেখানে সরস্বতীর মন্দির কি প্রকারে স্থাপিত হইবে। সে পরিবারে সরস্বতীর আদর হইবার সম্ভাবনা নাই। ধন সম্পদ যেখানে সমুদয় বাসনা পূর্ণ করিতেছে, যখন যে কামনা উপস্থিত হয়, ধন দ্বারা তখনই তাহা সম্পন্ন হইতেছে, সেখানে আর কামনার বিষয় কিছু রহিল না, পড়া শুনা করিয়া কি হইবে? লোকে বলিয়া থাকে, এক দ্বার দিয়া লক্ষ্মী প্রবেশ করিলে আর এক দ্বার দিয়া সরস্বতী পলায়ন করেন। লক্ষ্মী বা সরস্বতী কেহ কাহার মুখাবলোকন করেন না।

গরিব দুঃখী যাহাদের অন্ন সংস্থান নাই, বিদ্যা তাহাদের গৃহে প্রতিষ্ঠিত। যে বিদ্যা উপার্জ্জন করে, বহু গ্রন্থ পাঠ করে, সে কখন ধনে সুখী হয় না, ধনী সন্তানেরা এরূপ ভাবিয়া বিদ্যার পূজায় বিরত হইল। লক্ষ্মীর শিষ্যগণ সরস্বতীকে বিদায় করিয়া দিল। কোন দেশে যদি অধিক ধন সঞ্চয় হয়, সরস্বতীর অনুচরগণ মনে করেন, সে দেশ শীঘ্র সরস্বতীর অকৃপার পাত্র হইবে। ধন ক্রমে ক্রমে যত বাড়িবে, দেশ তত বিদ্যাবিহীন হইবে। অন্য দিকে আবার যদি বিদ্যা উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয়, পাঠাভ্যাসে ক্রমান্বয়ে অনুরাগ বাড়িতে থাকে, কিসে টাকা আসে সে দিকে আর দৃষ্টি

থাকে না। যেখানে বিদ্যার প্রতি এইরূপ অনুরাগ বাড়ে, সেখানে পিতা মাতা সন্তানগণ আর পড়া শুনা না করে, তাহার জন্য চেষ্টা করেন। কেন না মনে এই বিশ্বাস—সরস্বতীর প্রতি অনুরক্ত হইলে টাকার প্রতি অনুরাগ আসিতে পারে না।

অধিক লেখা পড়া করিলে বা জ্ঞান শিক্ষা করিলে সংসারে ধন উপার্জ্জন হয় না, খাওয়া পরা চলে না। যে ছাত্রের মন ক্রমান্বয়ে গ্রন্থের ভিতরে পড়িয়া আছে, যাহার অন্য বিষয়ে আর জ্ঞান চৈতন্য নাই, লেখা পড়া যাহার নেশার মতন হইয়া গিয়াছে, লক্ষ্মী তাহার বাড়ীতে কখন পদার্পণ করেন না, তাহার প্রতি অলক্ষ্মীর দৃষ্টি পড়িয়াছে। এরূপে সাধারণের বিশ্বাস হইয়াছে যেখানে লক্ষ্মী আসেন, সেখানে সরস্বতী আসেন না, যেখানে সরস্বতী আসেন, সেখানে লক্ষ্মী আসেন না। পড়া শুনা করিলে টাকা বাড়িবে, লেখা পড়া বাড়িলে টাকা কমিবে। চিরকাল লক্ষ্মী সরস্বতীর মধ্যে বিরোধ। আবার এ দুই জনেরই ঈশ্বরের সঙ্গে বিরোধ।

ঈশ্বরপরায়ণ হও, বিদ্যা বুদ্ধির পথে উহা কণ্টক হইবে। ভক্তিমান্ হইলে বিদ্যার প্রতি আর আদর থাকিবে না। শ্রীমদ্ভাগবত বুদ্ধিকে অবমাননা করেন। পণ্ডিত হইয়া যদি কেহ ভক্তিমান্ হয়, তবে তাহার মানের হানি হয়। কাশীতে ভক্তিপ্রচার অসম্ভব, বৃন্দাবনে কখন টোল স্থাপন হইতে পারে না। যোগাভ্যাস করিতে বিচার চাই, কিন্তু তাহাতে ভক্তি হইবে না। জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে গিয়া মন অহ-

স্কারে স্ফীত হইল, আর ভক্তি চলিয়া গেল। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ বাড়িলে আর কেহ ভজন সাধন ছাড়িয়া জ্ঞান উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয় না। ধর্ম্মের পথে জ্ঞান ভক্তির শত্রু। যত মূর্খ হইবে, তত ভক্তি বাড়িবে। যত জ্ঞান বাড়িবে, তত নাস্তিকতা প্রবল হইবে।

যেখানে ব্যাকরণের অধিক আড়ম্বর, সেখানে ধর্ম্মানুষ্ঠান উঠিয়া যাইবে। ভক্তসমাজে যদি কেহ বলেন আমি জ্ঞানী বুদ্ধিমান, তবে তাঁহাকে অভিমানী জানিয়া নাস্তিক অধম দুরাচার পাষণ্ড শব্দে সকলে ঘৃণা প্রকাশ করিবেন। জ্ঞানের অভিমান পরিত্যাগ কর, শাস্ত্র লইয়া বিচার করিও না, বহু গ্রন্থ অভ্যাস করিও না, পুস্তক সকলকে নির্ব্বাসন করিয়া দাও, চুপ করিয়া সাধন ভজন কর, তাহা হইলে ভক্তিধন উপার্জ্জন করিতে পারিবে। লেখা পড়া কর, ধর্ম্মের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হও, গ্রন্থ স্পর্শ কর, ঈশ্বর পলায়ন করিবেন। ভক্ত টাকা কড়ির সম্বন্ধ রাখিতে বীতরাগ। ভক্ত টাকা উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হন না, চাকরী করেন না। ব্যবসায় বাণিজ্য, ধনার্থ চেষ্টা, উত্তম সামগ্রী আহার, ধনের সহিত সম্বন্ধ, ভক্তি পথে কণ্টক। যেখানে ধনের সমাগম, সেখানে ঈশ্বর কেন আসিবেন? যেখানে বেশ ভূষার সমধিক আড়ম্বর, সেখানে ঈশ্বর নাই। লক্ষ্মীর প্রবেশ, বিবেক ও ঈশ্বরের পলায়ন। হয় সমুদয় ধন ছাড়িয়া ফকির হও, না হয় সংসারী হও। ধর্ম্মে এই প্রকারে তিনের মধ্যে

বিবাদ। তিনকে তিন মানিলে এই প্রকার হইবে। যদি ব্রাহ্ম হইয়া এই প্রকারে পৌত্তলিকতার দোষে দোষী হও, তবে ঘোরতর অখ্যাতি হইবে।

দেবীমূর্ত্তি তিন মূর্ত্তিতে প্রকাশিত। যদি এই তিন মূর্ত্তির ভাব খণ্ড খণ্ড করিয়া ত্রিমূর্ত্তি স্থাপন কর, সেই খণ্ড খণ্ড মূর্ত্তির একত্র সংযোগে এক মূর্ত্তি নিষ্পন্ন করিতে না পার, তাহা হইলে সচ্চিদানন্দময়ের পূরণ হইল না। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তিন এক, তিনের মধ্যে বিবাদ তোমার কল্পনা। তোমার দুষ্ট বুদ্ধি তিনের হাতে খাঁড়া দিয়াছে, তিনের মধ্যে সংগ্রামের চেষ্টা তুমি করিয়াছ। ঈশ্বরের তিন ভাবের মিল আছে, সৌহার্দ্দ আছে। সহচরী সহ চিরদিন সকলে দুর্গাপূজা করিয়াছে, শত্রুতা থাকিলে এরূপ কেন হইবে? আচ্ছা যদি শত্রুতাই থাকে, তবে জিজ্ঞাসা করি, তিন এক সময় আসেন, না একজন আসেন গৃহে থাকিলে, আর একজন আসেন বনবাসী হইলে? এক ঈশ্বরে তিনের মিলন হইয়াছে। যিনি ঈশ্বর তিনিই লক্ষ্মী তিনিই সরস্বতী, ঈশ্বর কখন লক্ষ্মী ছাড়া অলক্ষ্মী নহেন, জ্ঞানহীন বুদ্ধিহীন অবিদ্যা নহেন। দুর্গাকে স্থাপন করিতে হইলেই তাহার সখীদিগকেও স্থাপন করিতে হইবে। ভক্ত তিনেরই ভাব একত্র স্থাপন করেন। কৈলাস হইতে যখন দুর্গা নামিলেন, দেখ সহচরী তাঁহার সঙ্গে আছে। তিনের মধ্যে নিত্যকালের যোগ।

দুর্গাকে ডাকিলে দুর্গতি নাশ হয়, জ্ঞান হয়, ধন সম্পদ হয়। বুদ্ধি যেখানে সম্পদ সেখানে। মনকে আলোকিত করিলে সমস্ত সংসার আলোকিত হয়। সরস্বতীর আগমনে লক্ষ্মীর আগমন, বুদ্ধি কখন লক্ষ্মীর বিরোধী নহে। ভক্তি-শাস্ত্র যে বিদ্যা বুদ্ধির প্রতি চটেন, সে বিদ্যা অবিদ্যা, সে বুদ্ধি কুবুদ্ধি। ভক্তিশাস্ত্র অবিদ্যাকে আক্রমণ করে, কুবুদ্ধিকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে যত্ন করে। যে পুস্তকে দুষ্ট বুদ্ধি আছে, তাহা পাঠ করিও না। যাহা স্পর্শ করিলে নাস্তিকতার স্পর্শ হয়, সেই ভয়ানক বিষ স্পর্শ করিতে সংসারে সকলেরই ভয় হইবে। এই বিষ পরিহার করিবার জন্যই বুদ্ধিসম্পর্কে এত কথা। দুষ্ট বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সুবুদ্ধি পরবশ সকলকেই হইতে হইবে। সুবুদ্ধি বলিল, কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না, কিন্তু তোমার ভাবনা উপ-স্থিত—কল্যকার জন্য চিন্তা না করিলে পরিবার সকলে আহার বিনা মরিয়া যাইবে। আমি বলি, তোমাতে দুষ্ট বুদ্ধির আবির্ভাব হইয়াছে। যখন ধর্ম্মশাস্ত্রের সঙ্গে ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার জ্ঞানের মিলন নাই, জানিবে তোমাতে কুবুদ্ধি উপ-স্থিত। ঈশ্বরকে ভক্তি কর, তাঁহার সেবা কর, কিন্তু তাহাতে কল্য কি খাইবে তাহা পাইবে না, যখন এই প্রকার চীৎকার ধ্বনি উপস্থিত হয়, তখনই জানিতে পারি আমার ভিতরে এ সুবুদ্ধি নয় কুবুদ্ধি।

সরস্বতী ছাড়াও আবার দুষ্টা সরস্বতী আছে, ইহা জানিয়া

ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। আমাদের বুদ্ধি হইতে কুবুদ্ধিকে দূর করিয়া দিতে হইবে। এক বস্তু চলিয়া গেলে মন কখন শূন্য থাকিবে না। দুষ্টা সরস্বতী চলিয়া গেলে বুদ্ধি বিচার বিবেচনা সমুদয় আর সেরূপ থাকিবে না। এইরূপে ধর্ম্ম করিয়া যত দুঃখ হইতে হয় হউক, যত মানহীন হইতে হয় হউক, যত কষ্ট পাইতে হয় প্রাপ্ত হওয়া যাউক, তথাপি এইরূপে ধর্ম্ম আচরণ করিতে হইবে, এরূপ বুদ্ধি শুভ বুদ্ধি। বিদ্যা শিক্ষা করিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি যদি কুতর্কপরায়ণ হয়, তবে সে দুরাচারী। সরস্বতী দুই, এক ঈশ্বরের নিত্যসহচরী, আর এক ঈশ্বরের শত্রু। জ্ঞান যদি ঈশ্বরের বিরোধী হয়, তবে তাহা অজ্ঞান, অবিদ্যা, দুষ্টা সরস্বতী। জ্ঞান বিদ্যা সরস্বতীর ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্য মিল আছে।

লক্ষ্মীও দুই, এক ঈশ্বরের সঙ্গে চিরমিলিতা, আর এক ঈশ্বরের বিরোধিনী। ঈশ্বরের বিরোধিনী লক্ষ্মী অলক্ষ্মী। যেখানে টাকা আলস্য বৃদ্ধি করে, নানা প্রকার অসদুপায়ে ধন উপার্জ্জিত হয়, সেখানে ধর্ম্ম নাই। সমুদয় দিন খুব টাকা উপার্জ্জন করিলে, সন্ধ্যার সময় আসিয়া উপাসনা করিতে পারিলে না, বাড়ীতে আসিয়া সকলের প্রতি বিরক্ত হইতে লাগিলে। যিনি ঈশ্বরের লক্ষ্মীশক্তির অনুসরণ করিয়া ধন উপার্জ্জন করিলেন, তাঁহার এরূপ ভাব কখন হইতে পারে না। যে ব্যক্তি উপার্জ্জন করিতে গিয়া ধর্ম্মবিরোধী হয়, বিরক্ত হয়, ক্রোধ পরবশ হয়, নির্যাতনে প্রবৃত্ত হয়, হিংসায় অধীর

হয়, কুপ্রবৃত্তির অধীন হয়, সে কখন লক্ষ্মীপূজা করে নাই, অলক্ষ্মীর পূজা করিয়াছে। লক্ষ্মী প্রসন্না হইয়াছেন এজন্য গৃহে টাকা আসিল সকলে স্বীকার করে, কিন্তু টাকার সঙ্গে সঙ্গে যে অলক্ষ্মীকে ডাকিয়া আনা হয়, ইহা অনেকে বুঝিতে পারে না। যেখানে অধর্ম্ম কুনীতি প্রবল সেখানে লক্ষ্মীর আবির্ভাবের সম্ভাবনা নাই। যখন লক্ষ্মী আসেন, তখন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকারের ধর্ম্ম সমাগত হয়, সদ্বুদ্ধি খুলিয়া যায়। সমুদয় অসদ্বিষয় ছাড়িলে তবে লক্ষ্মী আগমন করেন।

কল্যকার জন্য ভাবিও না, কিন্তু ধর্ম্ম ও স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, তোমাদিগকে সকলই প্রদত্ত হইবে, এই কথা ঠিক হইল। 'কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না' এই বিশ্বাসে সকল দিক রক্ষা পায়, পৃথিবীর লোকেরা ইহা শুনিয়া হাসিয়া উড়াইবে। এই সকল লোকের বুদ্ধি নয়, গণিত বিদ্যা; ইহারা কেবল গণনা করিয়া জীবনকে ভারগ্রস্ত করে। ঈশ্বরের হস্তে বিশ্বের ভার, ঈশ্বরের হস্তে প্রত্যেক সংসারের ভার। যে সংসারের ভার ঈশ্বরের হস্তে অর্পণ করিল, সেই বৈরাগ্য পালন করিল। তাহার চক্ষু লক্ষ্মী সরস্বতী বিবেক। লক্ষ্মীর আবির্ভাবে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া সে নিশ্চিন্ত হয়। সংসারে যে ব্যক্তি খুব বুদ্ধিমান, সে ব্যক্তি আগে সঞ্চয় করে। সঞ্চয় না করিলে লোকে তাহাতে অলক্ষ্মী দেখে। কিন্তু হে ব্রাহ্ম,

তুমি কেবল পূজা কর, পূজা করিলে তোমার মনে সুবুদ্ধি উপস্থিত হইবে।

পৃথিবীর ভিতরে টাকার পথ দেখাইতে কেবল ঈশ্বরই পারেন। তিনি যে পথ দেখাইবেন তাহাতে নিশ্চয় লক্ষ্মী-সমাগম হইবে। তোমার ঘর লক্ষ্মীর ঘর হইবে। লক্ষ্মী বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতী অধিষ্ঠিতা হইবেন। যত ভক্তি বৃদ্ধি ও বিশ্বাস বৃদ্ধি হইবে, তত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান হইবে। যত জ্ঞান বুদ্ধি বাড়িবে, তত ঈশ্বরে ভক্তি বাড়িবে। কখনও মনে করিও না বিষয়ে ফল নাই। যে গৃহে ঈশ্বরের পূজা হয়, দুর্গাপূজা হয়, সে গৃহে দুর্গার সখীদ্বয় আসেন, একজন জ্ঞান দেন, একজন সম্পদ দেন। সংসারে টাকা যতটুকু হইলে সংসারের কষ্ট মোচন হয়, তৎসমুদয় অবশ্য যোগাইবেন। ঈশ্বর আপনার রাজ্য সংস্থাপন করিবেন, তাঁহার রাজ্যে দুঃখ দারিদ্র্য কষ্ট কখন থাকিতে পারে না। লক্ষ্মী সর্ব্বদা ভক্তিকে সহাস্য রাখিবেন, লক্ষ্মীভক্ত সর্ব্বদা অল্পে সন্তুষ্ট থাকিয়া সমধিক লাভ করিবেন।

প্রসন্ন-মুখ সর্ব্বদা লক্ষ্মীর অনুগ্রহ প্রকাশ করে। লক্ষ্মীর অনুগ্রহে যেমন সম্পদ লাভ করে, তেমনি বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সরস্বতীভক্ত নৃত্য করে। লক্ষ্মী আর সরস্বতী পরস্পর মিলিত হইয়া একত্র পরম মহেশ্বরের সঙ্গে প্রকাশিত হন। যাহারা সর্ব্বজনপরিত্রাতা মহেশ্বরের শরণাপন্ন হয়, তাহারা মুক্তি সঞ্চয় করে। তুমি অধ্যাত্ম নয়নে এই মূর্ত্তি দর্শন কর।

চিন্ময় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তোমার বিশ্বাস কমিল না ত বাড়িল। জ্ঞানের আকারে ধন ধান্যের আকারে লক্ষ্মী ও সরস্বতী তোমার নিকটে উপস্থিত হইলেন। চিন্তাতে টাকাতে এখন আর কিছুই নাই, কেবল ঈশ্বরের পবিত্র ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বত্র কেবল হরির ছবি মার ছবি প্রকাশিত। কেমন হরির প্রেম সর্ব্বত্র দেখিতেছি, কেমন প্রেম তিনি দেখাইতেছেন। হরি সর্ব্বদা রক্ষা করিতে-ছেন আর ভয় কি?

মা যখন আসিলেন তখন দুঃখ ভাবনা সকলই চলিয়া গেল। লক্ষ্মী আপনি ভক্ত সন্তানগণকে পালন করিতে লাগিলেন। ভক্তে আর অলক্ষ্মী বা অবিদ্যা থাকিবার সম্ভা-বনা রহিল না। মা আপনি শত শত বুদ্ধি দিবেন। আমি মূর্খ স্বীকার করি, কিন্তু আমার মা বড় বড় দুর্ব্বোধ বিষয় আমাকে অত্যন্ত সহজে বুঝাইয়া দেন। আমার বুদ্ধি আমার মাতা, আমাকে অন্যের নিকটে জ্ঞান শিখিতে হয় না। আমি যদি অন্যের নিকটে পুস্তক না পড়ি, আমার মা বিদ্যার জাহাজ, জ্ঞানের সমুদ্র, সেইখান হইতে এক বিন্দু লাভ করিলে আমার যথেষ্ট। আমি সামান্য ধন বা জ্ঞানের জন্য কেন ক্রন্দন করিব, সম্মুখে সমুদ্র থাকিতে কে তৃষ্ণায় কাতর হয়? পৃথিবীর নিকটে কোন ধন মানের আকাঙ্ক্ষা রাখি না, বিষয়ীর ন্যায় ধন উপার্জ্জনেও ব্যস্ত নই, যে উপায় ভাল, হরি তাহা আপনি করিয়া দিবেন। তিনিই

পড়াইবেন, তিনিই বুদ্ধি দিবেন। পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া উপাধি প্রাপ্ত হইতে চাই না, তাঁহার বিদ্যালয়ে বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া প্রকৃত বিদ্যায় বিদ্বান্ হইব।

ধন সম্পদ শান্তি সুখ স্বচ্ছন্দতা সকলই আমাদের তাঁহার নিকটে। বাজারে মহাজনদিগের ন্যায় আমরা বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইতে চাই না, কোন ব্যবসায় করিতে চাই না, স্বয়ং হরি আমাদিগের সমুদয় ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। ভক্তের ঘরে খাওয়া দাওয়া সকল বিষয়ের সুশৃঙ্খলা। ভক্ত কেবল হরির কার্য্য করেন, তাঁহার চরণ সেবা করেন, আর আকাশ হইতে তাঁহার গৃহে ঝুপ্ ঝাপ্ করিয়া টাকা পড়িতে থাকে। ভক্ত কেবল জয় হরির জয়, জয় হরির জয় বলিয়া যত নাচেন, যত হরিনামে মত্ত হন তত বিদ্যা ও ধন প্রাপ্ত হন, ঘরে বসিয়া তাঁহার সমুদয় বিষয়ে সুব্যবস্থা হয়। আইস সকলে মিলিয়া কেবল হরিনাম করি, ব্রহ্মনাম করি, তাঁহার চরণ-তলে প্রণিপাত করি, তাঁহাকে ডাকি, তাঁহার পূজা করি, ধন ধান্য বিদ্যা সকলই আমরা আমাদিগের হৃদয়মধ্যে সঞ্চয় করিব।

ভাই অঘোর নাথ।

রবিবার ২০শে অগ্রহায়ণ, ১৮০৩ ; ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮৮১।

ঈশ্বরের ইচ্ছা হইল, পৃথিবীকে পরিত্রাণ করিবেন। যেমন ইচ্ছা হইল, অমনি এক মূর্ত্তি সাদা এক মূর্ত্তি কাল

দেখা দিল। ঈশ্বর গভীর নিনাদে বলিলেন, আমি সাদা ও কালকে ভেদ করিব এবং এই দুটীকে জীবের স্বর্গগমনের দুই পথ করিব। অমনি দুই পথ তৎক্ষণাৎ পৃথিবী মধ্যে প্রমুক্ত হইল। একটী সূর্য্যের ন্যায় সাদা, আর একটী কাল ঘোর অন্ধকার। যেমন ঈশ্বর বলিলেন, পৃথিবী, অদ্য হইতে সাদা ও কালর মধ্য দিয়া তোমাকে গমন করিতে হইবে, অমনি সমুদয় জীব সেই সাদা ও কালর মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং তাহার মধ্যে ক্রীড়া করিতে লাগিল। ঈশ্বরের প্রেম হইতে জগতে দুই বস্তু উৎপন্ন হইল, এক লোভ আর এক ভয়; এক সুখ আর এক দুঃখ। ভাবিও না, ব্রহ্মসাধক, ইহার একটীর সমাদর করিবে, অপরটীকে ঘৃণা করিবে। অন্ধকার দেখিয়া ভীত হইও না। নববিধান আলোককেও প্রণাম করেন, অন্ধকারকেও প্রণাম করেন। সাদা রংও তোমার পূজনীয়, কাল রংও তোমার স্তবনীয়। কাল ভাল বই কখন মন্দ নয়। অর্দ্ধভাগ জ্যোতি, অপরার্দ্ধভাগ অন্ধকার। যেমন দেবীর পূজা করিবে, তেমনি কালীরও পূজা করিবে। এক দিকে জীবন ক্রীড়া করিতেছে, আর এক দিকে মৃত্যু খেলা করিতেছে।

যখন আমাদিগের ঈশ্বর জীবের পরিত্রাণের জন্য এই দুই বিরুদ্ধ ভাব উৎপন্ন করিলেন, তখন বাহ্যিক রোগ শোক, সুখ দুঃখ, মৃত্যু জীবন দেখিয়া ইহাদিগকে প্রভেদ করিতে পার না। আমরা একান্ত মূর্খ নই, অবিশ্বাসী নাস্তিক নই

যে অৰ্দ্ধভাগ গ্রহণ করিব, অপরার্দ্ধ পরিত্যাগ করিব। মৃত্যুকে দেখিয়া মূর্খেরাই বিকম্পিত হয়, ভীত হয়। কিন্তু ভয়ানক মৃত্যুই পরিত্রাণের সেতু। ঈশ্বরের সুন্দর মুখ দেখিলে লোভ হয়, অন্ধকার মৃত্যু দেখিলে লোকে ভয় পায়, কিন্তু অন্ধকার আমাদিগের পরম উপকারী। বালক অন্ধকার দেখিলে ভীত হয়, কিন্তু ভীত শিশু মার ক্রোড় আরও আঁকড়াইয়া ধরে। আলো থাকিলে শিশু যে সুন্দর বস্তু দেখিতে পায় তাহা লইয়া ব্যস্ত থাকে, কিন্তু অন্ধকার আসিলে, আলোক হরণ করিলে, আলোক নাই দেখিয়া শিশু মা মা বলিয়া বাহির হইতে দৌড়িয়া মার নিকটে আসে, দুই কোমল হস্তে মার স্তন ধারণ করিয়া কেবল মা মা বলিতে থাকে। শিশুর মা মা বলাতেই সুখ। এ সুখের কারণ ভয়। ভয়ে মার কোলে গিয়া সে আর অন্য নাম করে না; জননীর স্তনের দুগ্ধ ভিন্ন অন্য কিছু চায় না।

দয়াময় পৃথিবীর লোককে ভীত করেন। তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিবার জীবন এক দ্বার, মৃত্যু আর এক দ্বার। এক দিক হইতে ভয় তাড়াইয়া মৃত্যুর দ্বারে প্রবিষ্ট করে, আর এক দিক হইতে লোভ জীবনের দ্বারে তাড়াইয়া আনে। দুঃখ আক্রমণ করিলে আমরা ঈশ্বরকেই অন্বেষণ করি, সুখ লাভ করিলে আমরা ঈশ্বরকেই ডাকি। মৃত্যুভয় ভীত করে বলিয়া আমরা অভিযোগ করিতে পারি না। ব্রহ্মোপাসনার আলোকে আমরা অন্ধকারের ভিতর ব্রহ্মপুরী অবলোকন

করিব। অন্ধকারে দেবদর্শন,—ব্রহ্মসমাধির এই তত্ত্ব। ভয় হয় আর সাধকের পূর্ণ যোগ হয়। দুঃখ পাইয়া যোগী হয়, মানহানি ধনহানি সন্তানহানি হইলে আরও হয়। টাকা আসিল, বন্ধু পাইলাম, সুখের পরিসীমা না, তাহাতেও ঈশ্বরকে পাইলাম। এক হাতে সুখ এক হাতে দুঃখ ধারণ করিব। সুখ দুঃখ দুই মার কাছে লইয়া যায়। দক্ষিণ হস্ত ধরিল জীবন ও সুখ, মৃত্যু ও শোক বাম হস্ত ধরিল। ইহারা টানিয়া মার কাছে লইয়া চলিল। এক হস্ত উৎসুক হইয়া সুখের বস্তু ধরিল, আর এক হাত রোগ শোক কলহ বিবাদ প্রভৃতি পৃথিবীর দুঃখ ধরিল। দীনতার কর ধরিয়াও মার নিকটে যাইব। ধনের কর ধরিয়াও মার নিকটে যাইব। সুখে আমোদিত হইয়াও মাকে মনে পড়ে, দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতেও মাকে মনে পড়ে।

আমাদের হৃদয়ের ভাই অন্ধকার করিয়া হঠাৎ অকালে পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। সাধু তিনি, তিনি চলিলেন। হঠাৎ দুর্ঘটনা আসিয়া ঘটিল ইহা আমরা বলিব না, এ কথা আমরা কখন মুখে আনিব না। বন্ধুবিয়োগ বন্ধুবিচ্ছেদ গভীর ঘটনা। ঘটনার পর ঘটনা চলিয়া যাই-তেছে, আমরা কি কেবল সাগরের ধারে বসিয়া ঢেউ গণনা করিব? বন্ধুর মৃত্যু হইল বলিয়া কি আমরা এমত ভাবে কাঁদিব যে কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিতে ভাবিতে অবসন্ন হইয়া পড়িব? আমাদের বন্ধুকে কে বক্ষ হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া

গেল এই বলিয়া কি কাঁদিব ? পাঁচটী ভাই আমরা ছিলাম, যম আসিয়া তাহার একটীকে চুরী করিয়া লইয়া গেল, যাঁহার শরীর সুস্থ, নবীন যৌবন; যিনি অত্যন্ত প্রতাপ ও মহিমা সহ কার্য্যক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়া প্রেরিতজীবন দ্বারা বলপূর্ব্বক সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ দুঃখিত, ব্রাহ্মমণ্ডলী শোক করিতেছে, দুঃখিনী বিধবা ও নিরাশ্রয় সন্তান সন্ততি কাঙ্গালের ন্যায় কাঁদিতেছে।

"হায় হায়" শব্দ পড়িল, কেবল রোদনের ধ্বনি, চারিদিক অন্ধকারময়। এখন শোকে সকলকে নিমগ্ন করিয়া ঈশ্বর কি অবিচার করিলেন ? এমন বন্ধু আমরা হারাইলাম। ঈশ্বর কি এত অবিচার করিতে পারেন ? বাছিয়া বাছিয়া সাধু অঘোরকে টানিয়া উপরে লইয়া গেলেন। এ কেমন কথা ? এই কি তাঁহার মনে ছিল যে, পরিবার বন্ধু বান্ধব সকল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, অকালে অঘোরের জীবন হরণ করিবেন, ভক্তমণ্ডলীর মস্তকের মুকুট কাড়িয়া লইবেন ? তিনি স্ত্রীকে এত শীঘ্র বৈধব্যদুঃখে নিঃক্ষেপ করিলেন, সন্তান সন্ততিগণকে পিতৃহীন করিলেন, এতই কি তাঁহার অবিচার ? তাঁহার প্রাণের মধ্যে কি এত নিদারুন অবিচারের ভাব উদিত হইবে ? তাঁহাতে কি আমরা 'নিষ্ঠুর' শব্দ প্রয়োগ করিব ? আমাদের বিশ্বাস হয় না আমাদের যিনি আনন্দময়ী মাতা, প্রেমময়ী যাঁহার নাম, তিনি কখন নিষ্ঠুর হইতে পারেন, তিনি কখন স্বর্গের সিংহাসনে বসিয়া অবিচার করিতে

পারেন। আমাদের মা মঙ্গলময়ী, আমরা সর্ব্বত্র মঙ্গল অন্বেষণ করি, আমরা যে আমাদিগের মাকে ভালবাসি। এই গুরুতর ঘটনা কেন হইল আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মমন্দিরের নিকট অমঙ্গল নাই; বুঝিতে হইবে বন্ধু কেন গেলেন।

বিদেশে লক্ষ্ণৌ নগরীতে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন, আর দেশে ফিরিয়া আসিলেন না। দেশে আসিয়া তাঁহার মনের কথা কাহারও নিকটে বলিতে পারিলেন না। আর পৃথিবীতে কেহ তাঁহাকে দেখিবে না। ১১ই মাঘের উৎসব আসিতেছে, আর উৎসব করিবার জন্য তিনি ফিরিয়া আসিবেন না। সকলেই উৎসবে আসিবেন, আমরা কেবল তাঁহাকেই তাঁহাদিগের মধ্যে দেখিতে পাইব না। আর তাঁহাকে পৃথিবীতে কাছে বসাইব না। আর সেই ভাইয়ের সঙ্গে একত্র বসিয়া এখানে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিব না। আর তাঁহার সঙ্গে পৃথিবীর সম্বন্ধ রহিল না। সকলের স্থান ও আসন পূর্ণ, কেবল অঘোরের স্থান ও আসন খালি থাকিল। হায়, ব্রাহ্মসমাজ এই প্রথম নিদারুণ শোকের সংবাদ শুনিল। ভ্রাতৃবিয়োগ কি, এত দিনে বুঝা গেল। এমন মনে ছিল না যে অঘোর আমাদিগকে এত শীঘ্র ছাড়িয়া যাইবে। আমরা এ বিষয়ে কিছুমাত্র তো প্রস্তুত ছিলাম না। ভ্রাতৃবিচ্ছেদের দুর্ব্বিবহ যন্ত্রণা আসিয়া হঠাৎ আঘাত করিল। এ সকল দুঃখের কথা লইয়া বন্ধুর সঙ্গে যে আলাপ করিব তাহারও উপায় নাই।

যাউক, এ সকল দুঃখের কথা তো সংসারের কথা। দুঃখের কথা বলিয়া ফল কি? মার নামকে তো নিরপরাধ রাখিতে হইবে, এই চিন্তাই এখন প্রবল। এরূপ ব্যাপার তো অকস্মাৎ ঘটে না। আমরা শোকের গরল পান করিয়া আত্মাকে নাস্তিক করিব না। ইহার মধ্যে ঈশ্বরের অভি-প্রায় আছে, শোক পরিত্যাগ কর, স্থির হও, কাঁদিও না। সকলকে দুঃখী করিয়া ভাই কোথায় গেলেন জান? ভাবিয়া দেখ, একজন আগে না গেলে সেখানকার ঘর পরিষ্কার করিবে কে? অবশেষে তোমাদিগের সকলকে যাইতে হইবে। তোমাদিগের যাইবার পূর্ব্বে একজন জানা শুনা লোকের যাওয়া অসঙ্গত নহে। আমাদিগের মধ্যে একজন আয়োজন করিবার জন্য অগ্রে গেলেন। কেমন লোক গেলেন? যিনি যোগধর্ম্ম সাধন করিয়াছিলেন। নির্জ্জনে যোগধর্ম্ম সাধন করিতে প্রিয় অঘোর যেমন জানিতেন, তুমি আমি তেমন জানি না। তাঁহার জীবন যোগপ্রধান ছিল, কিন্তু মধুর ভক্তির পথই বা তাঁহার মতন আর কে জানে? তাঁহার মতন কে আর আমাদিগের মধ্যে স্বর্গে অগ্রগামী হইবার উপযুক্ত?

প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে, মহর্ষি ঈশা মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, আমি পিতার বাড়ী যাইতেছি, তোমাদিগের সকলের জন্য বাড়ী প্রস্তুত করিয়া রাখিব। আমাদিগের অগ্রগামী সাধু হরিনাম করিতে করিতে দৌড়িয়া মার নিকটে গেলেন। গিয়া বলিলেন, "মা, আমি আমার পৃথিবীর কার্য্য

করিয়া আসিলাম। আমি আসিলাম, আরও তোমার সন্তানেরা আসিতেছে, তাহাদিগের জন্য অন্নপাত্র প্রস্তুত কর। কলস কলস অমৃত রাখিয়া দাও। তাহারা ভারি অন্নপ্রিয়, তাহাদিগের অল্পে হয় না। ১১ই মাঘ আসিতেছে, তুমি জান মা তাহারা উৎসবে কেমন মাতে। ঐ ঘরে দলে দলে সহস্র সহস্র লোক আসিয়া যাহাতে বাস করিতে পারে তেমন করিতে হইবে। লোকগুলি আর কাহাকেও চায় না কেবল তোমাকেই চায়। তাহারা তোমা ছাড়া মধ্যবর্ত্তী চায় না, তারা দুটী বেলা তোমার নাম কীর্ত্তন করে। তোমার ছেলেগুলি কলিকাতায় ভারি কীর্ত্তন করে।"

অঘোরের সোজা সোজা ছেলে মানুষের মত কথা এখনও আমাদের স্মরণ আছে। সেই প্রকার সুমিষ্ট কথায় সে মাকে সকল কথা বলিতেছে। অগ্রগামী ভাই সেখানে গিয়া আমাদিগের জন্য ঘর প্রস্তুত করিবার সমুদয় যোগাড় করিতেছেন। যাঁহারা এখানে আছেন, তাঁহারা সেখানে গিয়া বাস করিবেন। পিতার নিকটে বলিয়া তিনি সুখের সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিবেন। তাঁহার সমুদয় দেখা রহিল। আমাদিগকে যখন যাইতে হইবে তখন তিনি সেখান হইতে আসিয়া আমাদিগকে লইয়া যাইবেন। তিনি দেখিয়া শুনিয়া গিয়াছেন, তিনি পথ চিনিয়াছেন, তিনি সেখান হইতে আবার আমাদিগের মধ্যে আসিবেন, আসিয়াছেন। স্বর্গে যে সকল অশরীরী আত্মা আছেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে বসিয়া তিনি তাঁহাদিগের ভ্রাতা

হইয়াছেন। আর আমরা তাঁহার হাত ধরিতে পারিব না, এখানে তাঁহার সঙ্গে সুখে আলাপ করিবার সম্ভাবনা নাই, আর তিনি আমাদিগের বক্তৃতা উপাসনার সঙ্গী হইবেন না, এ সমুদয় ঠিক। কিন্তু ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে আমাদিগের অন্তরের যোগ জন্মেও শেষ হইবার নহে।

তাঁহার শরীর ছিল, এখন তিনি অশরীরী হইয়াছেন, কিন্তু সেই ভালবাসা আছে। সেই অঘোর আজও আমাদিগের বক্ষে আছেন। বাহিরে যে বন্ধু ছিলেন, ঘরে যে বন্ধুকে আমরা দেখিতাম, সেই বাহিরের বন্ধু বুকের ভিতরে আসিলেন, সেখানে চিরস্থায়ী হইলেন, শরীরহীন আত্মা প্রাণের ভিতরে আশ্রয় করিলেন। এখান হইতে স্বর্গে পত্র পাঠাইতে হইলে, স্বর্গের পথ চেনা আছে, অঘোর স্বর্গে চিঠি পঁহুছাইয়া দিবেন। ভাইয়ের ভিতর দিয়া, তাঁহার চরিত্র স্বভাবের ভিতর দিয়া, আমাদিগের আবেদন স্বর্গে পঁহুছিবে। সে লোকটীর চরিত্র আমাদিগের সমুদয় কথা বহন করিবে। এ সুন্দর চরিত্র ছবি নয়, কল্পনা নয়, ইহা যথার্থ এবং স্থায়ী। ইহা সময়ে লীন হয় না, শরীরের সঙ্গে ধ্বংস হয় না। তিনি এখনও আমাদিগের বুকে চরিত্ররূপে নিবিষ্ট। তিনি পৃথিবীতে যোগ শিক্ষা করিতেন। হিমালয়, তিনি তোমার মুসুরী মরী পর্ব্বতকে আবাস স্থান করিয়াছিলেন, তিনি তোমার অতি প্রিয় বন্ধু ছিলেন। হিমালয়, একালে অঘোর যেমন তোমার বন্ধু, তেমন বন্ধু বোধ হয় আর আধুনিক-

দিগের মধ্যে কেহ নাই। সোমবার মঙ্গলবার বুধবার সমুদয় সপ্তাহ ভাই অঘোর হিমালয়ের বুকের ভিতরে গর্ত্তের মধ্যে, যেখানে মনুষ্যের চক্ষু কর্ণ যায় না, সেখানে যোগ ধ্যানে সময় কাটাইতেন। নিভৃত হিমালয়ে প্রশান্ত ভাবে ঈশ্বরেতে তিনি নিমগ্ন থাকিতেন।

আজও দেখিতেছি আমার জ্যেষ্ঠ আমার পিতা অঘোর সেখানে বসিয়া আছেন। বর্ত্তমান কালের ঋষিজীবন তাঁহারই। টাকার আকর্ষণ, পৃথিবীর পরিবার বন্ধুবান্ধবের আকর্ষণ, তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া রাখে নাই। বাজারে খুঁজিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না, তাঁহাকে দেখ গিয়া হিমালয়ের ক্রোড়ে মরী পর্ব্বতে। খুঁজিতে হইলে তাঁহাকে সেই সকল স্থানে খুঁজিতে হইবে। সেখানে তিনি ঠিক ঋষির ন্যায় ধ্যানস্থ হইয়া বসিতেন। চক্ষু নিমীলিত, প্রশান্ত মুখমণ্ডল, স্থির আসন, ঋষিসম গাম্ভীর্য্য, এ দিকে শিশুর ন্যায় সরল বিনীত ঈশ্বরের পদানত। তখনি তাঁহার শরীর ছিল না, তিনি তখনি মরিয়াছিলেন। এ মৃত্যুর অনেক দিন আগে তিনি শরীর-মুক্ত হইয়াছিলেন, ঈশ্বরে আনন্দ সম্ভোগ করিতেন। বাহ্য শরীর ছিল বটে, কিন্তু তিনি পৃথিবীতে বিচরণ করিতেন না। নিয়ত হিমালয় কৈলাসে ভ্রমণ করিতেন।

এত নির্জ্জনপ্রিয় আর কে আছে? আমাদের মধ্যে মাকে কেই বা এত ভালবাসে? তিনি তাঁহার চিরসখাকে চিনিয়াছিলেন। শরীর ছাড়িয়া যাইতে হইবে এজন্য শীঘ্র

শীঘ্র তিনি দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শীঘ্র স্বর্গে যাইবার সম্বল করিবার জন্যই তিনি বস্ত সামগ্রীর আয়োজন উদ্দেশে হিমালয়ে গিয়াছিলেন। অঘোর, তুমি ঋষি, নববিধান তোমাকে ঋষি বলিয়া সম্বোধন করিবে। অঘোর কি কেবল পাহাড়েই থাকিত? যখন কীর্ত্তন হইত, অঘোর তাহার সর্ব্বাগ্রে যাইত। পাশে দাঁড়াইয়া যখন সে করতাল বাজাইত, তখন কি অপূর্ব্ব শ্রী প্রকাশ পাইত। অঘোর কাঁদিত, হরি হরি বলিয়া সে মুগ্ধ হইত, কিন্তু কখন তাহার চৈতন্য যায় নাই। তাহার হাতে আমরা ভিক্ষার ঝুলি দিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, ভাই তুমি পয়সা জড় কর। প্রচার যাত্রার খরচ তিনিই সংগ্রহ করিতেন। হরিসঙ্কীর্ত্তনে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। হরির প্রিয়, তিনি সাধু ভক্ত।

যে ধ্রুব প্রহ্লাদের বই খানি তিনি লিখিয়াছেন, তিনি পৃথিবীতে নিজেই সেই ধ্রুব প্রহ্লাদ ছিলেন। ছেলে মানুষের মতন তিনি, এই ছেলে দুটীর সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, তিনি বুকের ভিতরে তাঁহাদিগের সঙ্গে কথোপকথন করিতেন। সেই আদর্শে তাঁহার চরিত্র সংগঠিত হইয়াছিল। এজন্য তিনি ভক্ত ছিলেন, আমাদিগের মধ্যে ভক্তশ্রেষ্ঠ ছিলেন। সর্ব্বদা তিনি হরির সঙ্গে থাকিতেন। পঞ্জাবে তাঁহাকে এই বেদী হইতে প্রেরণ করা গিয়াছিল। পঞ্জাবে হরিকীর্ত্তন করিবার জন্য তিনি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি

কি করিলেন? পঞ্জাবের যাহারা গরিব লোক তাহাদিগের প্রতি দয়াদ্র্র হইয়া সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগের মধ্যে গেলেন। ধনী মানী বিদ্বান বড় মানুষ অঘোরকে কেহ আকর্ষণ করিতে পারিল না। প্রবলভাবে গরিবেরা তাঁহাকে টানিল। বৃদ্ধেরা শিশুর ন্যায় তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল, তাঁহাকে সকলে গুরু বলিল। তিনি উত্তর ভারতের গরিব বৃদ্ধগণকে শিক্ষা দিতেন, উপদেশ দিতেন।

দেশ হরিনাম কেন লইল না, ইহা বলিয়া এমনি কাঁদিতেন যে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। ভক্ত ভিন্ন এরূপ কে কাঁদিতে পারে? তোমরা আমরা এমন কাঁদিতে পারি না, পরদুঃখে দুঃখী হইতে পারি না। ভক্তশ্রেষ্ঠ কাঁদিলেন, হরিনাম লইয়া প্রাণের ভিতরে আকুল হইলেন। তাঁহাকে ভক্ত বলিব কি যোগী বলিব? নববিধানে দুই মিশাইয়া তিনি দুই সুধা একত্র পান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ এই সাধুকে সাধু বলিয়া আদর করিলেন। আর তিনি কনিষ্ঠ রহিলেন না, সকল অপেক্ষা তিনি জ্যেষ্ঠ হইলেন, জগজ্জনে তাঁহাকে শ্রদ্ধা ফুল অর্পণ করিবে। আর আমরা তাঁহাকে স্নেহসম্ভাষণ করিব না, তিনি তাহার অতীত। ধর্ম্মসম্বন্ধে তিনি অগ্রগণ্য হইলেন। নববিধানবাদিগণের নিকটে তিনি ভক্তি ও যোগের পথ প্রকাশ করিলেন। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ প্রেষ্য সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়া আমাদিগের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিলেন। অবিলম্বে আমরা তাঁহার নাম

স্বর্গীয় সাধুগণের মধ্যে নিবিষ্ট করিয়া তাঁহাকে অগ্রগামীর সম্মান অর্পণ করিব। তিনি সাধু।

কি নির্ব্বিকার চিত্ত, কি বালকস্বভাব! কলিকাতায় তাঁহার শত্রু নাই, বিদেশে তাঁহার শত্রু দেখিতে পাওয়া যায় না। এ প্রকার লোকের মৃত্যু কি অমঙ্গল? সে লোক সকলের অগ্রগণ্য; চিরদিন তাঁহাকে প্রেমের সঙ্গে সেবা করিব। সকলের শ্রদ্ধেয় শত্রুশূন্য এমন কে আছে? তাঁর নাম সকলের প্রিয়। তাঁর সুখ্যাতিতে আমাদিগের বিশেষ সুখ। অঘোরকে, ব্রাহ্মগণ, তোমরা কখন ভুলিতে পার না। মার সম্বন্ধে তিনি আমাদিগের বিশেষ শ্রদ্ধেয়। আমরা সকলে তাঁহাকে আমাদের উপরে স্থান দিব। আমাদের কার্য্য আমরা করিব। আমরা কাঁদিব না। শরীরের দুঃখ, শরীরের শোক, শরীরের নিয়মে কমিয়া যাইবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধুগণ যেমন, তেমন এই অশরীরী সাধু ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সকল স্থানে আদৃত হইবেন। কালক্রমে সকলে সেই অশরীরী আত্মাকে সাধু সাধু বলিয়া সাধুবাদ করিবেন, সহায় বলিয়া সম্মান দিবেন, শ্রদ্ধা করিবেন।

অঘোর তোমাদের বন্ধু, তোমাদের শুভ ইচ্ছা প্রার্থনা তিনি গ্রহণ করিবেন। বাড়ীতে যখন আত্মোন্নতির জন্য প্রার্থনা করিবে, তখন তাঁহার জন্য ভক্তির সহিত প্রার্থনা করিবে। হৃদয় মধ্যে অঘোর চরিত্র, তাঁহার শান্তভাব,

তাঁহার ক্ষমাশীলতা, তাঁহার সরলা ভক্তি, বাল্যস্বভাব এবং দীনতা পোষণ করিয়া ঈশ্বরের পথে ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হও। আমাদের প্রাণের বন্ধু ঈশ্বরের ক্রোড়ে পুণ্য শান্তিতে বর্দ্ধিত হইতে থাকুন। সকলে বল, "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"

সৎসঙ্গ।

রবিবার ৪ঠা পৌষ, ১৮০৩ শক; ১৮ই ডিসেম্বর ১৮৮১।

হে ব্রাহ্মসমাজ শ্রবণ কর। অদ্য শুভ দিনে ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে স্বর্গবাসী সাধু যোগীগণের মধ্যে অঘোর নাথ সাধুনামে আখ্যাত হইলেন। ঈশ্বর সম্মতিতে, ভক্তগণের অনুমোদনে, তিনি সাধুর নাম, সাধুর আদর, সাধুর গৌরব ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। নববিধান এই কথা প্রচার করিলেন, স্বর্গ সায় দিলেন। জীবিতগণ মৃতের সাধু নাম অনুমোদন করিলেন। পৃথিবী এই সংবাদ প্রচার করিল, দেশের লোক সকল ইহা শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল। এত দিন জীবিত ব্যক্তি লইয়া ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মবিধান সাধন করিয়াছেন। পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইয়া গেল, এখনও আমাদিগের মধ্যে পরলোকের তত্ত্বসাধন আরম্ভ হয় নাই। ব্রাহ্মগণ এত দিন জীবনের আদর করিয়াছেন, বিধানের আজ্ঞায় মরণ আদরণীয় হইতে লাগিল। ব্রাহ্মেরা আবির্ভাবে উৎসাহ ও প্রীতি লাভ করিতেন, তিরোভাবে অনেক ভাল ভাল কথা শিখিতে

লাগিলেন। ইহলোকের তত্ত্বসম্বন্ধে অনেক উক্তি আছে, কিন্তু পরলোকের তত্ত্ব কি, পরলোক কি প্রকার, তাহার ভাব ভঙ্গী কি তদ্বিষয়ে সৎপ্রসঙ্গ অধিক হয় নাই। এত দিন আমাদিগের মধ্যে ইহলোকের কথা ছিল; পরলোকের কথা ছিল না। এখন ইহলোক পরলোক দুইয়ের যোগ হইল। ইহলোকের শাস্ত্রের সঙ্গে পরলোকের শাস্ত্রের মিলন হইল।

সাধকের জীবন থাকিতে পরলোকের কথা হয় না। পারলৌকিক মতের কথা কি একজন ভক্তের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়? কাহার সম্বন্ধে এরূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে? সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে, যে ঈশ্বরের ধর্ম্ম সাধন করে, সাধু নামের গৌরব প্রকাশ করিতে পারে। ইতিপূর্ব্বে আমরা কাহাকেও সাধু করি নাই, আমাদিগের মধ্যে কেহ কাহাকেও করে নাই, আমরা এ কথা শুনি নাই বা প্রচার করি নাই। এখন প্রকৃত পথ প্রকাশ পাইল, সর্ব্ববাদী সম্মতিতে সংঘটিত হইল, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একজন সাধু হইলেন, সাধুদিগের সঙ্গে মিশিলেন। সাধুর প্রতি সম্মান দেখান, সাধুর প্রতি ভক্তি সাধন, এ সমুদয় একজন লোকের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য হইল। অতএব ব্রহ্মতত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় করিয়া জীবতত্ত্বকে পবিত্র করিবার জন্য ঈশ্বরবিশ্বাসী মাত্রেরই সাধ্যমত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। উপাসনা, আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা প্রভৃতি যেমন কর্ত্তব্য, হে পরলোকের যাত্রীগণ, তেমনি পরলোক-সম্বন্ধেও অপর কর্ত্তব্য। এখন বিশেষ সময় উপস্থিত।

আমাদিগের মধ্য হইতে একজন গেলেন, এখন তাঁহারই ভিতর দিয়া আমাদের সকলকে পরলোকে যাইতে হইবে। অতএব সাধু সম্মানের মত আমাদিগের ধর্ম্মসমাজের মধ্যে, বিধানমণ্ডলী মধ্যে জীবিত থাকুক।

সাধুগণ আলোচনার বিষয়, স্মরণের বিষয়, তাঁহাদিগের মৃত্যু বিশ্বাসের বিষয় নয়। মৃত্যু তাঁহাদিগের সম্বন্ধে জীবনপ্রদ হইল। মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সদালাপ সৎপ্রসঙ্গ প্রয়োজন। সকল ভাই পৃথিবীতে রহিল, এখন আর বাহ্যিক আকার দেখিবার সম্ভাবনা নাই। এখন সৎপ্রসঙ্গে জীবিতগণ মৃতের দলভুক্ত। নববিধান জীবিত ও মৃতকে এক দলভুক্ত করিলেন। যিনি ইহলোকে রহিলেন না, তিনি আমাদিগের দলভুক্ত হইয়া রহিলেন। দল ভাঙ্গিল বলিয়া, আমাদিগের মধ্যে অমুক নাই বলিয়া যে ক্ষুণ্ণ হয়, সে অবিশ্বাসী। আমাদিগের একজন পরলোকে যাওয়াতে ইহলোক পরলোক এক হইল, সাধুগণের সঙ্গে আমাদিগের সম্বন্ধ স্থায়ী হইল, এই নূতন সম্বন্ধ জন্য নূতন কর্ত্তব্য উপস্থিত হইল। পরলোকে সকলে বন্ধুকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। এখন সকল প্রকারের পত্র পৃথিবীর ডাকে আর পাঠাইতে হইবে না। এখন আমাদিগের পত্র সহজে স্বর্গে পাঠাইতে পারিব। আমাদিগের বন্ধুর মধ্য দিয়া পত্র স্বর্গে যাইবে। আমাদিগের মধ্যে এক নূতন বিধান খুলিল। এক পার্থিব সম্বন্ধ ছিল, এখন ইহলোক পরলোকের সম্বন্ধ খুলিল।

ইহলোকের ভদ্রতাই আর শেষ নয়, কত সৎপ্রসঙ্গ সদালাপ পরলোকের সাধুগণের সঙ্গে হইবে। এই নূতন সম্বন্ধ আমাদিগকে সাধন করিতে হইবে। কি প্রকারে সাধন করিব? আমাদিগের এক নূতন রাজ্য স্থাপিত হইল। আমাদিগের একজন সাধুনামে কীর্ত্তিত হইলেন, আমরা তাঁহাকে সাধুনাম দিলাম, পরলোকে আমাদিগের বাড়ী সংস্থাপিত হইল, আমাদিগের এক ঘর জ্ঞাতি স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত হইল। আত্মীয় স্বজনকে বসাইতে পারেন এজন্য এক খণ্ড বিস্তৃত ভূমি তিনি পাইলেন। একজন বণিককে স্বর্গে পাঠান হইল যিনি বাণিজ্য ভাল বোঝেন। একজন বিষয়ী লোককে পাঠান হইল, যিনি বিষয় কার্য্যে বিলক্ষণ সুপটু। এই সকল আলোচনা করিয়া দেখ এখন কিরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে। নূতন কর্ত্তব্য উপস্থিত। নূতন ঘর ভবসাগরের পরপারে বান্ধা হইল। সে ঘরের শোভা কি যোগপক্ষীর নিকট প্রকাশ পায় নাই?

সাধুদিগের মত স্থির করিয়া লও। এ সম্বন্ধে কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইও না। সাধুর শরীর লইয়া আমরা কি করিব? সাধু দর্শন, সাধু পাঠ, সাধু আলোচনা, সাধুসাধনের সার। সাধু সঙ্গে বাহ্যিক কথোপকথন আলাপ এ পৃথিবীর, পরলোকের নয়। পরলোকের সম্বন্ধ আধ্যাত্মিক। আত্মার ভিতর দিয়া পরলোকের বিষয় দেখিতে হইবে। বাহিরের চক্ষে পরলোকের সাধুগণকে দর্শন কুসংস্কার, বাহিরের হস্তে যে তাঁহাদিগকে ধরিতে যায়, সে পাগল। পৃথিবীর প্রণালীতে

তাঁহাদিগকে ধরিতে গেলে অপরাধী হইতে হয়, তাঁহারা তদ্দ্বারা অপমানিত হন। ভক্তকে ভক্তি বাহিরে নহে, আত্মা দ্বারা ভক্তি করিতে হইবে। পৃথিবী ও স্বর্গ এ দুইয়ের ভিতরে সেতু নির্ম্মাণ করিতে হইবে, ভিতরের পথ দিয়া করিতে হইবে, তথায় যাইতে হইলে মনের ভিতর দিয়া রাস্তা। সেখানে বাহির দিয়া যাইবার যো নাই। এখানে ইচ্ছা হইলে হইবে না। যিনি সম্প্রতি সেখানে গিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিতে হইলে কি তাঁহার শরীর দেখিব? বিধান বলিতেছেন এরূপ করিতে হইবে না। তাঁহাকে মনোমধ্যে দেখিতে হইবে। তাঁহাকে দেখিতে হইলে এখন তাঁহার বাড়ীতে যাইতে হইবে। সমুদয় ঈশ্বরবিশ্বাসীগণকে মনের ভিতর দিয়া গমন করিতে হইবে। সাধু ভুলিব না, কিন্তু সাধুর শরীরের সম্বন্ধ যোগ করিব না, শরীরের সম্বন্ধ যোগ করিলে পাপ হয়। মনের মধ্যে দেখিব, মনের মধ্যে কথা বলিব, হরির ভিতর দিয়া, হরির মধ্য দিয়া। হরিকে ছাড়িয়া সাধুজ্ঞান ভ্রান্তি। হরিকে অতিক্রম করিয়া স্বর্গরাজ্য দেখিতে গেলে আলোক নির্ব্বাণ করিয়া বস্তু দর্শন করিবার ন্যায় হইবে। হরির আলোক পড়িলে তবে দেখিতে পাইবে। খ্রীষ্টকে কে জানিতে পারে, গৌরাঙ্গকে কে গ্রহণ করিতে পারে? ঈশ্বরের আলোক না পড়িলে কেহ তাঁহাদিগকে জানিতে পারে না। ঈশ্বরের আলোক যতটুকু পড়িবে, ততটুকু তাঁহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। আলোক হইলে সমুদয় ভাল দেখিতে পাইবে।

অঘোর তোমাদিগের সঙ্গে ছিলেন, এখন যদি ঈশ্বরের আলোক না পাও, ফল এই হইবে, তাঁহাকে আর দেখিতে পাইবে না। বাহিরের বস্তুগুলি যেমন, এমনি উজ্জ্বল বস্তু কাছে রাখ, আদর কর, ভক্তি কর, চেষ্টা যত্ন কর, দেখিবে, প্রভেদ কিছুই বুঝিতে পারিবে না। ঈশ্বরের নিকট উপায় প্রার্থনা কর, অঘোরভাবসম্পন্ন হইতে যত্ন কর, হরির আলোক পড়িয়া জ্যোতিষ্মান্ হইলে তবে তাঁহার সঙ্গে তোমার প্রসঙ্গ হইবে। হরির প্রতিভা না হইলে কিছুই প্রতিভাত হয় না। এই নিয়মে ঈশ্বরকে ডাক, তিনি আপনি ছেলেকে ডাকিয়া আনিয়া তোমাকে দেখাইবেন। রাস্তায় বসিয়া সাধুকে ডাকিলে কেহ সাক্ষাৎ পায় না। যিনি যত আমাদিগের নিকটে, তিনি তত আমাদিগের নিকট হইতে দূরে। ঈশ্বর অনুগ্রহ না করিলে কখন নিকটের সাধুকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। মন বিশুদ্ধ কর, পরলোকের বিশ্বাস উজ্জ্বল কর, ঈশ্বরের ভক্তিতে উন্নত হও, ব্যাকুল হৃদয়ে মনের ভিতরে প্রার্থনা কর, ঈশ্বর তোমার বন্ধুকে দেখাইবেন, তোমার বন্ধুকে তুমি ঈশ্বরের ক্রোড়ে দেখিতে পাইবে। ঈশ্বরের ক্রোড়ে সাধুগণ দাঁড়াইয়া আছেন, ঈশ্বর না দেখাইলে দেখিতে পাইবে না। উৎকৃষ্ট সাধু, মধ্যম সাধু, কনিষ্ঠ সাধু সকলকে ঈশ্বরমধ্যে দর্শন করিতে হইবে, সাধু দর্শনের এই নিয়ম। অতএব ঈশ্বরের মধ্যে সাধুকে দর্শন কর, ঈশ্বরের মুখের আলোক না পড়িলে কখন দর্শন হইবে না।

দর্শন হইলে আর কি? দেখিলে এখন বরণ কর, সাধন কর। তাঁহাদিগকে হৃদয়ে রাখিয়া সংপ্রসঙ্গ কর। ঠিক যেমন মনুষ্যের সঙ্গে সংপ্রসঙ্গ করিয়া থাক, তেমনি করিতে হইবে। এখান হইতে তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে সম্বন্ধ চলিয়া গিয়াছে, এরূপ মনে করিও না। পার্থিব সম্বন্ধ তাঁহাদিগের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে, এখন আর তাঁহাদিগের সঙ্গে মিলন হইতে পারে না, স্বর্গে গিয়া তবে তাঁহাদিগের সঙ্গে সম্মিলন হইবে, এরূপ মনে করিও না। সংসারের পরপারে গিয়া পৃথিবীর পিতা আরও নিকট হইলেন, বন্ধুর বন্ধুতা আরও নিকট হইল, প্রত্যেক সাধুর সঙ্গে আমাদিগের আরও নিকট সম্বন্ধ হইল। মরিলেই সম্বন্ধ গেল, ইহা হইতে পারে না। এখানে জীবন থাকিতে এক শ্রেণীভুক্ত, চলিয়া গেলে অপর শ্রেণীভুক্ত, ইহা মনে করিতে পার না। এক সময়ে যাঁহাকে দেখিয়াছি, সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখিব। যখন এখানে নাই, তখন ক্রমান্বয়ে ভাবিব, চক্ষের আড় হইলে সব আড় হইল, এ পাগলের কথা অবিশ্বাসীর কথা। সাধু যিনি তিনি আছেন। পাঁচ জনের সঙ্গে যেমন সম্বন্ধ ছিল তেমনই রহিল, মরিয়াছেন বলিয়া তিনি অগ্রাহ্য হইলেন, আজ শ্রাদ্ধ কর্ম্ম করিয়া সমুদয় সম্বন্ধ শেষ হইল এরূপ কখন মনে করিব না। শ্রাদ্ধে পার্থিব সম্বন্ধ শেষ হইল বলিয়া স্বর্গীয় সম্বন্ধের শেষ হইল তাহা নহে। শ্রাদ্ধে পার্থিব সম্বন্ধের শেষ, স্বর্গীয়

সম্বন্ধের আরম্ভ। আজ যাঁহার শ্রাদ্ধ করিলাম, স্বর্গে তিনি জীবিত হইলেন এই কথা ভাবিব। এখন সম্বন্ধ পূর্ব্বাপেক্ষা আরও স্পষ্টতর। মুখে বলিলে হয় না। সকলে দেখিলেন বন্ধু মরিয়া গেলেন, কিরূপে তাঁহাকে নিকটে করিবে। এই দশ দিন তাঁহাকে যত্ন করিয়া স্মরণে রাখিলে, এখন তাঁহাকে কিরূপে ভাবিবে? পথ বলি শ্রবণ কর। সাধুসম্বন্ধে এই মত সাধন কর। বাহির দিয়া সাধুকে পাওয়া যায় না, চরিত্র মধ্য দিয়া সাধুকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, চরিত্রে সাধুকে জাজ্বল্যমানরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, এই বিধি। চরিত্রের নৈকট্যে স্বভাবের নৈকট্যে সাধু নিকটতর হন। হৃদয় সাধুকে আত্মীয় করে, পরিবার করে। চরিত্রে নিকট না হইয়া সাধুর চরণ চুম্বন করিলে, বন্ধুর ছবির সমাদর করিলে, নৈকট্য হয় না। স্বর্গের বন্ধু আপনি কি আমাদিগের হইতে পারেন? কখনই না। হাতে ধরিয়া ঈশ্বর স্বর্গের বন্ধুকে আনিয়া মিলিত করেন। ক্ষমাশীল যোগীর নিকটতর হইতে হইলে ক্ষমাশীল যোগী হইতে হইবে। যদি তুমি ক্ষমাশীল না হও, যোগী না হও, তিনি তোমার বাড়ীতে পা দিবেন না, কথাও বলিবেন না, তোমার মুখও দেখিবেন না। তুমি যদি শঠ ধূর্ত্ত রাগী যোগবিহীন হও, সাধু অঘোরের সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। তোমার সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ ঘুচিয়া যাইবে। পাপপরায়ণ ব্রহ্মজ্ঞানী যদি সাধু হইতে চাও, হইতে পারিবে না। তোমার মনে কোন গুণ থাকিলে,

সেই গুণে যত সাধুর নিকটবর্ত্তী হইবে, বুকের ভিতরে, রক্তের ভিতরে, আহারের মধ্যে, বিপৎপাতের মধ্যে, সকল অবস্থার মধ্যে চরিত্রের সম্মিলন করিলে, সাধুর নিকটবর্ত্তী হইবে। নৈকট্য চরিত্রে চরিত্রে ঠেকিবে, গায়ে গায়ে ঠেকিবে, স্বভাবে স্বভাবে ঠেকিবে। প্রাণে প্রাণে মিলন না হইলে সাধুভক্তি হয় না, গুরুভক্তি হয় না, সাধুর উপযুক্ত সমাদর হয় না।

অঘোরের পরলোকের ছবি দেখ। এখন তাঁহার শরীর কল্পনা, বাহিরের চক্ষু আর তাঁহাকে দেখিবে না। সাধুর নৈকট্য চরিত্রের নৈকট্যে। ঈশা গৌরাঙ্গ প্রভৃতি সহ সম্বন্ধের যে নিয়ম, তাঁহাদের গুণসম্পন্ন না হইলে যেমন তাঁহাদিগের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না, প্রত্যেক ভাই প্রত্যেক মানুষসম্বন্ধে এই কথা। কিসে দুজনে নৈকট্য হয়। আমি হরিভক্ত তুমিও সেইরূপ, বন্ধুতা আত্মীয়তা এইরূপ সম্বন্ধ। ছোট বড় সকল লোকের সম্বন্ধই এইরূপ। যতটুকু সাধুর গুণ আমাতে আছে ততটুকু আমার সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ। গুণের ঐক্য না থাকিলে সাধুর সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না। যদি আমি সে অবস্থায় ভক্তি করি তবে সে কপট ভক্তি। কেবল বাহিরে ভক্তি দেখাইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া এখানে পার পাইব না। সাধুকে ভক্তি করিতে হইলে বাস্তবিক চরিত্রের নৈকট্য চাই, স্বভাবের মিলন চাই। তাঁহারা নিজ নিজ চরিত্রের দ্রব্য দ্বারা ভক্তিযোগ সাধুতা পরিপুষ্ট করেন।

কি জন্য অঘোর আসিয়াছিলেন ঈশ্বর জানেন, তবে ইহা তুমিও জান আমিও জানি যে তিনি সাধু জীবন দেখাইবার জন্য আসিয়াছিলেন। অঘোরের পিতা একজন হিন্দু যোগী ছিলেন। অঘোর বাল্যকাল হইতে যোগপ্রিয়। যোগের ভাব প্রস্ফুটিত করিবার জন্য, ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে যোগের বিধি প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি যোগমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি এই সাধন অবলম্বন করিয়া যোগীর আদর্শ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই ঘটনা ইতিহাসে চিরকাল থাকিবে। তাঁহার ছবি চিরদিন পৃথিবীতে থাকিবে, তাহার নিগূঢ় হেতু এই যে তিনি যোগী ছিলেন। তিনি যোগী বলিয়া আদৃত হইবেন,যোগী বলিয়া তাঁহাকে সকলে বরণ করিবে। তিনি কোন্ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন? যোগে। একাগ্রতা তাঁহার ভূষণ ছিল। সাধু বলিয়া তাঁহাকে স্মরণ করিব, কিন্তু যখন কেহ জিজ্ঞাসা করিবে কি জন্য তিনি বড়? তিনি সত্য কথা বলিতেন, কিম্বা তাঁহার অনেক সদ্গুণ ছিল তজ্জন্য তিনি বড়? তাহা অপরেরও আছে। তবে কি তাঁহাতে ছিল, যাহার জন্য তিনি ব্রাহ্মমণ্ডলীতে উচ্চতম স্থান প্রাপ্ত হইলেন? ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে তিনি যোগী ছিলেন। তিনি যোগী, এই তাঁহার বিশেষ লক্ষণ ছিল। ঈশ্বর তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, মানুষ তাঁহাকে সাধু বলিয়া বরণ করিল, ঈশ্বর ও মানুষে মিলিল। আমরা তাঁহাকে নমস্কার করিয়া যোগী বলিব। ব্রহ্মপ্রেম তাঁহাকে যোগী করিল, মাতৃগর্ভে

তিনি যোগভাব পাইলেন। বয়ঃসহকারে তিনি যোগসাধন করিলেন. সকলে তাঁহাকে যোগী বলিয়া স্বীকার করিল। যোগভাব তাঁহাতে প্রবল ছিল, তাঁহার জীবন যোগপ্রধান। তাঁহাতে ভক্তি ছিল, সদ্গুণ ছিল, কিন্তু এই যোগেতে তিনি উচ্চ। সকল চিন্তা ছাড়িয়া এক ঘণ্টা অবিচ্ছেদে আমরা ঈশ্বরে তেমন মন স্থির করিয়া রাখিতে পারি না, তিনি যেরূপ পারিতেন। আমাদের চেষ্টা করিতে হয়. যত্ন করিতে হয়, বসিবামাত্রই তাঁহার মন প্রস্তুত। তাঁহার একচিত্ততা সহজ ছিল। তিনি স্বভাবতঃ নির্জ্জন স্থান অন্বেষণ করিতেন। তিনি মনুষ্যের কোলাহলে বিরক্ত ছিলেন। তিনি সংসারে ছিলেন, সংসারের মধ্যে থাকিয়া যোগী হইলেন। তিনি বিষয় কার্য্য করেন নাই তাহা নহে। তিনি প্রতিদিন ১০।১২ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতেন। তিনি স্বয়ং শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, কার্য্য কর্ম্ম দেখিতেন, লেখা পড়া করিতেন, স্ত্রীলোকদিগকে ধর্ম্মজ্ঞান উপদেশ দিতেন, সৎপ্রসঙ্গ করিতেন, যে সকল বিষয় পরিশ্রমসাধ্য তাহাতে দিবানিশি ব্যস্ত ছিলেন। তিনি পরিশ্রমী ছিলেন, আলস্যকে বিষবৎ একান্ত ঘৃণা করিতেন। এই জন্য বলি তিনি যোগী ছিলেন। সংসারে গুরু তিনি, ঊনবিংশ শতাব্দীর যোগী তিনি।

আমাদিগের যোগী, জ্ঞান ভক্তি, সংসার ধর্ম্ম, বিষয় কর্ম্ম সকল লইয়া যোগ সাধন করিতেন। এত পরিশ্রম চেষ্টার মধ্যে যখন তিনি যোগে বসিতেন, কোন দিকে তাঁহার

মন যাইত না। এক দিকে তিনি ব্রহ্মচরণ সেবা করিতেন, আর এক দিকে যোগে তাঁহাকে চিন্তা করিতেন, ব্রহ্মে মগ্ন থাকিতেন। ঈশ্বরে বিলীন হইয়া গিয়া এ সংসারের সকল ভুলিয়া যাওয়া সে এক যোগ সাধন, এ এক যোগ সাধন। এ দুই যোগ সাধনে কত প্রভেদ! আমরা যখন উপাসনা করি, দুষ্ট অশ্বের ন্যায় আমাদিগের মন কত দিকে ধাবিত হয়, কত বার ধ্যান ভঙ্গ হয়। সাধু যোগী আমাদিগের বন্ধু ব্রহ্মমন্দিরে নিজ যোগ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এই দান সকলে গ্রহণ কর। শ্রদ্ধেয় ঈশ্বরানুগত ঈশ্বরদাস আমাদিগের বন্ধুর নামে আমাদিগের মন পবিত্র হইবে, উচ্চ যোগচরিত্র আমাদিগের আদরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদিগকে আমাদিগের জীবনে বন্ধুত্বের পরিচয় দিতে হইবে। উপাসনার সময়ে মন এদিকে ওদিকে না যায়, হৃদয়ের শান্তি ও স্থৈর্য্য থাকে, একবারও মন বিক্ষিপ্ত না হয়, এই ব্রত সকলকে গ্রহণ করিতে হইবে। এ সময়ে এক মনে এক স্থানে যোগ সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অঘোরচরিত্র হৃদয়ে নিবিষ্ট করিয়া দিন দিন যেন যোগের পথে শান্তির পথে অগ্রসর হই।

রাজা রামমোহন রায়।

রবিবার ১৮ই পৌষ, ১৮০৩ শক; ১লা জানুয়ারি ১৮৮২।

অদ্য হইতে ব্রহ্মমন্দিরে সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব আরম্ভ হইল। উৎসবে যে আনন্দের হিল্লোল পরে দেখিতে পাইব তাহার প্রবল উচ্ছ্বাস আজই দেখিতেছি। ব্রাহ্মেরা উৎসবের উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন, প্রস্তুত হইবার প্রথম দিন অদ্যকার দিন। যদি সকলে মিলিত হইয়া, উপদেষ্টা ও উপদিষ্ট একত্র হইয়া এক সরল পথে না যান তবে সমুদয় উদ্যোগ বৃথা। সর্ব্বপ্রথমে এক ভূমি পরিষ্কার করিয়া এক পথে চলা কঠিন। উপদেষ্টা যাহা বলেন সাধারণের মধ্যে সকলে তাহা গ্রহণ করেন না। তিনি যে ভাষায় উপদেশ দেন, তাঁহারা ভিন্ন ভাষায় সেই কথা বলেন, উভয়ের মধ্যে প্রভেদ অনেক। ভাবসম্বন্ধে ব্যবধান তো অতি প্রশস্ত। বক্তা যে সকল কথা বলেন অধিকাংশ শ্রোতা সে সকলেতে গভীর ভাবে যোগ দেন না। অধিকাংশের আবিষ্কৃত বিষয়ে যোগ দিতে অমত। আমাদিগের মধ্যে মতের অনৈক্য আছে। উৎসব সম্বন্ধে আমার বিনীত প্রার্থনা ও প্রস্তাব এই যে আমাদিগের মধ্যে ভাষা ও ভাবের ঐক্য হউক।

অনেকে বলিয়া থাকেন রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপন করিলেন। এই ঘটনা স্বীকার করিতে গিয়া এই যে ভাষা ব্যবহৃত হইল ইহা অতি অপবিত্র এবং হীন। স্পষ্টরূপে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের বেদী এই কথা বলিতেছে

এই হীন ভাষার মধ্যে লুক্কায়িত প্রবলতর হীন ভাব ও হীন মত আছে। এ সময়ে সকল প্রকারের হীন ভাব, হীন মত বিনাশ করা উচিত। নতুবা যোগ দিলে ফললাভে বঞ্চিত হইতে হইবে। একজন মানুষ এই ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিলেন, এ কথা শুনিতে ভয় হয়, এ অতি দুর্গন্ধ বস্তু ইহা দ্বারা ঘৃণা উদ্দীপ্ত হয়, মনের মধ্যে এ অতি কাঁচা কথা বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। এ অতি অবিশ্বাসের কথা। ইহার ভিতরে প্রকাণ্ড অকল্যাণের হ্রদ লুক্কায়িত আছে। যদি সাবধান না হও, এই হ্রদের ভিতরে ডুবিয়া মরিবে। যখনি কোন সাম্বৎসরিক উৎসব হয় তখনি যিনি সমাজসংস্থাপক তৎপ্রতি সম্মান ও আদর প্রকাশ করা হয়। ব্রাহ্মগণও সেই উদ্দেশ্যে উৎসব করিয়া থাকেন। সকল সমাজেরই উৎসবে সংস্থাপককে মর্য্যাদা দেওয়া আচার সঙ্গত। এই জন্য বলিতেছি উৎসবের আদি বর্ণ সংস্থাপক সম্বন্ধের ঘটনা। এ ঘটনা পর্য্যালোচনা করিয়া সর্ব্বাগ্রে মত স্থির করা উচিত।

আমি মনে করি, উচ্চতর বিধান গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুতির সময়ে ব্রাহ্মসমাজ বিধান সমাগত হয়। যখন ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সূত্রপাত হইল তখন বিধানের বাদ্য বাজিল। তোমরা ৫০ বৎসর রামমোহন রায়কে সংস্থাপক বলিতে সাহসী হইলে, তোমরা পৃথিবীর ভাষায় এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করিলে। আমি বিনীত ভাবে এই কথার প্রতিবাদ করিতেছি। পূর্ব্বের ন্যায় আর যে এই ঘটনাকে পার্থিব

দৃষ্টিতে দেখা হইবে তাহার সময় চলিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলিবেন পূর্ব্ব হইতে যাহা চলিয়া আসিয়াছে চিন্তা করিয়া তাহার প্রতিবাদ করা উচিত। বর্ত্তমান সময় সংশয়বাদের সময়, সুতরাং আশঙ্কা করিবার কারণ আছে, কেন না সামান্য লোকেরা বিধান বলিয়া কখন স্বীকার করিবে না। যখন বিধান সত্য, তখন বিধানকে বিধান বলিবে তাহাতে কথা কি? পুরাতন পুস্তকে এ সম্বন্ধে যে অশুদ্ধি আছে তাহা শোধন কর। সেই সকল পুস্তকে লিখিয়া দাও ইহাতে অনেক ভুল আছে, ইহার সংশোধন আবশ্যক। ইতিবৃত্ত পাঠ করিতে গিয়া যাহাতে ভ্রান্তি না হয়, তাহা হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া পাঠ করিতে হইবে।

এ সম্বন্ধে কি আপ্তবাক্য আছে তাহা শ্রবণ কর। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন ঈশ্বর আপনার সন্তান রামমোহনকে ডাকিয়া বলিলেন "কাছে এস। তোমাকে দাসের কার্য্য করিতে হইবে। দেখ, ভারতবর্ষ অন্ধকার কুসংস্কার, পৌত্তলিকতাতে পূর্ণ হইয়াছে, উহারা ভারতসন্তানগণের প্রাণ নাশ করিতেছে। ভারতে গৃহধর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায়। সংসারের ভিতরে অসুরের অত্যাচার বাড়িয়াছে। পাপ দুষ্প্রবৃত্তি নাস্তিকতা অপরাধ আস্ফালন করিতেছে, নরনারীর প্রতি প্রবল বিক্রম প্রকাশ করিতেছে, অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। যাও, বঙ্গদেশে মাতৃগর্ভে গিয়া জন্মগ্রহণ কর। জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত হইয়া উপযুক্ত সময়ে ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইবে। পৃথি-

বীতে তোমার শত্রু বাড়িবে, কিন্তু তাহারা তোমার কি করিবে? শাস্ত্রীগণ তোমাকে আক্রমণ করিবে, তোমার নামে কত অপবাদ করিবে, বন্ধুবান্ধব পর্য্যন্ত তোমাকে পরিত্যাগ করিবে, কিন্তু তুমি কোন ভয় না করিয়া এই বলিবে, প্রাচীন শাস্ত্রে কেবল এক ঈশ্বর, পৌত্তলিকতা আধুনিক।" বিধাতা এই কথা বলিয়া তাঁহাকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন, এ কথা বলিয়া যত উৎসব হয় হউক, বিধানের জয় কীর্ত্তিত হউক, পবিত্র ঈশ্বরের গৌরব বঙ্গদেশে মহীয়ান হউক! আমরা সাহস ভরে এই কথা বলিতে থাকি যাহা হয় হউক; পরে কি হয় দেখিতে পাইব।

ব্রহ্মের আজ্ঞা মস্তকে ধারণ করিয়া রামমোহন যাহা করিয়া গেলেন তাহা অতি অদ্ভুত। তিনি একজন প্রেরিত ধর্ম্মসংস্কারক, যিনি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া পৃথিবীতে ধর্ম্মসংস্থাপন করিলেন; ব্রহ্ম যাঁহার দ্বারা তাঁহার ধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। নীচ পৃথিবীর ভাষাতে লোকে তাঁহাকে যখন ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপক বলিবে, তখন কি বলিবে? তখন কি বলিবে একজন মনুষ্য যে নিজ বুদ্ধিতে নিতান্ত প্রবল ছিল, সে ব্যক্তি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বুদ্ধিবলে জ্ঞানবলে শাস্ত্র নির্ব্বাচন করিয়াছিল? বেদান্ত হইতে মত উদ্ভাবন করিয়া দেশীয় বন্ধু বান্ধবের নিকট প্রকাশ করিল? তিনি কি লোকাতীত বলে আপনার ধর্ম্ম মতকে বিজয়ী করেন নাই? তিনি উপনিষৎ পুরাণ প্রভৃতি সমা-

লোচনা করিয়া ধর্ম্ম স্থাপন করিলেন, এ কথা বলিয়া কি হইবে? স্বর্গে একখানি ধর্ম্মপুস্তক আছে, তাহার একটী স্বর্গীয় শব্দের বর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া পার্থিব শব্দে উহাকে লোকের নিকটে প্রকাশ করিতে চাও? বিধান শব্দকে তুমি স্থাপনা শব্দে পরিবর্ত্তন করিতে উদ্যত? তুমি আপনার হস্তে ঈশ্বরের শাস্ত্র কাটিলে, সংস্কৃত ভাষার পরিবর্ত্তে চণ্ডালের ভাষা ব্যবহার করিলে। অল্প বিশ্বাসীর নীচ হীন ভাষায় বড় বড় শব্দ পরিবর্ত্তন করিলে। যাহা ছিল মহৎ তাহা নীচ হইল। কোথায় দেবতারা হাসিবেন, না শয়তানের বংশ হাসিল। যাহা বিধান, তাহা হইল মানুষের মত, যাহা ছিল ব্রহ্মের শক্তি তাহা হইল মানুষের বুদ্ধিবল। যে গ্রন্থ স্বর্গ হইতে পড়িল, তাহা কিনা প্রথমতঃ পৃথিবীতে লিখিত ও রচিত হইয়া যোড়াসাঁকো যন্ত্রালয় হইতে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। এ সকল অজ্ঞানের কথা।

ঈশ্বরের নিকট হইতে একজন প্রেরিত আসিলেন। যিনি প্রেরণ করিলেন তাঁহাকে সরাইয়া আমরা প্রেরিতকে তাঁহার পদে স্থাপন করিলাম। পরিশেষে আমাদিগের মধ্যে কি মৃত ব্যক্তির পূজা স্থাপিত হইবে? নীচ হীন ভাষা স্থান পাইবে? ১১ই মাঘের সময় রামমোহন রায় সংস্থাপক বলিয়া চীৎকার করিবে? কে রামমোহন রায়? প্রাণ থাকিতে তাঁহাকে স্বীকার করিব না। রামমোহন রায় কি বস্তু কি পদার্থ? কে ছিল সেই লোক চিনি না। যাঁহারা

আমাদের লোক তাঁহারা তাহাকে চিনেন না। তিনি কলিকাতার কি বঙ্গদেশের ইহা বলিয়া তাঁহার সঙ্গে কোন পরিচয় নাই। তাঁহাকে আমরা দেখিও নাই, স্বীকারও করি না। ভক্তি দেখাইতে হইলে আমরা এক ব্যক্তিকে দেখাইব যিনি প্রেরিত ছিলেন। তিনি কোথায়? মনে কর তিনি যেন হিমালয়ে, তাহাতে কি? আমি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তো জন্মগ্রহণ করি নাই। সে সময়ে ঈশ্বর কোন সন্তানকে প্রেরণ করিলেন, তাঁহার দ্বারা কিছু করাইয়া লইলেন, ইহা কি প্রকারে বিশ্বাস করিব? মনের দ্বারা কি প্রকারে নিশ্চয় করিব যে কোন একজন প্রেরিত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন? ব্রাহ্ম নিরুত্তর। প্রেরিত? প্রেরিত মানি না। ঈশ্বর কাহাকেও প্রেরণ করেন না। বীজ হইতে যেমন গাছ উঠে, মানুষও তেমনি উঠে। স্বভাবের নিয়মে ঘটনা সকল ঘটিতেছে। উদ্ভিদ রাজ্যে যেমন উত্থান ও বৃদ্ধি, মনুষ্য সমাজেও তেমনি। চারাগাছ বড় হইল, ফল ফুল পত্রে শোভিত হইল। মানুষ বালক ছিল যুবা হইল, যুবা ছিল বৃদ্ধ হইল। সকলই নিয়মে হইতেছে। আকাশ হইতে আবার নামিল কে?

যদি স্বর্গ হইতে কেহ না আসিলেন তবে এ সকল ব্যাপার কি প্রকারে ঘটিল? এ সকল কি মানুষের কীর্ত্তি? এ সকল কি ঈশ্বরের হস্তের শাস্ত্র নয়? ঈশ্বরের বিশ্ব, ঈশ্বরের মন্দির কি এক নয়? ঈশ্বরের গৃহ কি মনুষ্য

নির্ম্মাণ করিল? বুঝিতে পারি না। মানুষ ধর্ম্মসংস্কারক হইল, ব্রহ্মসভা করিল, মানুষ কতকগুলি মত উদ্ভাবন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থাপন করিল, এ কথা আমরা বলিতে পারি না। আমরা প্রেরিত মানি, এ সকল ব্যাপারে ব্রহ্মের হস্ত দর্শন করি। ক্ষমা কর, যেখানে মানুষের ক্ষমতা প্রকাশ, আমরা তাহাতে যোগ দিতে পারি না। ঈশ্বর প্রেরণ করেন এবং যিনি পিতা মাতা দত্ত রামমোহন নামে পরিচিত হইলেন তাঁহার যদি শ্যাম নাম হইত কিছু ক্ষতি নাই। নাম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। যিনি প্রেরিত তাঁহাকে যে আখ্যা দেওয়া হউক, সেই আখ্যায় তিনি পৃথিবীতে পরিচিত হয়েন। চিদাত্মা ব্রহ্মতনয় ব্রহ্ম-নিয়োজিত, ব্রহ্মপ্রেরিত। এমন যদি কেহ থাকেন তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি আমাদিগের মধ্যে যশস্বী হইবেন।

গোড়া ঠিক না করিয়া প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া কাহার নাম কীর্ত্তন করিব? কাহাকে সম্মাননা দিব? কি জানি শেষে যদি বড় জ্ঞানে কোন মানুষকে পূজা করিয়া ফেলি? এরূপ করিতে গিয়া উৎসব পুস্তকের প্রতি পাতায় আমাদের দুষ্ট ব্যবহার লিপিবদ্ধ হইবে, যাহা করিব সকলই মিথ্যা হইবে সর্ব্বনাশ হইবে, মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে। সাব-ধান, উৎসব মনুষ্যের স্মরণার্থ নয়, মনুষ্যের গুণকীর্ত্তন করিবার জন্য নয়। উৎসব কি জন্য? ব্রহ্মের কীর্ত্তি

প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, উন্মত্ত হইয়া ঈশ্বরের জয় ঘোষণা করিবার জন্য, ঈশ্বরের গৌরবে লোককে মহৎ করিবার জন্য। উৎসব আর কিছুরই জন্য নয়, ইহারই জন্য। ইহার প্রথম অক্ষর বিধান, ইহার প্রত্যেক বর্ণ বিধান, ইহার শেষ মন্ত্র বিধান।

সর্ব্ব প্রথম বিধান রামমোহনে প্রকাশ পাইল, তিনি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন। তিনি একটী প্রণালী হইয়া এই কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তাই লোকে বলে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপক। সমাজ স্থাপন, সমাজ প্রতিষ্ঠা, এ কি একটী বিদ্যালয় স্থাপনের ন্যায় মানুষের কীর্ত্তি? আমরা সভা করিয়া সাম্বৎসরিক করিয়া কি সেই মানুষের কীর্ত্তি ঘোষণা করিব? এ তো সামান্য বিষয় নয়, এ যে দেশব্যাপক পরিত্রাণের ব্যাপার। মনুষ্যের যাহা প্রাপ্য নয় তাহাকে তাহা অর্পণ করা কেন? ঈশ্বর বিধান করেন। মানুষকে তিনি সেই বিধানের বাহক করেন। বঙ্গদেশে তিনি রামমোহনকে পাঠাইলেন। বঙ্গদেশ চাহিল, অশ্রুজলে ভাসিয়া ভগবানের নিকটে গিয়া দুঃখ জানাইল, ঈশ্বর জীবের দুঃখ দেখিতে পারেন না, অন্ধকার সহিতে পারেন না, তাই তৎক্ষণাৎ এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ প্রেরণ করিলেন। তাঁহারই উপরে তোমার আমার ভার ছিল। তিনি দুর্ব্বল ছিলেন না, অন্যান্য ধর্ম্মবীরের ন্যায় ছিলেন। তুমি তাঁহার বিচার করিবে? তোমার জননী কি তোমা অপেক্ষা জ্ঞানী নন?

তুমি কি বলিবে, আমি প্রেরণ করিলে প্রবলতর সিংহের মত পরাক্রমশালী আরও বড় লোক পাঠাইতাম। তোমার এ কথার এক সদুত্তর এই, তোমার জ্ঞানের কথা রাখিয়া দাও। আমরা বিধান মানি, যেমন রাক্ষস তেমন বীর, যেমন রোগ তেমনি ঔষধ, যেমন অজ্ঞানতা তেমনি প্রকাণ্ড শাস্ত্র। বুদ্ধি-বলে সমুদয় কুতর্ক ছেদন করিতে পারে, সমুদয় ভ্রান্তি ছিন্ন করিতে পারে, এমন একজনের অবতরণের প্রয়োজন ছিল। যেমন প্রয়োজন, ঘটনা তদ্রূপ। ঔষধ রোগযন্ত্রণার অনুরূপ। লোকে যাহা বুঝিতে চায় তাহা বুঝাইতে পারে তেমনি লোক, তেমনি কৌশল। আমাদিগের পুস্তক সকলের মধ্যে একেশ্বরবাদ আছে কি না, এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য, সহজে বুঝাইবার জন্য, তিনি আসিলেন। উপনিষৎ পুরাণ হইতে চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল, সেই ওঁকার পুনঃ সংস্থাপন করিলেন। আমাদিগের দেশীয় শাস্ত্রে যে বড় বড় কথা মহারণ্যের মধ্যে পড়িয়াছিল, তৎসমুদয় উদ্ধার করিলেন। সমুদয় বিরুদ্ধবাদীগণকে নিরস্ত করিয়া সত্য উদ্ধার করিলেন, দেশীয় ভ্রাতাদিগকে সৎপথ দেখাইলেন।

তিনি জ্ঞানের গুরু, ভক্তি বা কর্ম্মের গুরু ছিলেন না। সমুদয় ভক্তদল লইয়া মৃদঙ্গ বাজাইয়া ভক্তির পথে যাইবেন এজন্য তিনি আসেন নাই। যাঁহার যে কার্য্য তাহার জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হও। নতুবা ধর্ম্মে ব্যভিচার আসিবে।

তোমার মতে বিদ্যা বুদ্ধি বিচার পরিত্রাণ করিতে পারে না, এ কথা বলিও না। ঈশ্বর কি দিলেন, বিচার করিও না। যাহা তিনি প্রেরণ করিলেন, যাহা তিনি দিলেন তাহা ভাল, তাহাই অমূল্য রত্ন। যাহা তিনি দিলেন মস্তক পাতিয়া গ্রহণ কর, কৃতজ্ঞ হইয়া ভক্তির সহিত স্বীকার কর। বলিও না তিনি ইটী দিলেন ইটী দিলেন না কেন? যে জন্য তিনি আসিয়াছিলেন সমুদয় অত্যাচার ঘৃণা নিন্দা ধৈর্য্যের সহিত বহন করিয়া তাহা সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। সভ্যতা, বিদ্যা, জ্ঞানের দুর্জ্জয় দুর্গমধ্যে তিনি সত্যের আলোক প্রকাশ করিলেন, ঈশ্বরের গৌরব স্থাপন করিলেন। কৃতবিদ্যেরা তাঁহার নাম শুনিয়া বিকম্পিত কলেবর হন। এত সামাজিক উন্নতি হইয়াছে, এত বিদ্যা বুদ্ধি বাড়িয়াছে, অনেক পণ্ডিতও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার মত একজনও হয় নাই। ইহাতেই প্রমাণিত হইল, তিনি ঈশ্বরপ্রেরিত, স্বর্গের লোক। এখন বিদ্যাচর্চ্চা বাড়িয়াছে. অনেকে এদেশ হইতে ইংলণ্ডে যাইতেছে। কিন্তু আজও রাজনীতি সংশোধনের জন্য তাঁহার মত ইংলণ্ডের মহাসভায় আর কেহ আন্দোলন করিতে পারেন নাই। বড় বড় পণ্ডিত বিদ্বান বুদ্ধিমান দিগ্বিজয়ী লোক তাঁহাকে আক্রমণ করিল, এক এক করিয়া তিনি সকলকে পরাজয় করিলেন. কেহই বিপক্ষতাচরণ করিয়া কিছু করিতে পারিল না। ধনী মানী জ্ঞানী নীচ, সকলে খড়্গহস্ত হইল, তিনি একাকী

পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন, তাঁহার প্রবল বাহুবলের নিকটে সকলে পরাজয় স্বীকার করিল। তাঁহার উপরে হস্তক্ষেপ করিও না, সাবধান, রামমোহনের জীবন সামান্য জীবন নহে। সে সময়ে তাঁহার মতন কেহ ছিল না, এখন অনেক বিদ্যা বুদ্ধি বাড়িয়াছে তথাপি কেহ তাঁহার সমান হইতে পারে না, তিনি একা দিগ্বিজয় করিলেন, এ কথায় কি বল? বিধানের বিরোধীগণ, কি বল? অবশ্য বিধাতার বিধান মানুষের নয়। স্বীকার কর, ঈশ্বর যে জন্য তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন তাহা তিনি করিয়া গিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত লেখ, কিন্তু জানিও মানুষ সে বাড়ী নির্ম্মাণ করে নাই, মনুষ্য ইহার স্থাপন করে নাই। তবে কি উপকারী বন্ধুকে দূর করিয়া দিবে? কোন মনুষ্য কি উপকার করে নাই? মানুষের কথা কেন বল? বল স্বর্গে পূর্ব্বে ব্যবস্থা ছিল, তাই রামমোহন আসিলেন, তোমাদের কার্য্য সিদ্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি স্বর্গের ব্যবস্থানুসারে আসিলেন, বজ্রধ্বনিতে এ কথা ঘোষিত কর। সেই সময় বিধান হইল, আজ আমরা তাহাকে বিধান বলিয়া ডাকিতেছি। তোমাদের ভাষাতে বলিলে নূতন বিধান, নূতন ভারত। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিশেষ যত্নে যাহা সংস্থাপন করিলেন, তৎপর সময়ে আবার আর একজন তাহা রক্ষা করিলেন, সকলকে একত্র করিয়া সমাজগঠন করিলেন, এ সকল কথা গল্প। এ সকল মিথ্যা কথা এ

কল ভুলিয়া যাইতে হইবে। নূতন কথা বলিয়া ভণ্ডামির কথা লিয়া কাটাইতে চাও কাটাও, এ সত্য-জ্যোতি ভাঁটার মত ড়াইয়া গড়াইয়া আসিতেছে, আজ না বলিলে পৃথিবীকে এক দিন প্রেরিত বলিতেই হইবে।

তবে আর বিলম্ব কেন? এখন আর ধর্ম্মস্থাপনের কথা না বলিয়া, বিধানের ভাষায় সমুদয় ঘটনা ঈশ্বরের মঙ্গল হস্তের ব্যাপার বল। তোমার বাড়ীতে যত শুভ ঘটনা ঘটিতেছে, সকলই বিধাতার বিধান। আজ যে জয়পতাকা উড়িতেছে, আজ যে বিধানের মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে, অতি প্রথমে সেই ওঁকারের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ছিল। শুভক্ষণ আসিয়াছে, আর গৌণ নাই। এখন নিরাশ হইবার বিষয় নহে। এখন আর প্রাচীন ভাষা কেন থাকিবে? তখনকার ঘটনা আর এখনকার ঘটনা আমরা ভাবিব? সমুদয় বিধান এক রাজ্যের ঘটনা। ঈশ্বর যাহা করিতেছেন, আজ পর্য্যন্তও তাহার শেষ হয় নাই, আরও এই বিধান গঠন হইতে থাকিবে। পৃথিবীর ভাষা ছাড়িয়া বিধানের এই ভাষা অবলম্বন কর। একই ভাষায় বিধাতার বিধানের গুণ কীর্ত্তন করিতে থাক। তাহা হইলে প্রেরিত সাধুগণের সঙ্গে বর্ষে বর্ষে তোমাদের ঘনতর যোগ নিবদ্ধ হইবে, কল্যাণের উপর কল্যাণ বর্দ্ধিত হইবে, ঈশ্বরকে বিধাতা বলিয়া কৃতার্থ হইবে, মঙ্গলময় বিধাতার বিধানে তোমাদিগের হৃদয় মন সুখী হইবে।

সাধু সম্মান।

রবিবার ২৫শে পৌষ, ১৮০৩ শক; ৮ই জানুয়ারি ১৮৮২।

এক ঈশ্বরের মহিমা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন হইয়া অবধি মহীয়ান্ করিতেছেন, এবং জাতিভেদ অস্বীকার করিয়া, বর্ণভেদ অতিক্রম করিয়া সমস্ত জীবের মধ্যে প্রেম ও ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দ স্থাপন করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের এই দুই লক্ষণ, এই দুই কীর্ত্তি সকলেই জানিতেছে। ইহার ধর্ম্মের মূল মত, ঈশ্বরকে পিতা ও মনুষ্যকে ভ্রাতা বলিয়া গ্রহণ করা। মানুষ ভাই, ঈশ্বর পিতা, এ দুই মতের মধ্যস্থলে আর কোন কথা আছে কি না, এ বিষয় লইয়া এত দিন আলোচনা হয় নাই; সম্প্রতি হইয়াছে। এটীই নূতন মত, ইহাই প্রাচীন ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ভক্তির নূতন মত পুরাতনের মধ্য হইতেই বাহির হইয়াছে।

ঈশ্বরকে যদি ভালবাসি পিতা বলিয়া, মানুষকে ভালবাসিব ভাই বলিয়া। গুণাধিক্য বশতঃ ভাই জ্যেষ্ঠ হইতে পারেন, গুণের ন্যূনতা বশতঃ ভাই কনিষ্ঠ হইতে পারেন। যে পরিবারে ভাই আছে, সে পরিবারে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠও আছে। এই তারতম্য কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। সকলেই এক, এ কথা মানি না; সমান পরিমাণে সকলেই প্রেম ভক্তি সুধা পান করিয়াছেন, এ কথা আমরা মানি না, বড় ছোট আমরা মানি। ইনি বড়, না ইনি ছোট? ভক্তি

দিব, না স্নেহ দিব? ভক্তি ঊর্দ্ধগামী; যদি বড় হন ভক্তিই দিব, স্নেহ দিব কিরূপে?

জ্যেষ্ঠ ভাইকে ভক্তি দিলে পিতাকেই ভক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে ঈশ্বর সোপান; সাধুরা গম্যস্থান। অন্যান্য সম্প্রদায়ে সাধু সম্মান না করিলে, ভক্তকে উপযুক্ত মর্য্যাদা না দিলে, ঈশ্বরের সম্মান করা হয় না। নববিধানের নব মত এই যে ঈশ্বর যদি জ্যেষ্ঠ না দেখান, আমরা জ্যেষ্ঠকে দেখিতে পাই না। কে জ্যেষ্ঠ, কেন হইলেন জ্যেষ্ঠ, পিতা ভিন্ন এ গূঢ় রহস্য আর কেহই জানে না। কে বড়, জানিব কিরূপে? বড় জানা ও বড় হওয়া একই। সে উচ্চ জ্ঞান কোথা হইতে আসিবে? সাধুকে চিনিয়া শ্রদ্ধা দেওয়া সাধুর পক্ষেই সম্ভব, সাধুরা আপনা আপনি আপনাদিগকে বোঝেন। যাঁহারা সাধু নন তাঁহারা সাধু চিনিবেন কিরূপে? দেখ ঈশ্বর জানা সহজ; কিন্তু সাধু জানা কঠিন। এমন সম্প্রদায় আছে যাহার লোকেরা অন্যান্য ধর্ম্মের সাধুদিগকে অতিক্রম করিয়া তাঁহাদিগকে অপমান করিয়া কেবল আপন সম্প্রদায়ের সাধুদিগকেই ভক্তি করিয়া থাকে। আমাদিগের মধ্যে এত দিন কিরূপ বোধ ছিল? সাধুদিগের নিন্দা করিতে পারি, অথচ ঈশ্বরের প্রশংসা করিতে পারি; বড়দের গালি দিতে পারি, সেই মুখে আবার কীর্ত্তন করিতে পারি। আর কিছু দিন সেই বোধ থাকিলে ভয়ানক ব্যাপার হইত। এখন নূতন মত প্রকাশিত হইয়াছে, ভক্তের অপমান করিলে

ঈশ্বরের অপমান করা হয়। বুঝিলাম, ঈশ্বর স্বয়ং সাধুদের মান্য দেন, তিনি স্বয়ং তাঁহাদিগকে লোকের শ্রদ্ধাভাজন করিয়া দিবার চেষ্টা করেন, স্বয়ং সাধুদিগকে গৌরবের মুকুট পরান।

যখন ঈশ্বরের নাম করিয়া নগর কীর্ত্তন আরম্ভ করিলাম, ধূলিতে অবলুণ্ঠিত হইলাম, তখন সেই ভক্তির ভিতরে আর সাধুর অপমান হইতে পারে না। ঈশ্বর তখন সাধুর মধ্যে দেখা দিলেন। কি ভাবে? ভক্তের আকার ধরিয়া; একটী গুণ এ সাধুতে, আর একটী গুণ ও সাধুতে রাখিয়া। ইহুদীদিগের সাধুতে একটী লক্ষণ, ঈশার মধ্যে ব্রহ্মস্বরূপের আর একটী লক্ষণ। বুদ্ধদেবের মধ্যে এক নিদর্শন, চৈতন্যেতে আর এক নিদর্শন। তোমার আমার গুণে কি ব্রাহ্মসমাজে সাধুভক্তি হইল? তাহা কখনই হইতে পারে না। তিনি নিজে ভক্তদিগের মধ্যে দেখা দিলেন। যিনি দেখাইলেন, একমেবাদ্বিতীয়ং তিনি। এক তিনি, নির্লিপ্ত তিনি। বিশেষ বিশেষ চরিত্রখণ্ড বিশেষ বিশেষ সাধুতে। উপাসনা করিতে করিতে জ্ঞানচক্ষুতে দেখিতে পাইলাম, ঈশ্বরের পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে, সারি গাঁথা লোক। এরা কে? এ লোকেরা কে? আমরা ত প্রেতবাদী নই, তথাপি দেখি, সারি গাঁথা ভক্তগণ। সাধুগণ ব্রহ্মে লিপ্ত; তিনি যেমন সাধুতে; সাধুরা তেমনি তাঁহাতে। সাধনে ইহা উপলব্ধি হয়। ঈশ্বরকে প্রেমরজ্জুতে বাঁধ।

দেখিতে পাই, সাধুসঙ্গে সাধুবৎসলকে, ভক্ত সঙ্গে ভক্ত-বৎসলকে। সেই প্রেমরজ্জু কে ছিঁড়িতে পারিয়াছে? সে রজ্জু কোন ক্রমেই ছিন্ন হয় না। যেমন ঈশ্বরের সমাগম, অমনি সঙ্গে সঙ্গে সাধুদিগের সমাগম। সাধুরা বাস করেন ঈশ্বরের মধ্যেতে ঈশ্বরেতে লিপ্ত হইয়া। যখন এই প্রকার সাধন সিদ্ধ হইল, সাধু সমাগম নিশ্চয় হইল, তখন সকল উৎসবে, সাধুদিগকে সম্মান দেওয়া আবশ্যক হইয়া আসিল, মতের আকার ধরিল। বুদ্ধির দ্বারা পুস্তকের সাধুকে আমরা লই না। আমরা সাধুর দোষ গুণ বিচার করিব, তা নয়। সাধু সম্মান আমাদিগের স্বতন্ত্র বিশেষ মত নয়। ঈশ্বর স্বতন্ত্র, সাধু স্বতন্ত্র, এ ভাবে সাধু সম্মান দিব না। ঈশ্বরের প্রকাশ সাধুতে। এমন সাধন সম্ভব নয় যে সাধুকে কাটিয়া ফেলিব আর ঈশ্বরকে রাখিয়া দিব। ঈশ্বরের রক্ত সাধু। ঈশ্বর বলেন, আমি ভক্তেতে অবস্থান করি।

সাধুদিগকে প্রথমেই একেবারে তিনি ব্রাহ্মসমাজের হস্তে দেন নাই। ঈশ্বর বলিলেন দেখিব ব্রাহ্মসমাজ আপনা আপনি সাধুদিগকে গ্রহণ করে কি না? প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইল, স্বভাবের নিয়মে আপনা আপনি সাধু সকল বাহির হইলেন। ব্রহ্মাণ্ড প্রস্ফুটিত হইল। হরি যে অণ্ড রাখিয়াছিলেন, তাহা যত প্রস্ফুটিত হইল, ততই নারদ কবীর, ঈশা, মুসা, শ্রীচৈতন্য সব বাহির হইলেন। ঈশ্বর যে বীজ পুতিয়াছিলেন, রামমোহন রায় না জানিয়াও যে

বীজে জল সেচন করিয়াছিলেন, সেই বীজ অঙ্কুরিত হইল। দিন দিন তরু বাড়িতে লাগিল, সতেজ হইল, ফুল দেখা দিল, ফল হইল, বিচিত্র বর্ণের পল্লব সকল শোভা বিস্তার করিল। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! যেখানে ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মনুষ্যের ভ্রাতৃত্বের মত প্রতিষ্ঠিত, সেখানে সাধু সম্মানের ভাব অনিবার্য্য।

কে গৌরাঙ্গকে ডাকিয়াছে? কে বুদ্ধদেবের পুস্তক পড়িয়া বুদ্ধদেবকে লইতে গিয়াছে? কে ঈশাকে আহ্বান করিয়াছে? সকলই আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করিতে করিতে পাইলাম। ব্রহ্মোপাসনা অতি অদ্ভুত ব্যাপার! নিগূঢ় উপাসনা করিতে করিতে ত্রিভুবন দেখিলাম। ত্রিভুবন ত দেখিলামই, চতুর্থ ভুবনও দর্শন করিলাম। এ কথা আর এখন বলিতে পারি না, সমস্ত তত্ত্ব জানিয়াছি, সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান লাভ করিয়াছি। কে গৌরাঙ্গ, কে ঈশা, এ কথা আর মুখে উচ্চারণ করিতে পারি না। ঈশ্বরকে লইব, তাঁহার পুত্রদের দূর করিয়া দিব, এ কথা বলিতে এখন প্রাণ কাঁদে। ঈশ্বর আসিবেন, তাঁহার সাধু পুত্র অঞ্চল ধরিয়া থাকিবেন। কোন্ মুখে বলিব, ঈশ্বর তোমাকে চাই, কিন্তু সাধু পুত্রকে কাটিয়া ফেলিব, দূর করিয়া দিব। এরূপ মনুষ্য থাকা সম্ভব নয়, যিনি বলিতে পারেন, ঈশ্বর আমার সর্ব্বস্ব, জ্যেষ্ঠ কাহাকেও বলি না, আমিই সকলের বড়; ঈশ্বরের পার্শ্বে আমি বসিয়াছি। এরূপ ভাব স্বভাবের

অতীত; ব্রহ্মোপনিষদের অতীত। সাধুদিগকে আলিঙ্গন করা স্বভাবসিদ্ধ; তাঁহাদিগের যশঃকীর্ত্তন করিলে ঈশ্বরেরই যশঃ-কীর্ত্তন করা হয়।

এই যে সাধুলোক, সাবধানে এই লোক গ্রহণ করিতে হইবে। যত দেখিবে সাধুকে, আগে দেখিবে ঈশ্বরকে। সমস্ত নিশানের উপর ঈশ্বরের নিশান উড়াইবে। সাধুর আদর ঈশ্বরের আদরের ফল। আগে সাধু নয়, আগে ঈশ্বর, পরে সাধু। স্থান কিনিলাম হৃদয়ভূমিতে ঈশ্বরের জন্য; এক রাত্রির মধ্যে ঈশ্বর স্বয়ং সাধুদের জন্য ঘর বাঁধিয়া দিলেন। যদি ব্রাহ্ম সাধুদিগকে সম্মান করিতে গিয়া দোষ করিয়া থাকেন, সে দোষ ঈশ্বরের। বৃন্দাবন না করিয়া তিনি ত থাকেন না। উৎসব যদি হয়, ঈশ্বরের জন্য যদি ঘর বাঁধিতে হয়, যদি তাঁহাকে আসিয়া দেখা দিতে হয়, তিনি দূত প্রেরণ করেন, কত স্থান লওয়া হইয়াছে, জানিবার জন্য। সমুদয় ভক্ত আগমন করিবেন; যে বাড়ীগুলি লওয়া হইয়াছে তাহাতে অত লোকের স্থান হইবে কি না? প্রেম ভক্তি যেরূপে সাজান হইয়াছে, তাহাতে সব ঠিক হইবে কি না? যদি ভক্তদিগের স্থান না হয়, ব্রহ্ম আসিতে অস্বীকৃত। দেখ কি অবস্থা! সাধুর অনাদর করিলে ঈশ্বরের আসা অসম্ভব। ব্রহ্মভক্তরত্ন এখন ব্রহ্মের নিকট হইতে লইতে হইবে। ব্রহ্মভক্তরত্নকে এখন আদর করিতে হইবে। ইহা উন্নতির লক্ষণ। এখন উন্নতি হইয়াছে, তাই তিনি ভক্তকে

পৃথিবীতে আনিতে চান। তাই এখন বলেন, ভক্তের স্থান না হইলে আমি যাইব না। তিনি জানেন যে, যদি এখন তিনি না আসিতে চান, আমরা কাঁদিব, বলিব যাহা চাও তাই দিব, ঈশ্বর এস। এক শত ঘর প্রস্তুত করিতে বল, তাহাই করিব; দুই হাজার ক্রোশ ভূমি লইতে বল তাহাই যোগাড় করিব, পাঁচ দিনের মধ্যে। সুখের বৃন্দাবন যেন অপূর্ণ না থাকে। তুমি আসিবে, তোমাকে ডাকিব, আর তোমার ভক্তদের নিন্দা করিব, এ অবস্থা আর আমাদের নাই, এ কথা বলিলে ব্রহ্ম তুষ্ট হন।

কিন্তু সাবধান! ভক্তের ভিতর দিয়া ব্রহ্মে যাইও না। যে ভক্তকেই মানে, তাহার ভক্তিতে সন্দেহ। ভক্তকে কে চেনে, যদি ভক্তের বিশেষ গুণ না জানি। ভক্তের এই দোষ, এই গুণ, এই অন্যায়, এই ন্যায়, এরূপ বিচার কে করিবে? কত লোকে ভক্তকে বড় করিতে গিয়া ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হইল। কত লোকে এক ভক্তকে সম্মান করিতে গিয়া অন্য ভক্তদের ছাড়িয়া গেল। মনুষ্য ভক্ত-নামের বিরুদ্ধে কত কথা বলিতে পারে। মনুষ্যশোণিতে পৃথিবী লোহিত হইল ভক্তের নামে। ভক্ত লইয়া টানা-টানি করিও না। যাও ঈশ্বরের কাছে, ভক্তেরা আপনারাই আসিবেন। ভাই বন্ধু সাবধান হও, আমরা ভক্তকে জানি না, ভক্তকে ভালবাসিতে পারি না, ঈশ্বর ছাড়িয়া। ঈশ্বরকে ভালবাসা সহজ, ভক্তকে ভালবাসা কঠিন। এক ভক্তকে

হয় ত হৃদয়ে লইব, আর এক ভক্তকে হয় ত কম ভালবাসিব। একজন যোগী লইতে গিয়া হয় ত ভক্তকে পরিত্যাগ কর, ভক্ত লইতে গিয়া হয় ত যোগীকে পরিত্যাগ কর। যদি প্রাণেশ্বরকে ধর, সেখানে সকলে সমান ব্যবধানে রহিয়াছেন, সকলকেই পাইবে। মা এক স্থানে স্থির হইয়া রহিয়াছেন; ঈশা টানেন এক দিকে, শ্রীগৌরাঙ্গ টানেন এক দিকে, বুদ্ধ টানেন এক দিকে, মুসা টানেন এক দিকে। চারিদিকে চারি জনে টানিলে তিনি সমভাবে থাকেন। তিনি কত সাধু লইয়াই রহিয়াছেন। চারিদিকে তাঁহার সাধুগণ। যদি ওদিক দিয়া এস, এক দিকে টানিবে; যদি মধ্যস্থলে এস সকলকেই পাইবে। তুমি কি বলিবে, আমি কেবল খ্রীষ্টকে চাই, গৌরাঙ্গ কে? শ্রীগৌরাঙ্গের মুখ দেখিয়া কি হইবে? কেবল কি তুমি খ্রীষ্টকে লইবে? কেবল যদি বল, গৌরাঙ্গকেই আমি লইব, খ্রীষ্টকে আমি লইব না, মা বলিবেন, আবার পুরাতন ভ্রম? সন্তানরত্ন কেউ বোঝে না, মা যদি না বোঝান। মা যদি না দেখান, কে কি দেখিতে পায়? আমাদের মত এই, নববিধানের এই মত যে, মা না বুঝাইলে আমরা কোন ভক্তকে বুঝিতে পারি না। তুমি কি রামমোহন রায়কে বুঝিয়াছ? দেবেন্দ্র ঋষিকে তুমি কি বুঝিতে পারিয়াছ? এই দুই নিকটস্থ স্বদেশীয় সাধুকেই যখন বুঝিলে না, তখন বিজাতীয় দূরস্থ সাধুদিগকে কিরূপে বুঝিবে? ঈশ্বর না চিনাইলে কেহ কোন কালে কোন

সাধুকেই চিনিতে পারে না। একজনকে জানিতে গিয়া আর পাঁচ জনের কাছে হয় ত অপরাধী হইতে হয়। ভক্তেরা মার অঞ্চল ধরিয়া রহিয়াছেন।

সাবধান মন! কুটিল বুদ্ধি খাটাইও না। কেবল চৈতন্যকে যদি লও, আমি বুঝিব মন বুঝি যোগের বিরোধী, মন শুষ্ক হয় বলিয়াই বোধ হয় বলে, গৌরাঙ্গকে লইয়া কি হইবে? বোধ হয় মন আমার বিবেকের বিরোধী, তাই ঈশাকে লইতে চায় না। একটী লইব, একটী ছাড়িব, তাহা হইবে না। ভক্তের বাজারে মনের মত রঙ্গের পুতুল কিনিব; দুই পয়সায় যে পুতুল পাওয়া যায়, সেই পুতুলই কিনিব? বহু সাধনে যাহা প্রাপ্য, তাহা কিনিবার কি প্রয়োজন? বাজারে গিয়া যে কিনিবে ভক্ত; সে ভক্তি যদি ভাল লাগে, তাই কিনিবে। সাদা বিবেক কিনিবে না। রাঙা পুতুল কিনিয়াই ফিরিবে। কিন্তু উৎসবের সময় মা সাদা, সবুজ, গোলাপি, হলদে কত পুতুল লইয়া আসিয়াছেন। ভক্তি দিয়া যে মাকে প্রণাম করিয়াছে, মা তাহাকে অমনি কত পুতুলই দিয়াছেন। মা বলিলেন, ইনি বড়, ইহাঁকে প্রণাম কর, ইনি মেজ, ইনি সেজ, ইনি ন—ইহাঁদিগকে প্রণাম কর। ভাল করিয়া সমাদর কর, উৎসবের সময় স্বর্গীয় ভাই ভগ্নী সব আসিয়াছেন। ভক্ত বলিলেন, তাহাই হউক।

হে দয়াসিন্ধু, হে প্রেমের সমুদ্র, কে জানে তোমাকে, কে জানে তোমার ভক্তকে? খাই দাই বেড়াই, সামান্য

ভাবে আছি। এ কঠিন কর্ম্মে যে সাহস হয় না। আমি বাজারে গিয়া পুতুল বাছিয়া কিনিব, এ ভরসা আমার নাই। সাধু লইয়া মহাসংগ্রাম হইয়াছে পৃথিবীতে। কত দেশ পরিপ্লাবিত হইল সাধুর জন্য—মানুষের শোণিতে। ভক্তে ভক্তে সংগ্রাম। এখন এই উনিশ শতাব্দীতে কি করা উচিত? গরিবের ছেলে আমরা, জ্ঞানহীন, পুরাণ পাঠ করিয়া ছেলে চিনিতে পারিব না। ভক্তের প্রাণধন, ভক্ত আমাদের গলার হার। ভক্ত নামের ন্যায় মিষ্ট শব্দ আর কাণে যায় নাই। ভক্ত না থাকিলে খাওয়া হয় না, নিদ্রা হয় না। তোমাকে ভালবাসিব, আর তোমার ভক্তকে তাড়াইয়া দিব, তোমার সামনে ভক্তের গলা ছেদন করিব, ইহা আমরা কোন মতেই পারিব না। বিশেষ উৎসবের সময় তোমার ইচ্ছার সঙ্গে যোগ দিয়া তাঁহাদিগকে বরণ করিব, হৃদয় শীতল হইবে। আগে তোমাকে চাই, তার পর দেবীনন্দনকে চাই। যত ধন স্বর্গে আছে, পুত্রধনের ন্যায় আর কি ধন আছে? ধন আনিবে ত দয়াময়ি, সমুদয় ধন লইয়া এস। এক দিকে ঈশা, এক দিকে শ্রীচৈতন্য লইয়া এস। ভক্তধনে ধনী কর; ব্রহ্মধনে ধনী কর, স্বর্গধনে ধনী কর। ভাই বলে সমস্ত সাধুদিগকে আলিঙ্গন করিব। বলব, জননীর সঙ্গে এসেছ, বৎসরান্তে আলিঙ্গন দাও। স্বর্গ আলিঙ্গন করিবে পৃথিবীকে, পৃথিবী কৃতার্থ হইবে। ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে? এই সুখ দাও;

এই শান্তি দাও। হে সন্তানবৎসল, যেন প্রেম ভক্তি দিয়া তোমাকে পূজা করিতে পারি। সাধু সম্মান করিয়া যেন হৃদয়কে নববৃন্দাবন করি! এই সুখে যেন সুখী হইতে পারি, দয়াময়ি, সন্তানদিগকে আজ এই আশীর্ব্বাদ কর।

সতীত্ব।

মাঘোৎসব।

১০ই মাঘ প্রাতঃকাল, ১৮০৩ শক; ২২শে জানুয়ারি ১৮৮২।

আমাদের ধর্ম্মে মানুষ কিছুই বলে না, কিন্তু মানুষকে মনের মানুষ বলেন। ভক্তের রসনা হইতে যাহা কিছু বাহির হয়, তাহার এক অক্ষরও ভক্তের নয়। এই শাস্ত্রই আমরা শিখিয়াছি, এই শাস্ত্রই আমরা মানি। আমাদিগের শরীর, আমাদিগের মুখের কথা, অথচ আমাদিগের নয়। কে বক্তৃতা করে? কে উপদেশ দেয়? নরাধম সে ব্যক্তি যে মনে করে, আমিই সমস্ত করিয়া থাকি। পৃথিবীর অভি-সম্পাৎ তাহার উপর পতিত হউক, যে আপনার বুদ্ধি হইতে পরকে উপদেশ দয়। যখন মানুষের কথা থাকে না, তখন ঈশ্বরের কথার আরম্ভ। মানুষের গোলমাল নিস্তব্ধ হইল, মানুষের মুখ বন্ধ হইল, ঈশ্বরের মুখ খুলিল। যে নিজে কিছু বলে না তাহারই মুখে ঈশ্বর কথা কহেন। তাহারই রসনায় বাক্যের দেবতা বসেন, বদনকুটীরে বসিয়া নিজে

নিজলীলা প্রকাশ করেন। এই জন্য নববিধানে মনুষ্যের কথার শেষ হইল; ক্রমে সকল কথাই নিস্তব্ধ হইতেছে। হউক নিস্তব্ধ; ব্রহ্মের সুর যেন তোমার কণ্ঠ হইতে বিনিঃসৃত হয়। নারদ, মুসা প্রভৃতির কণ্ঠে যেমন হরি সেতার বাজাইয়াছিলেন, তেমনি আমাদের কণ্ঠে তিনি বাজান। ভক্ত কি নিজে বলেন? নিজে কি তিনি কথা কন? ভক্তকে ভক্তবৎসল বলান।

তুমি কথা কও, কর্কশ গলাতে বোঝা যাইবে; মিষ্ট কণ্ঠে মিষ্ট সুরে হরির কণ্ঠ জানিতে পারা যায়। তোমার পাণ্ডিত্যের বক্তৃতা শুনিবার জন্যই কি দেশ দেশান্তর হইতে লোক আসিয়াছেন? তুমি এত লোককে পরিতুষ্ট করিবে? লোকে বলে, তোর বক্তৃতা আমরা শুনিতে চাই না। আলো জ্বালিয়া রাত্রিতে এখন তুমি শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবে? আমরা তাহা শুনিব না। ওরে ভ্রান্ত জীব, আকাশে সত্য দেখ, আর বল; চারিদিকে সত্য দেখ, আর বল; এখন আর বাতির আলোর প্রয়োজন নাই। এদের মত বলিতে হইবে না; এ সময় নববিধানের পবিত্র সময়; এ সময় ক্রমে মনুষ্যের বাক্য নিস্তব্ধ হইয়া আসিতেছে। এ সময় জ্বলন্ত ব্রহ্মবাণীর অধিকার। আচার্য্যের এখন প্রয়োজন নাই। আচার্য্য উপাচার্য্যের ব্যবসায় বন্ধ হইতেছে।

কে বক্তা, কে শ্রোতা? হরি বক্তা, হরি শ্রোতা। হরি যদি না বলান, কে বলে? হরি যদি না বোঝান, কেই বা

বোঝে? তাঁর শক্তি বিনা সরলতম সত্যকেও কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না; কোন সত্য কাহারও শুনিবার ক্ষমতা হয় না। হরির বলাও চাই, হরির শোনাও চাই। নিজের রসনা ফেলিয়া হরির রসনা গ্রহণ কর; নিজের কাণ ফেলিয়া দিয়া হরির কাণ পর। সুর বোধ না থাকিলে কিরূপে বলিবে? সুর বোধ না থাকিলে কিরূপে শুনিবে? ব্রহ্মসুরবোধ লইয়া নববিধানের গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মসুরে বলিতে হইবে, ব্রহ্মসুর বোধ লইয়া শুনিতে হইবে। এখনকার কথার মধ্যে মনুষ্যের কথা যে নাই, এরূপ বলিতেছি না। যদি থাকে, তাহা অসত্য, তাহা ভ্রান্তি। দিন আসিতেছে, মনুষের রসনাকে যন্ত্র করিয়া ঈশ্বরই কেবল জীবের কর্ণে মধু বর্ষণ করিবেন। ব্রহ্মবুদ্ধি ভিতরে থাকিয়া মানুষের বুদ্ধি উদ্দীপ্ত করিবেন। ব্রহ্মভক্তি ভিতরে থাকিয়া মানুষের বোধকে কার্য্যে পরিণত করিবেন।

জীব, তুমি কেবল বস। জীবের বকাবকি নিস্তব্ধ হউক! এখন হরিকেই শুনিব। আমি যদি গান শুনি, হরিকে গাওয়াইব। যদি গাইতে চাই, হরিকে শুনাইব। এমন ঠাট্টা? হরির কথা শুনিবার সময় মানুষের কথা? প্রাতঃ-কালে প্রদীপ? সূর্য্যের আলোকে আমি, আমার কাছে বাতি ধরিতে চাও? এ কি রাত্রি দুই প্রহর? দূর হও, ক্ষুদ্র মানুষ তুমি! বক্তার সুরের ঘরে চাবি বন্ধ হউক। উপদেষ্টা, চলিয়া যাও। আচার্য্য, চির বিদায় লও। পরমা-

চার্য্য এখন কথা কহিবেন। পৃথিবীর বক্তা শ্রোতা আর চাই না; স্বর্গীয় বক্তা এখন কথা কহিবেন, স্বর্গীয় শ্রোতা এখন শ্রবণ করিবেন। আমি কথা কহিব না, তুমি কথা কহিবে না; আমি শ্রবণ করিব না, তুমি শ্রবণ করিবে না।

কেহ আর আপনি উপাসনা করিও না। যদি ব্রহ্ম আবির্ভূত হইয়া জিহ্বাকে উত্তেজিত করেন, তবেই উপাসনা হইবে। শ্রোতাদের মধ্যে হরি আবির্ভূত, হরি নিজে বসিয়া রহিয়াছেন। বক্তা কি এত বড়, যে নিজে কথা কহিয়া হরিকে পরিতুষ্ট করিবেন? এত সাহস তোমার? এঁরা কে? মানুষের কর্ণে হরি যে। হে পবিত্র বেদি, এ বিশ্বাস ব্যক্ত কর। বেদীই বা কি? আমিই বা কে? এঁরাই বা কে? সকলই অসার। যন্ত্রী কেহ নয়, সমুদয় যন্ত্র। কেউ শোনে না, কেউ কথা কয় না। তুমি অনধিকার চর্চ্চা কেন করিবে? তোমার আমার অনেক বুদ্ধির তৈল খরচ হইল, বেলা পর্য্যন্ত প্রদীপ জ্বলিতেছে। এখন নির্ব্বাণ হউক পুরাণাদি বন্ধ হউক। সকাল যেমন হইল, নববিধানবাদীর প্রদীপ অমনি বন্ধ হউক। তার পর হরি বুদ্ধি দিন বক্তাকে, শুদ্ধি দিন শ্রোতাকে। ইহা হইলেই নববিধান পূর্ণ হইয়া যায়।

নববিধান আসিয়াছেন, এখনও কি বক্তৃতা করিবার ইচ্ছা থাকিবে? বিদ্যার গর্ব্ব ছাড়। কেবল মোহিনী যিনি, বিদ্যা যিনি, তাঁহাকে কথা কহিতে দাও। এই সুসংবাদই প্রচার কর; বিষ ছড়াইবার চেষ্টা আর করিও না। আচার্য্য,

সাবধান! বাতির আলো যেন তিনি আর না ধরেন। আপনাদিগের মনের গরল উদ্গীরণ করিয়া কেহ যেন আর সত্যলোলুপদিগের হৃদয়ে যন্ত্রণা না দেন। আচার্য্য যিনি তিনি বসিয়া থাকুন, উপদেষ্টা মৌনী হইয়া যাউন। হরি রসনাসেতারে অঙ্গুলি দিবেন, রসনাকে ঘুরাইবেন। রসনার তারে চমৎকার ব্রহ্মসঙ্গীত নির্গত হইবে, জীবন্ত ভাগবত বাহির হইবে। শ্রোতারাও বলিবেন, এ কে?

শ্রোতারা এত মোহিত কেন? চিদানন্দঘন বুঝি শ্রোতারূপে? বক্তা প্রীত করেন শ্রোতাকে, শ্রোতা প্রীত করেন বক্তাকে। হরি দুই দিকেই আধার। এক দিকে আরম্ভ করেন, আর এক দিকে যান। এই ভাবে সমস্ত বলিতে হইবে, সমস্ত শুনিতে হইবে। যেখানে বক্তা নিজে বলেন দাঁড়াইয়া, সেখানে বক্তৃতাকে কাটিবে। বলিবে, তোমার গরলপূর্ণ কথা শুনিতে আমরা আসি নাই। দুই দশ দিনের পথ অতিক্রম করিয়া আসিলাম কি মানুষের কথা শুনিবার জন্য? মানুষের কথায় পরিত্রাণ নাই। তোমার আচার্য্যবেশ ছাড়, মানুষরসনা ছাড়। দেবসুর চড়াইয়া দেবগান আরম্ভ কর। ব্রহ্মসুরে যদি গান হয়, বক্তা বলিতে বলিতে ব্রহ্মে মোহিত হইবেন, শ্রোতা শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া যাইবেন। শব্দ যদি ব্রহ্ম হন, মুখে ব্রহ্মশব্দ উচ্চারিত হউক, কর্ণে ব্রহ্মশব্দ প্রবিষ্ট হউক। বলিতে বলিতে স্বর্গ শুনিতে শুনিতে স্বর্গ।

এই কথা বলিয়া কোন্ কথা আরম্ভ করিব? ভগবানের প্রেম। আমরা যাহাকে ভালবাসা বলি, তাহা অনেক প্রকার আছে। উৎকৃষ্ট ভালবাসা বাহির করিতে হইবে। ভগবান অনেক ফুল রাখিয়াছেন। গোলাপ, যুঁই, চাঁপা, কদম্ব, পদ্মফুলে তোমার হৃদয় সাজান রহিয়াছে। ভগবানকে জিজ্ঞাসা কর, কোন্ ফুল ভাল লাগে? কোন্ ফুল তিনি তুলিয়া লইবেন? পদ্ম না গোলাপ? যূঁই না চাঁপা? ভালবাসা কত রকম, ফুল কত রকম। চাঁপার গন্ধ গোলাপে নাই, যূঁইয়ের গন্ধ চামেলিতে নাই। কিন্তু প্রত্যেকটী সুন্দর। যখন মা বলিয়া ডাকি, তখন সুখ হয়; যখন পিতা বলিয়া ডাকি তখনও সুখ হয়। কখনও আবার ভাই বলি, বন্ধু বলি, ঘর বাড়ীও বলি।

যার মাটীর ঘর, খোলার চালই সর্ব্বস্ব, সে ঈশ্বরকে মাটীর ঘর খোলার চাল বলে ডেকেই সুখ লাভ করে। ছেঁড়া মাতুরে শোয় যে গরিব, সে আর কিছু বলিতে না পারিয়া বলে, তুমি আমার ছেঁড়া মাতুর। গরিব গৃহস্থ কি বলিয়া স্তব করিবে? ছেঁড়া মাতুর ছিল প্রিয় তার সংসারে, ডাকিল ঈশ্বরকে ছেঁড়া মাতুর বলিয়া। সেই স্তবের কাছে বেদ বেদান্তের স্তব ভাল লাগে না। সেই স্তব ঈশ্বরের এত ভাল লাগে যে তিনি বলিলেন, ঋগ্বেদের স্তব অপেক্ষা আমি এই স্তব পছন্দ করি। আপনার অন্ন পানে তাকাইয়া বলে এখানে তুমি হরি। ঘরের মাটী চাল দেখিয়া বলে, এই যে মাটী চাল, এই তুমি।

কেউ আবার মুক্তার মালাতেই মোহিত। রাজা যিনি রাজকার্য্য করিতেছিলেন, মুক্তার মালার দিকে দৃষ্টি পড়িল, শোভা সম্পদ নিরীক্ষণ করিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন মাতঃ, আমার মুক্তার মালা তুমি যে! রাজা যিনি, মার ছেলে তিনি। তিনি হাসিলেন। যার যেটী ভাল লাগে, সে সেইটীই ঈশ্বরে, আরোপ করে। কাহারও একখানি ভাঙ্গা ঘর আছে, কাহার একটী ভাঙ্গা হাঁড়ি আছে; একটু ঔষধে কাহারও হয় ত রোগ প্রতিকার হইয়াছে; একটু আগুনে কাহারও শীত নিবারিত হইয়াছে; একটু বস্ত্রে কাহারও শীতের ক্লেশ অপনীত হইয়াছে, একটু ঠাণ্ডা জলে কাহারও তৃষ্ণা দূর হইয়াছে; যাহার যাহাতে কিছু উপকার হইয়াছে, তাহার তাহাই স্তবের উপকরণ হইয়াছে।

বড় বড় বক্তৃতা ঈশ্বরের সমক্ষে করিও না। তাঁহার সমক্ষে বক্তৃতা করার ন্যায় অন্যায়, দুষ্ট কর্ম্ম আর নাই। প্রেমের উচ্ছ্বাস যেরূপে হয়, তাই দেখানই ভাল। ঈশ্বরকে কেউ ছেঁড়া চাল বলিতেছে, কেউ মা বলিতেছে, কেউ পিতা বলিয়া ডাকিতেছে। কেউ বা সন্তানবাৎসল্য ঈশ্বরকে অর্পণ করিতেছে, সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেছে। কেহ, বলিতেছে হরি, তুমি একবার খেলা কর। গাড়ী কিনে দিব, ছোট নৌকায় চড়াইব, আর ঘোড়ার উপর চড়াইয়া তোমাকে লইয়া চলিব। যা বলি মাকে, মা তাই শোনেন। কাটি ধর, কাটি ধরেন। নাচ তুমি, অমনি নাচেন। যা বলি, তাই

করেন। কাগজে নৌকা প্রস্তুত করিয়া তার নীচে তৈল দিয়া পুকুরে ভাসাইয়া বলি হরি, এ নৌকায় তুমি চড়িবে না? হরি বলেন, চড়িব বৈ কি! তিনি বড় সমুদ্র ছাড়িয়া খেলা করিবার জন্য কাগজের নৌকায় চড়েন। কি নাকালই হন তিনি ভক্তের কাছে।

ভক্তের কাছে তিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন, যখনই আমায় ডাকিবে তখনই আমি আসিব, যা আমায় করিতে বলিবে, আমি তাই করিব। এক জন ভক্তের বালিস ছিল না, বলিল, হে হরি, তুমি আমার বালিস। ধরিয়াছে সে কোন মতেই ছাড়িল না। মাথার কাছে রাখিল তাঁহাকে; তাঁহার উপরে মাথা রাখিয়া শয়ন করিল। সমস্ত রাত তাঁহাকে বালিস হইয়া থাকিতে হইল। হরি কি ভক্তের মস্তক আপনা হইতে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাইবেন? কোথায় ফেলিয়া যাইবেন? হরি কি তা পারিবেন? হরি তাহা পারেন না। এমনই করিয়া ঈশ্বরকে লইয়া কত ভক্ত যে কত খেলা করিতেছেন তাহা বলা যায় না। হরি যেন চোরদায়ে ধরা পড়িয়াছেন।

ছেলেরা বলে মা বাপকে, চাঁদ ধরে দিবি না? হরিকে ভক্তেরা বলেন, চাঁদ ধরে দেবে ত দাও, নতুবা আর উপাসনা করব না। ওরে ছেলেগুলো, সমস্ত রত্ন দিব, যা চাহিবে তাই দিব। চাঁদ লইবে কিরূপে? এইরূপে ঈশ্বর ভক্তকে কত বলেন। ভক্ত বলেন, আমি ও কথা শুনিব না; চাঁদ

দেবে ত দাও, নতুবা আর অন্ন গ্রহণ করিব না। আগে আমি চাঁদ লইব। ঈশ্বর এক ছেলে-ভুলান চাঁদ আনিয়া দেন। এত আব্দারে ছেলেও জুটিয়াছে নববিধানে! কেহ বলেন, ঈশ্বর, আমার মাঠ আছে, বাড়ী প্রস্তুত করিতে হইবে। অমুক গ্রাম হইতে দশ জন আসিবেন, অমুক গ্রাম হইতে পাঁচ জন সপরিবারে আসিবেন। আমার টাকা নাই, পয়সা নাই। কাল সকালে আমার বাড়ী চাই। লোকেরা সব আসিয়া বাস করিবেন। অলৌকিক ক্রিয়া করিয়াই হরির নাম বাড়িয়াছে। সেই রাত্রিতেই বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকিয়া বাটী প্রস্তুত করিবার আদেশ করিলেন। ভোর হইতে না হইতে সোণার অট্টালিকা প্রস্তুত হইল। ছিল মাঠ, সোণার বাড়ী কিরূপে হইল? সকলেই এই কথা বলিতে লাগিল।

ভক্ত আবার বলিলেন, ঠাকুর, এত লোক আসিবেন, খাওয়াব কি তাঁদের? এটা তুমি বোঝ না? হরি বলিলেন, তোর চাল ডাল সমস্ত সংস্থানই করিয়াছি; নুন, তেল যা কিছু প্রয়োজন, সব প্রস্তুত। তোর জন্য তালুক রাখিয়াছি, তোর ছেলের ছেলে উপাসনা করিবে, তার আয়োজন করিয়াছি। তোর প্রপৌত্রের বিবাহ হইলে আমি আসিয়া কোথায় বসিব, সেই সিংহাসনেরও বায়না দিয়াছি। ভক্ত শুনিয়া জব্দ হইয়া পড়িলেন। যেমন ভক্তের প্রার্থনা, তেমনই হরির উত্তর। আগে প্রার্থনা ছিল, এখন কেবল তাঁর মুখ

তাকিয়ে থাকা। যাহা কিছু প্রয়োজন, হরি নিজেই সমস্ত প্রদান করিবেন।

হরিকে লইয়া কত রকম খেলাই হইল; বাপ মা বলা হইল, সমস্ত ফুলই দেওয়া হইল। কত ফুল বৎসর বৎসর ভক্তেরা দিয়াছেন। যূঁই, চামেলি প্রভৃতি নানা ফুলের মালা গাঁথিয়াও দেওয়া হইয়াছে। এ সমস্ত ত জান; কিন্তু এবার কোন্ ফুল দিতে হইবে? এবার এ কি? এমন ফুল বুঝি চাই, যাহা আমাদিগের ডালিতে নাই? কোন ফুল ভুল হইয়াছে বুঝি? বাগানে এমন ফুল আছে কি যাহা আনিতে ভুলিয়াছি? আমাদের বাগানে নাই, অন্যের বাগানে আছে, এমন কোন ফুল বোধ হয় আনা হয় নাই। বাগানে পাওয়া যায় এমন কোন ফুলের নাম শুনিয়াছি, অথচ বুঝি আনিতে পারি নাই। ঈশ্বর যে আমাদের ফুল ছুঁলেন না। আজ দেখ্‌ছি উৎসব বন্ধ হয়। এত পছন্দ করিয়া তোড়া বাঁধিলাম, কৈ হরি তো আমার ফুলের তোড়া হাতে করে লইলেন না। ভক্তেরা সব স্তম্ভিত। ইনি ওঁর কাণে বলেন, উনি এঁর কাণে বলেন আজ মা কেন এমন অপ্রসন্না হইলেন? কোন গুরুতর অপরাধ হইয়াছে বুঝি? ফুলে কোন রূপ দুর্গন্ধ ত নাই? বাসি ফুল ত নয়? উদ্যানের ফুল না দিয়া বাজারের খারাপ ফুল ত আনি নাই? মা বল, মা বল, কেহই এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করে না।

ভাবুকের প্রতি আজ্ঞা আছে, ইসারায় বুঝিয়া লইতে

হবে। ভাবুকের ভাবের ঘরে চুরি হইল। ভাব হে ভাবুক, কি ফুল তোমার ডালিতে নাই? সতীত্ব ফুল। ভাবের ভাবুক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন, ডালিতে সতীত্ব ফুলের অভাব শুনিয়া। পিতা ভাবে, মাতা ভাবে, বন্ধু ভাবে, পুত্র ভাবে, প্রিয় বস্তু ভাবে, সকল ভাবেই সম্বোধন করা হইয়াছে; কিন্তু সতীর ভাব ব্রাহ্মেরা এখনও দিতে পারেন নাই। মা কি সহজে বিষণ্ণ? সুন্দর সুন্দর ফুল আমরা আনিয়াছি, তিনি প্রেমরসে রসাভিষিক্ত হইয়া লইতেছেন না কি সহজে? রসবিহীন ফুল কি তিনি স্পর্শ করিবেন? পুরুষ না নারী তোমরা? পুরুষ। ভগবতী চলিয়া গেলেন। দ্বার বন্ধ হইল। ফুলগুলি আকাশে উড়িয়া গেল; কতক পথে, কতক সমুদ্রে। উপাসকেরা হাঁ করিয়া বসিয়া। একেবারে স্বর্গের দ্বার বন্ধ হইল। কি জন্য? নারী ভিন্ন আর কেহ ব্রহ্মের দ্বারে প্রবেশ করিতে পারে না।

যতক্ষণ না নারী হইয়া সতীত্ব ফুল লইয়া ব্রহ্মের দ্বারে যাওয়া যায়, ততক্ষণ কেহই গৃহীত হয় না। বেল যূঁই দিয়াছ, আমরাও দিয়াছি। নববিধানে ঈশ্বর এবার এই ফুল চাহিতেছেন, অতএব সতীত্ব ফুল যেখানে পাও, আন। কাহার বাগানে স্বামীর প্রতি অব্যভিচারী প্রণয়ফুল ফুটিয়াছে? যে প্রণয় পতি ভিন্ন আর কিছু চায় না, যে প্রণয় পতির নামই কেবল উচ্চারণ করিতে চায়, যে প্রণয়ে পতিতেই কেবল মোক্ষ জ্ঞান হয়, সে প্রণয় কোথায়?

কলিকাতায় সে ফুল নাই, হিমালয়ে নাই. বৃন্দাবনেও নাই ; কিন্তু নববৃন্দাবনে আছে। নব বসন্ত সমাগমে সে ফুল ফুটিয়াছে ; যাও সেখানে সে ফুল আন। নতুবা দ্বার বন্ধ।

রেল পথে যাও, অশ্বারোহণে যাও, জলপথে কি স্থলপথে, যে পথে হয় যাও। সুলক্ষণাক্রান্ত হইয়া যাও, ফুল আনয়ন কর, বিপদভঞ্জন হরি দ্বার খুলিবেন। দয়া করিয়া আবার দ্বার উন্মোচন করিবেন। পলকের মধ্যে ফুল আনিতে হইবে। এক মিনিটের মধ্যে রামায়ণ, মহাভারতেরও ব্যাপার শেষ হইবে। পুরুষেতে সতীত্ব, যেমন শুনিবে, লক্ষ লক্ষ লোক অমনি মস্তক ছেদন করিতে চেষ্টা করিবে। পৃথিবীর রাজার বিচারে সতীত্বফুলে পুরুষের অধিকার নাই। সতীত্ব পুরুষ! বা রে! কি ভয়ানক কথা! পুরুষ সতীত্বকে লইয়া আসিবে, পুরুষধর্ম্মের ব্যাকরণে ইহা ভ্রান্তি। বুদ্ধি-মানেরা উপহাস করিবে। যাহারা পতিতে সন্তুষ্ট নয়, তাহারা খড়্গ লইয়া তোমাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য পথে প্রতীক্ষা করিবে।

পুষ্পস্পৃহা যাহার বলবতী, খড়্গহস্তে দৌড়িল সে ব্যক্তি। সম্মুখস্থ যুদ্ধে যাহারা আসিল তাহারা সব পরাস্ত হইয়া চলিয়া গেল। সতীত্বফুল নববৃন্দাবনে ঢাকা আছে। পাহাড় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল, সতীত্বকুসুম লাভ করিল। কি মজার জিনিষ! এমন জিনিষ চক্ষু দেখে নাই, এমন বস্তুর কথা কর্ণ আর শ্রবণ করে নাই, এমন শ্রী

মন আর ভাবিতে পারে না। শ্রীবৃন্দাবনের সদ্যোজাত সতীত্বফুল লইয়া ফিরিল। আবার উৎসবের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। ঠিক যেন মধ্যে একটী গল্প হইয়া গেল।

ঈশ্বরের নিকট পতিপ্রিয় সতীর ন্যায় যাইতে হইবে। ব্রহ্মাণ্ডপতিই পতি। তিনি ভক্তের পতি। সতীত্বের ন্যায় অধিক ভালবাসা কি আর আছে? পিতার ভালবাসা, ভাই বন্ধুর ভালবাসা উৎকৃষ্ট। কিন্তু উৎকৃষ্টতর আসিলে উৎকৃষ্টও নিকৃষ্ট হইয়া যায়। পিতৃভক্তি মাতৃভক্তি সকলই ঈশ্বরকে দেওয়া হইয়াছে। এবার সতীর প্রেম দিতে হইবে। সতীর প্রেমের ন্যায় আর প্রেম নাই। এই শাস্ত্র অভ্রান্ত, উৎকৃষ্ট শাস্ত্র। সতীর সতীত্ব লাল ফুল। কত চিত্র বিচিত্র করা তাহাতে, পিতৃভক্তি, বন্ধুর প্রণয়, ভ্রাতৃস্নেহ এ সকল যাহার মধ্যে আছে। ইহা যেন একটী নূতন ফুল। ইহা প্রণয়পূর্ণ। স্বামীই সতীর সর্ব্বস্ব।

নিরাশ্রয় অবস্থায় সতী কন্যারূপে স্বামীর সেবা করেন; কখন ভগিনী ভাবে পতির মুখপানে চাহিয়া হাস্য করেন। কোন ভাবই সতীত্ব ভাব হইতে ছাড়া নয়। একটী ফুল পরিত্যাগ করিয়া সতী আর একটী ফুল লন না। তুলসী ছাড়িয়া তিনি জবা গ্রহণ করেন না। উদ্যানে যখন সতী প্রবেশ করেন, সকল ফুলের উপরেই সতীর হস্ত পতিত হয়। ভাই ভগিনীকে খেলা করিতে দেখিলে সতী ভাবেন, আমরা কেন এইরূপে খেলা করিব না। স্বামী স্ত্রীতে মিলিয়া

ভাই ভগিনীর সুখ কেন লাভ করিব না? আমরা কি ভাই ভগিনী নই? সেই সম্বন্ধ ত ঘুচে নাই। বিবাহ হইলে সেই সম্বন্ধ আরও প্রগাঢ় হয়। সতী স্বামীকে ভাই ভাবে ফোঁটা দিতেও পারেন।

আবার যখন স্বামী শয্যাতে শয়ান, উঠিবার সামর্থ্য নাই, রোগে জর্জ্জরিত, মাতার ন্যায় গম্ভীর ভাবে শুশ্রূষা করিতে স্ত্রীর ন্যায় আর কেহ নাই। স্বামীর তখন মা বাপ ভাই বন্ধু যা বল সবই একজন। টাকা স্ত্রীর হস্তগত, পাইয়াছেন স্বামীর কাছে; এবার স্বামীকে দিবার সময়। ভাল বেদানা কোথায়, মিশ্রী কোথায়, স্ত্রী কেবল এই বলেন। স্বামীর জন্য স্ত্রী মাতার কার্য্য করেন। স্বামী যিনি, তিনি এখন কেবল স্ত্রীর হৃদয়ে দয়া উদ্দীপন করিতেছেন, তাঁহার মহত্ত্ব ঘুচিয়াছে। বিদ্যা বুদ্ধি এখন কোন কাজেই আসিতেছে না। খাওয়াইলে তিনি খান, উঠাইলে তিনি উঠেন।

সতীর প্রেম কি সুন্দর! স্বামীর হাত নাই, কোন কাজ করিতে পারেন না; সতী আপনার হাত দিলেন। উনি শুনিতে পাইতেছেন না, সতী নিজে কর্ণ হইয়া শুনান। মন হয়ে কত ভাল ভাল বিষয় ভাবান। আর মার কর্ম্ম বাকী কি বল? অধিক বয়সের স্ত্রীর অর্থই মাতৃতুল্য। সমস্ত দিবস পরিশ্রম করিয়া, পাঁচটা পর্য্যন্ত কার্য্যালয়ে কার্য্য করিয়া স্বামী গৃহে আসিলেন, গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা সতী গাত্রে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। এমন পতিমর্য্যাদা কে জানে?

কে আর এমন করিয়া পতির সেবা করে? সতী যে এ সব কার্য্য করেন তাহা কি টাকার লোভে? না দশ জন লোকে তাঁহার নামে কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রস্তুত করিবে বলিয়া? পাড়ার লোকের সুখ্যাতির জন্য কি সতী পতিসেবায় ব্যস্ত হন? না। পতি যে তাঁহার সর্ব্বস্ব, পতিই তাঁহার ভাল লাগে।

পতির যাহা কিছু তাহাই তাঁহার নিকট সুন্দর ও মিষ্ট। সারঙ্গের সুর, এস্‌রাজ বাজানও সতী শুনিয়াছেন, কিন্তু স্বামীর কণ্ঠের নিকট সে শব্দও তাঁহার মিষ্ট বোধ হয় না। কোকিলেরও প্রাধান্য হইল না সতীর কাছে। পতির কণ্ঠের সুরকে সতী সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট বলেন। সতী কেন এমন বলেন? অলঙ্কার শাস্ত্রের অত্যুক্তির পরিচ্ছেদ বুঝি সতী ভাল করিয়া পাঠ করিয়াছেন। সতীর কাছে এ সব অত্যুক্তি নয়। সতী জানেন, যথার্থ বিদ্যা তাঁহার পতিই জানেন। স্ত্রীর নিকট যদি স্বামী অবস্থান করেন, যদি স্বামী গৃহরক্ষায় নিপুণ হন, তাহা হইলেই তিনি সতীর নিকটে বিদ্বান্। স্বামী যে বেদ জানেন না সে জন্য সতী তাঁহাকে মূর্খ বলেন না। সেই নির্ব্বোধই সতীর সুবোধ।

স্বামীর মুখের কথা সতীর এত ভাল লাগে যে বেদ না শুনিয়া সতী কেবল তাহাই শ্রবণ করেন। স্বামীর মুখ যে কাল, মলিন, স্বামী যে রোগে শীর্ণ, সতীর তবুও সুন্দর বোধ হয়। তিনি বলেন, গোলাপও এমন সুন্দর নয়। স্বামী-ফুলের মত কোন ফুলই নয়। সতী যে এরূপ কথা বলেন, কে

শিখায় তাঁকে? ব্রহ্ম না শিখাইলে তিনি কেমন করিয়া বলেন? পাগলিনি, আমরা যে দেখিয়াছি, পরীক্ষা করিয়াছি, তোমার স্বামী আকৃতিবিহীন, রূপবিহীন, তুমি নির্ব্বোধের ন্যায় এমন উক্তি কেন করিতেছ? সতী আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, আমার কাছে আমার স্বামীর রূপ গুণ আছে। সতীর স্বামীই সর্ব্বস্ব।

যেমন ঈশ্বর অতুল নিরুপম, ঠিক স্বামী পত্নীর পক্ষে সেইরূপ। সতীর যেমন দ্বিতীয় পতি থাকিতে পারে না, ব্রহ্মভক্ত তেমনই বলিতে পারেন না যে জগৎপতি আর একজন আছেন। অন্য পতি আছে বলিলে তাঁহার গলা কাটা হয়। সতী পত্নী বলেন, অন্য স্বামী কি? আমার স্বামীর পদ মুছাইব আমি কাপড়ের অঞ্চলে। আমার মোক্ষ মুক্তি এই পতিসেবাতে। যে ফুলে প্রাণপতি মোহিত হন সতী সেই ফুলই অন্বেষণ করেন। সতী যে চেষ্টা করিয়া পতিমর্য্যাদা শিখিয়াছেন তাহা নহে। আপনিই আপনার সরস্বতী। ব্রহ্মপতি যাহার পতি, তাঁহারও তেমনি।

পতি ভিন্ন আর তাঁহার কিছুই ভাল লাগে না। লজ্জায় তিনি সুশোভিত। লজ্জাই তাঁহার মুখের লাবণ্য। ব্রহ্মকে পাইলে তিনি বলেন, জীবনের সাধ মিটাইয়া এখানে আসিয়া প্রাণপতিকে পাইলাম। ব্রহ্মই প্রাণপতি। ব্যাকরণের কিছুই ভুল নাই। কি বেদ বেদান্ত, কি শিখধর্ম্ম, কি ইংরাজধর্ম্ম, সকল ধর্ম্মই তাঁহাকে পতি বলিয়া থাকেন। জগৎপতি স্বর্গপতি

তিনি যদি সাধারণ ভাবে পতি হন, তবে এক একজনের পতি না হইবেন কেন? আমি কি এমনি কুলটা যে আমি তাঁহাকে পতি বলিব না? সকলের পতি হইবেন তিনি, কেবল আমিই বাদ পড়িব? তিনি জগতের পতি, কেবল কি আমারই পতি নন? এই পথে ব্যভিচার কণ্টক। অন্য কণ্টক নাই, জ্ঞান চাই না। পতিভক্তি থাকিলে পতি কাছে আসিতে দিবেন। মানুষ পতির ন্যায় তিনি নন, নিরাকার পতি ব্রহ্মপতি। আমি বালিকা পত্নীর মত তাঁহার পানে চাহিব। সতী দাসী হইয়া আমি তাঁহার কাছে থাকিব। আমি তাঁহার পদার্চ্চনা করিব। আমার ধনপতি, সংসার-পতি বন্ধুপতি ছিল। সকলে হাত ধরিয়া রাস্তার কাঙ্গাল করিয়া বসাইল। এখন সাত পতি অর্চ্চনা না করিয়া আসল পতি ব্রহ্মপতির শরণাগত হইব।

ধন মান কি তোর স্বামী হইতে পারে? রে অবোধ মন, তোর পতি খোঁজ। খুঁজিয়া পতিকে বাহির কর। আমা-দের কি অন্য পতি ছিল না? তোমরা মনে করিয়াছিলে কলঙ্কের হাত এড়াইবে। তুমি জান না যে টাকাকে পার্শ্বে বসাইয়া তুমি সেবা করিয়াছ। ব্যভিচারিণি, পলায়ন কর। পুরুষ বলিয়া কি ক্ষমা পাইবে? পুরুষের শরীর পাইয়াছ বলিয়া কি কলঙ্কের ভাগী হইবে না? আমাদের পতি ঘরে রহিয়াছেন, কল্পনা করিয়া কেন তুই পতি প্রস্তুত করিস্? কে তোর পতি? কারে বলিস্ পতি? জগৎপতি যে তোর

স্বামী। ঐশ্বর্য্যশালী যিনি, যাঁহাকে দেখিয়া মন মোহিত হয়, তিনি যে কাঙ্গালিনীর পতি। তিনি আপনি বলিয়াছেন, আমি কাঙ্গালিনীর পতি। এই ছেঁড়া কাপড় যার, কাঙ্গালিনী যে, সে আমার স্ত্রী।

হায় জীব! তুই কি করিলি? প্রেমকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কেন পাঁচ হাতে দিলি? ওরে তুই যা দেখিস্ তাইতে মুগ্ধ হইস্? খাবি যদি তবে খাদ্যেই মুগ্ধ হইস্? পুস্তকে মুগ্ধ হইস্? অবিদ্যাতে মজিস্? হায় রে! তোর ভগবান পতিকে ছাড়িলি? যাঁর এমন মনোহর লাবণ্য তাঁকে ফেলে দিলি? এ যে ভয়ানক পৌত্তলিকতা। সংসারপতির নিকট কাঁদিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলি। ভগবানপতি সকলই শ্রবণ করিতেছেন। যেন আমাদের পতি নাই, এই ভাবে আর পরের কাছে যাইব না। অবলাকে আশ্রয় দাও, অবলাকে আশ্রয় দাও বলে আর কাহারও দ্বারে দাঁড়াইব না। প্রেমের ভাবে কেবল এক পতিকেই দেখিব। আর যেন কিছুই নাই।

যা ভালবাসিব পতিকে, পতিকে ভালবাসাতেই পতির জিনিসে ভালবাসা। পতি গোলাপকে ছুঁয়েছেন তাই আমার গোলাপ ভাল লাগে। গোলাপ বুকে রাখিলে আমার হৃদয়ের শোক চলিয়া যায়। কেন না, আমার পতি যে গোলাপকে স্পর্শ করিয়াছেন। আমার পতি চাঁদকে আপনি স্পর্শ করিয়াছেন, তাই চাঁদ হয়েছে প্রিয়, পতিচাঁদের জন্য। আমার পতি

নদীর উপর, তাই নদীর শোভা ভাল লাগে। আমার পতি আকাশে, সেই জন্য আমার আকাশ দেখিতে ভাল লাগে। আমি যে আমার পতির দাসী। আমি আর স্তব করিব কি? বেদ বেদান্ত ছেড়ে, ভাগবত ছেড়ে পতিকে চেনাই আমার সার জ্ঞান। পতি কি সামান্য ধন? পতিসেবাতেই জীবন কাটিয়া যাউক। পৃথিবীতে আসা এ জন্য যে শুদ্ধ পতির এক বিন্দু পদরেণু লইয়া এ পৃথিবীতে কৃতার্থ হইব। সাবিত্রী-ব্রত ধরিয়া সত্যবতী সতী হইব; কেন না, সত্যবান্ পতিকে লইতে হইবে।

আমি কার ঘর পরিষ্কার করি? কার ঘরে পরিশ্রম করি? পতির বাড়ী না হইলে আমি স্পর্শও করি না। আমার পতির খোলার ঘর হউক না, দাসীর জীবন সেই ঘরেই পতিসেবা করিয়া পবিত্র ও কৃতার্থ হইবে। পতির ঘর যেরূপই হউক, সতী দাসী তাই সাজাইবে। কাঙ্গালিনীর পতিই সার। পতি যা বলিবেন তাই মিষ্ট। গানবিদ্যা সমস্ত একত্র করিলেও পতির স্বর সতীর কাছে মিষ্ট বোধ হয়। সতীর আর কিছু তদপেক্ষা ভাল লাগে না। সতী বলেন পতির কাছে যাইব, পতির কথা শুনিব। কাঠকুড়নীকে জগৎপতি, স্বর্গপতি কি কাছে যাইতে দিবেন? বলিব, পতি, উপযুক্ত কি হইয়াছি? ছোঁবে না কি কাঙ্গালিনীর ডালি? পতি বলেন, আর কিছু চাই না; কেবল তোর চক্ষু আমার পানে থাকুক।

তোমরাও ত জান, স্ত্রী যদি খুব পরিশ্রম করে, তাহা হইলেই কি স্বামী তুষ্ট হন? সতীর প্রেমই স্বামীর পক্ষে শ্রেষ্ঠ। পতি আশীর্ব্বাদ করেন সতীকে "তোমার কুশল হউক!" সতী বলেন লোকে জানে একটী গোলোক আছে, একটী স্বর্গ আছে, একটী বৈকুণ্ঠ আছে; পতির হাস্যবদনই আমার সেই স্বর্গ, সেই বৈকুণ্ঠ, সেই সমস্ত। ব্রহ্ম-পতিকে সতীর প্রেম দাও, চক্ষু দেখিয়াই তিনি বুঝিবেন প্রেম আছে কি না। অব্যভিচারী প্রেম যদি চক্ষে থাকে ঈশ্বর বলিবেন, ঐখানে বস। আমার কাছে আসন গ্রহণ কর। তোমার নববিধান সাধনের সুযোগ হইবে। তপস্যা করিতে হইবে না। সতীত্বফুল লইয়া বস, ছোট ছোট রমণীর ন্যায় তাঁর কাছে যাও। সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হইবে।

এক পতিকে সমস্ত টাকা কড়ি বলিয়া জানা, ইহলোক পরলোক বলিয়া জানা, ইহা কেবল সতীই জানেন। পুরুষ-দিগকে আশীর্ব্বাদ কর, হে ঈশ্বর, যেন সকলে সতীর প্রেম তোমায় অর্পণ করিতে পারেন। আর কিছুই ভাল লাগে না। আগে বলিতাম বেদ থেকে উপদেশ লও, পুরাণ হইতে উপদেশ গ্রহণ কর। ঈশার বিবেক লও, অমুকের ভক্তি লও, পাঁচটী ফুল তোল। ভাল করিয়া মালা গাঁথিয়া পর। প্রেমের মত্ততার, ভালবাসার ভিতরে পাঁচ নাই। দ্বিতীয় তৃতীয় নাই। পৃথিবীতে গুরু নাই, ভাই ভগিনী নাই। জগৎপতিই সমস্ত। পতিফুলই প্রিয় ফুল। সতীর কাছে

পতির বাড়ীর ভাঙ্গা জানালাটীও ভাল। পতির বাড়ীর লোক তোমরা পতিকে না চিনিলে তোমাদিগকে কিরূপে চিনব? জগৎপতি যদি প্রিয় নহেন, তোমরা প্রিয় হইবে কিরূপে? পতি ঘর বাঁধিয়াছেন, পতির হাতের রচনা তোমরা। পতিকে সর্ব্বদা দেখিতে পাই না, মূঢ়মতি আমি; এই সকল মানুষ করিয়াছেন তিনি, দেখিয়া সুখী হই। এঁদের ভালবাসিয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে পারি না। তাঁকে ভালবাসি বলিয়াই এঁদের ভালবাসা।

পতি যাহাতে বিরক্ত না হন তাহাই আমার কার্য্য। তাঁর যত কুটুম্ব সব আমার কুটুম্ব। পতির জীবন আমার প্রিয়। যত ভক্ত সতীর ন্যায় ব্রহ্মপতির চরণে প্রণাম করেন। কাহারও পানে আর তাকান না। যার মুখে পতির ছাঁচ, পতির হাসি, পতির অধিকার, সতী তাহাকে দেখিয়াই সুখী। লোকে মনে করে, আমি সুবিদ্বান মহর্ষি প্রভৃতির মুখ দেখিয়া সুখী হই, তাঁহাদের নমস্কার করি। তাঁদের দেখে সুখী হইব? আবার ঋষিপ্রেম? পতিকেই দেখিতেছি। মানুষ আর মানুষ নহে। জীবে ব্রহ্ম অবতীর্ণ। নদ নদী গাছ পালা সমস্ত পদার্থেই আমার ব্রহ্মপতি। তাই সকলের সৌন্দর্য্য। এই সৌন্দর্য্য দেখিয়া এবার সুন্দর হইব। ছিলাম উদাসীন, এবার গৃহস্থ হব। এবার সপরিবারে গৃহ-ধর্ম্ম সাধন করিব। সকলে মিলিয়া সতীত্বধর্ম্ম পালন করিব। এবারকার উৎসব সতীদিগের উৎসব হউক! পতির মুখ

দেখিয়াছি বলিয়া সকলে পাগল হইয়া যাও। আপনার আত্মাকে সুন্দর কর। পতির পদ ধারণ করিয়া সকল দুঃখ সন্তাপ নিবারণ কর।

প্রেমের গূঢ় তত্ত্ব।

রবিবার ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৪ শক; ২৮শে মে ১৮৮২।

অপরাহ্ণে শয্যায় পড়িয়া ভাবিতেছিলাম যে, প্রেম যে বস্তু,—ইহা এত পক্ষপাতী হয় কেন? প্রেমেরই চিন্তায় নিযুক্ত হইলাম; প্রেমসম্বন্ধে চিন্তা শান্ত হৃদয়ে উত্থিত হইল; উৎকৃষ্ট সদুত্তরও লাভ হইল। কি শুনিলাম, কি বুঝিলাম, বেদী হইতে তাহাই বলিতে আসিয়াছি। বাস্তবিক প্রেম কি, প্রেমের স্বভাব কিরূপ, ইহা কেবল যাঁহারা ভালবাসিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। হয় পিতা মাতাকে, না হয় ভাই ভগ্নীকে, না হয় দেশের লোককে, না হয় পৃথিবীকে ভালবাসিয়া কি নীচ, কি উচ্চ সকল শ্রেণীর লোকেই প্রেমের আস্বাদ সুখ জানিয়াছেন। হে শ্রোতা, যদি প্রেম কিরূপ জানিতে চাও, ভালবাসা কি বস্তু বুঝিতে চাও, তবে এই জানিতে হইবে যে, যাহাকে ভালবাসি তার প্রতি পক্ষপাতী হইতে হয়। পক্ষপাত শূন্য ভালবাসা হয় না। যেমন ত্রিকোণবিশিষ্ট গোলাকার হইতে পারে না, সেইরূপ পক্ষপাত-বিহীন ভালবাসাও অসম্ভব। যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে

পিতা মাতার উপরে একটা অধিকতর অনুরাগ থাকিত না, স্ত্রীর স্ত্রীত্ব, বন্ধুর বন্ধুত্ব, পুত্রের পুত্রত্ব চলিয়া যাইত। বন্ধু, বন্ধু বলিয়া কখনই পরিচিত হইতে পারিতেন না। এই যে সকল নাম, ইহা ভালবাসাই দিয়াছে; ভালবাসাই উপাধি দ্বারা সকলকে চিহ্নিত করিয়াছে।

আমার ভালবাসা যে পাঁচ জনের উপর, সে স্বতন্ত্র; কিন্তু হৃদয়ের অনুরাগ একজনেরই উপর। সে যে একজন, যাঁহাকে ভালবাসিয়াছি, যাঁহাতে মত্ত হইয়াছি, মুগ্ধ হইয়াছি, তাঁহার যেমন গুণ, রূপ, এমন আর কাহারও নাই। এই কথা বলিতেছি আর জানিতেছি যে তোমরাও ইহাতে সায় দিতেছ, কেন না ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত, সংসারে প্রেমের ইহাই সার কথা। বিভিন্ন অবস্থায় সকলেই ইহা স্বীকার করেন। প্রেম যে কাণা, এই প্রবাদের মূল কি? যদি ভালবাসিতে যাই, একজনকে বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিয়া আর সকলকে সাধারণ বলিয়া গণ্য করিতেই হইবে। সমুদয় মনুষ্যেতে যে অনুরাগ, সে অনুরাগের মূল্য কম। একজনে যে প্রেম নিবদ্ধ হয়,—পিতা মাতাকে, কি সাধু সজ্জনকে, কি শ্রীঈশাকে, কি শ্রীচৈতন্যকে—এইরূপ অল্পের মধ্যে যে প্রেম জন্মে, তাহার মধুরতা অতিশয়; তাহাতে অত্যন্ত মিষ্টতা। যত বিস্তৃতি হ্রাস করা যায়, প্রগাঢ়তা ততই বৃদ্ধি পায়; প্রীতি, অনুরাগ, প্রেমসম্বন্ধে এই নিয়ম।

অপরাহ্নে যে প্রশ্ন হৃদয়ে উঠিল, এইরূপে সূক্ষ্মতর ভাবে

তাহার মীমাংসা হইল। প্রেম যখন হয়, তখন সে কাণাই হয়; নতুবা স্ত্রীকে ভালবাসা যায় না, আপনার ছেলে সুন্দর হয় না। পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিলেই, শাস্ত্রের দোহাই দিলেই প্রেম চটিল। সকল ছেলে সমান, সকল গুরুজন সমান, এই যদি বল, দেখিবে আর প্রেম নাই, বন্ধুতা নাই। ভালবাসা দিতে গেলেই আপাততঃ চক্ষু দুটা বন্ধ করিতে হয়। চক্ষু দুটা প্রেমের কণ্টক। প্রেমে এক এক বস্তুকে সুন্দর দেখায়। মানুষ মনে করে আমার ছেলেটী যেমন, এমন সুন্দর ছেলে আর নাই। আমার ভাইএর বিদ্যা যেমন, এমন আর কারও নয়; আমার বাড়ীতে যেমন শান্তি, এরূপ আর কোন স্থানে দেখা যায় না। আমি যে আঁবের চারা পুতিয়াছি, তার যে ফল হইবে, তার মত মিষ্ট দেখা যায় না। ফল এখনও হয় নাই, ভবিষ্যতের ফলও প্রেমিকের বিশ্বাসে মিষ্ট। প্রেমেতে মানুষ বলে, আমার যে ভাঙ্গা ঘর, তার ভিতর হইতে যেরূপ প্রকৃতির শোভা দেখিতে পাওয়া যায়, আমার ভাঙ্গা জানালা দিয়া যেমন গাছ পালা দেখা যায়, এমন আর কোন গৃহের ভিতর দিয়া দেখা যায় না। ভগ্ন গৃহও এত ভাল লাগে। আমি যে নৃত্য করি এমন নৃত্য কাহারও নয়। যে আপনাকে ভালবাসে, সে এইরূপই মনে করে। যে কোন বিশেষ ব্যাকরণের পক্ষপাতী, সে বলে পাণিনি অপেক্ষাও এই ব্যাকরণ উৎকৃষ্ট। যে কোন বিশেষ কবির পক্ষপাতী, তার বিবেচনায় সেরূপ কবি আর

ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করে নাই। প্রেমিকের দৃষ্টিতে কোন সাধুকে দেখ, চমৎকার শ্রেষ্ঠ রঙ্গে তাঁহাকে অনুরঞ্জিত দেখিবে; এমন নাই, ভাবিবে। এমন আর নাই, ইহাই প্রেমের মহামন্ত্র। যদি এমন আর থাকে, তবে আর প্রেম থাকে না। কেন এরূপ হয়? প্রেম যে বস্তু, তাহাতে অত্যুক্তি করিতেই হইবে। এমন কি এই অত্যুক্তিতে মিথ্যা কথাও দেখা যায়। কদাকার শিশু হইলেও পিতা মাতার নিকটে সুন্দরতম, উৎকৃষ্টতম, মনোহরতম। এই অত্যুক্তিতে মিথ্যাদোষ পড়িতেছে, অথচ ইহা পৃথিবী ক্ষমা করিতেছে। পৃথিবীর সকলেই জানে যে, ভালবাসিতে গেলে এইরূপই হয়।

ইহার নিগূঢ় অর্থ এই যে, ঈশ্বর ভিন্ন প্রেমের বস্তু আর হইতে পারে না। সমুদয় প্রেম চরিতার্থ হয়, সেই দেবদেবে প্রেম হইলে সেই সৎস্বরূপের পদ ভিন্ন ভালবাসা কিছুতেই স্থাপিত হইতে পারে না। সর্ব্বাপেক্ষা প্রেম তাঁহাকেই কর, সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসা তাঁহাকেই কর, ঈশ্বরকে পতির পতি বল, দোষ হইবে না। তাঁহাকে পুত্র ভাব, স্ত্রী ভাব, পিতা ভাব, ঘর বাড়ী ভাব, ইহ পরলোক জ্ঞান কর, অত্যুক্তি আর হইবে না। বল, এমন বস্তু নাই, এমন বন্ধু নাই; ক্রমাগত বল, অত্যুক্তির পর অত্যুক্তি কর, দেখিবে যে উৎকৃষ্টতাব্যঞ্জক সমস্ত শব্দ দিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই জন্য ঈশ্বরেতেই পক্ষপাতী হইয়া প্রেম দিতে হয়। কাহাকেও যদি ভালবাসিতে যাও পক্ষপাতী হইবেই হইবে, অথচ

তার সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যাবাদী হইয়াও পড়িতে হয়। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি প্রেম হইলে যদি বল, এমন আর হইতে পারে না, কিছুই দোষ হইবে না। আজ প্রাতঃকালে যেরূপ দেখিলাম, সেরূপ রূপ আর কাহারও নাই; কোন কবি আসিয়া সে রূপের চিত্র আঁকিতে পারে না। এই ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্ম যিনি তিনি যোগী, ভক্তদের শ্রেণী দিয়া গিয়া একটী অন্ধ প্রেমিকের দলভুক্ত হন। এখানে একটু গোঁড়ামির ব্যাপার।

প্রেমের বস্তুকে যদি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রেম জন্মিয়াছে। বল দেখি, যেমন সুখ দিয়াছেন ঈশ্বর, এমন আর কেহই দিতে পারে না। এই চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর তিনি কেবলই সুখ দিয়াছেন, একটীও দুঃখ দেন নাই, এই অত্যুক্তি কর দেখি। বল দেখি, তিনি রাঁধেন, আমি খাই, তিনি ধন দেন, আমি ধনী হই। সম্পূর্ণ পক্ষপাতী হইয়া বল, এমন সুখ আর কেহই দেয় নাই; ইনি একদিনের জন্যও আমায় কষ্ট দিলেন না। যত দুঃখ ছিল সমস্ত অবসান করিয়া কেবলই সুখ শান্তি দিলেন। এতগুলি উপাসক উচ্চৈঃস্বরে বলুন, চির জীবন কেবল সুখই দিয়াছেন; একটী দুঃখ হইল না, আঙ্গুলে একটী ব্রণ হইল না, শিরে একটী আঘাত লাগিল না; অকারণ কষ্ট যন্ত্রণা এ জীব কিছুই জানিল না। ঈশ্বর এমনই ভালবাসেন যে, সুখের শয্যাতেই সতত রহিয়াছি,

বাগান বাড়ীতেই তিনি বাস করাইতেছেন; কুবেরের ধন সম্পত্তিতে রাখিয়াছেন। যিনি এ কথা বলিবেন, তিনি কি মিথ্যাবাদী হইবেন? যদি কেহ ডাকিয়া বলে, "ওহে শোন, ঈশ্বর আমাকে অনেক ধন দিয়াছেন, অনেক সুখ দিয়াছেন, ওহে, ঈশ্বর আমাকে যে আনন্দে রাখিয়াছেন, তাহা আর বলিয়া শেষ করিতে পারি না।" পৃথিবী তাহার কথা শুনিয়া বলিবে, "সত্য কি মিথ্যা? এই যে ব্যক্তি বলিতেছে, এতো গোঁড়ামির কথা উচ্চারণ করিতেছে, ইহার কথা কি যথার্থ?" পৃথিবী সন্দেহ করিবে বটে, কিন্তু পৃথিবী যাহাকে মিথ্যা ভাবে, তাহার ভিতরেও সত্য আছে।

তোমার প্রেমের নয়নের কাছে, কষ্টের ব্যাপার নাই। জ্বর হইল, ধনহানি মানহানি হইল, ঘরে বিপদ ঘটিল, প্রেম সকলই ভুলাইয়া দিয়াছে। পিতা আমার এমন যে, তাঁর উপর কোনও দোষ আনা যায় না। কি চমৎকার তাঁহার মুখখানি! কি চমৎকার ঠোঁট, কি সুন্দর তাঁর হাত! আহা! তিনি যে আমায় অণুমাত্রও কষ্ট দিলেন না। এই কথা শুনিয়া কেহ বা পাগল বলিবে, কেহ বা মিথ্যাবাদী বলিবে, কিন্তু এমন সত্য কথা আর নাই। গোঁড়ামির মধ্যে যে পবিত্রতা, উচ্চতা আছে, তাহা যদি না দেখাও, তবে নিম্নশ্রেণীর ধর্ম্মশীলদের মধ্যে গণ্য হইবে। বন্ধুর পক্ষপাতী হইবে না? তিনি যে সত্য সত্যই একটী দিনও কোন ক্লেশ প্রদান করেন নাই, তিনি ত কখনও অপমান দেন নাই; কেবল

সুস্থতাই সতত অর্পণ করিতেছেন। রোগ, যন্ত্রণা, শোক, অশান্তি, কিছুই তিনি দেন নাই, কেবল সুখাই তিনি করিয়াছেন। এই ভাবে গেলে বুঝিবে, প্রেম কেন পক্ষপাতী হয়। প্রেম নাকি কেবল তাঁহাতেই যাইবে, তাই গোড়া থেকে এই কথা। এমন আর নাই, এমন আর হইতে পারে না,—এই যে প্রেমের উক্তি, ইহা কেন হইল? প্রেম নাকি কেবল ঈশ্বরেরই প্রাপ্য, সেই জন্য।

ও আমায় ভালবাসে, আমি ওকে ভালবাসি। ওর যা কিছু, আমার কাছে সব ভাল। যদি বল, টাকাতেও সুখ হয়, ঈশ্বরেতেও সুখ হয়, প্রেমিক কাঁদিতে থাকে। প্রেমিক বলেন, "না, এমন কথা কখন বলিও না। ঈশ্বরের মত আর কিছুই নয়, আমার ব্রহ্মের ন্যায় আর কাহাকেও দেখা যায় না। এই যে আমার ব্রহ্ম, ইনি যেমন, মা বাপও তেমন নহেন; ভাই, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র, তেমন কেহই হইতে পারে না।" ধন যদি চুরি যায়, শরীরে যদি আঘাত লাগে, নানা প্রকার যদি কষ্টের ব্যাপার ঘটে, প্রেমিক তথাপি বলেন, আমার ব্রহ্ম আমায় কি সুখই যে দান করেন, তাহা আমি বলিয়া শেষ করিতে পারি না। ব্রহ্ম আমার, কেবল অমৃতই ঢালিতেছেন, সুখ ও আনন্দই কেবল তিনি বর্ষণ করিতেছেন। প্রেমিকের কথা শুনিয়া পৃথিবী বলিবে, "লোকটা একেবারে গিয়াছে; এ ব্যক্তি যথার্থই কাণা, ব্রহ্মের স্বভাবে একটীও ব্রণ দেখিতে পায় না, ব্রহ্মের অন্যায় কখনই বলিবে না। যত ঘটনা

ঘটুক না কেন, যদি কাঁটা বর্ষণও হয়, সে সময়েও প্রেমিক বলে, এ সকলই মঙ্গলের জন্য, সুখের জন্য। এ উক্তি উপেক্ষা করিও না।

নিরপেক্ষতার কথা যে বল, নিরপেক্ষতা বস্তুটা কি? পক্ষপাতী হইবে না? প্রেম দিতে গেলেই পক্ষপাতী হইতে হইবে। পক্ষপাতী হইয়া ঈশ্বরে অনুরাগী হইবে। যাকে যদি ভালবাস, সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসিবে। এখানে পক্ষপাতী হইয়া কাণা হইতে হয়। প্রেম যদি হয়, তবে সেই প্রেম বলপূর্ব্বক কাণা করিয়া দেয়। কেবল জানিবে যে, তিনিই প্রেম পাত্র, তিনিই পরম সুন্দর; তাঁরই নিকটে থাকিতে হইবে। হে ব্রাহ্ম, কত বৎসর সাধন করিয়া তোমরা যোগী হইয়াছ, কত উচ্চ ভাব লাভ করিয়াছ, সে জন্য প্রশংসা করি; এখন দেখিতে চাই যে প্রেমিকের দলে মিশলে পিতা মাতা সম্বন্ধে যে কথা প্রেমের সহিত বলিলে লোকে অত্যুক্তি বলে, মিথ্যা কথা বলে, তাই তোমাদের মার সম্বন্ধে বল। যদি ঈশ্বর সম্বন্ধে অত্যুক্তি করিতে থাক, তবে সে অত্যুক্তি সমস্ত একত্র হইলেও মার গুণের সমান হইবে না। প্রেমে মার পক্ষপাতী হইয়া কেবল তাঁর প্রেমের কথা, দয়ার কথা বল, মাকে পাইবে, মাকে দেখিয়া কৃতার্থ হইবে। যদি পক্ষপাতী হইবার দরকার হইয়া থাকে, তবে খুব পক্ষপাতী হও। প্রেমে পক্ষপাতী হইয়া পড়; মা মা ভিন্ন অন্য রব আর মুখে আসিবে না।